মানসম্মান

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশক ❑
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশকাল ❑
৫ ডিসেম্বর, ১৯৬২

❑ প্রচ্ছদ ❑
শেখর মণ্ডল, কলকাতা-৬

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রণ ❑
পূর্ণিমা প্রিন্টার্স
টি/২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৬৭

মনোময় মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রী মালবিকা মজুমদারকে নিয়েই এ-কাহিনীর শুরু। স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে এযুগে যে-গল্প আরম্ভ হয় তা কখনই স্বামী-স্ত্রীতে শেষ হতে পারে না, অন্তত আর একজনকে অবশ্যই এ-কাহিনীতে উপস্থিত হতে হবে। সে আছে, সে অপেক্ষা করছে এবং যথাসময়ে তার আবির্ভাব ঘটবে। আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

সুপুরুষ মনোময় মজুমদারের বেডরুম থেকেই গল্প আরম্ভ করা যাক।

এখন ভোরবেলা, মনোময় ঘুম থেকে ওঠে নি। কিন্তু তার যুবতী স্ত্রী,—পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি—মালবিকার ঘুম ভেঙেছে।

আজকের ভোরবেলাটা বেশ স্নিগ্ধ ও শান্ত। কোথাও কোনো অঘটন ঘটবার আগাম ইঙ্গিত এই প্রসন্ন প্রভাতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অঘটন ঘটবে। এমন অঘটন যা মালবিকা এবং মনোময়কে সহজেই বিপজ্জনক আবর্তে ফেলে দেবে। বাঁধনছাড়া সেই ঘূর্ণি শেষ পর্যন্ত ওদের দু'জনকে এবং আমাদের অদেখা ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তা জানবার জন্য এখনই চঞ্চল না-হওয়া ভাল। শাস্ত্রে আছে, স্থিতধী ব্যক্তিরাই অভিলষিত লক্ষ্যে উপনীত হন। মালবিকার প্রিয় বই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে লেখা আছে, 'এ জগতে কারণ ব্যতীত কিছুই হয় না। এবং মনই প্রথম শরীর—এই মনোরূপ শরীরই আত্মার ভোগ নিকেতন।...শরীরের মধ্যে মন নানা রূপ ধারণ করিতেছে—অদ্য যাহা

প্রিয় কল্য তাহা অপ্রিয়, অদ্য যাহা স্বাদু কল্য তাহা তিক্ত, অদ্য যাহা সত্য কল্য তাহা অসত্য।'

নরম সেমিভয়েল কটনের রঙিন শাড়িতে সুশাসিত যুবতী-শরীর জড়িয়ে চৌত্রিশ বছরের মালবিকা মজুমদার এম এস-সি ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে অলসভাবে এখন আকাশ-পাতাল ভাবছে। মালবিকা মজুমদারের ভাবনা-চিন্তার এই অংশটা ওর জবানীতেই শোনা যাক। বলাবাহুল্য, মালবিকার সমস্ত ভাবনা জুড়ে মনোময় সারাক্ষণ বিরাজ করছে। দীর্ঘ তন্বী দেহটি বিছানায় বিছিয়ে দিয়ে ভাবনা-বিলাসিনী মালবিকা ভাবছে ঃ

১৫ই ডিসেম্বর মনোময়ের জন্মদিন। বাংলা তারিখ ধরলে সেদিন ছিল সাতাশে অগ্রহায়ণ। ওর মায়ের হাতে-লেখা একটা চিরকুটে দেখেছি চিত্রা নক্ষত্রে ওর জন্ম, কন্যারাশি, বৈশ্যবর্ণ, দেবগণ, অষ্টোত্তরী বুধের এবং বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। জন্মলগ্নেই ছিল শুভকর্মযোগ—অব্যূঢ়ান্ন, নববস্ত্রপরিধান, বিপণ্যারম্ভ, রাজদর্শন, পুংরত্নধারণ, বীজবপন, নাট্যারম্ভ, সমস্ত কিছু করার অবাধ স্বাধীনতা ছিল সেই মুহূর্তে।

আমি ওর মায়ের হাতের-লেখা সযত্নে পড়েছি, আমার গোদরেজ লকারে এখনও কাগজটা আছে—কিন্তু শুভকর্মযোগের পরে শক্ত সংস্কৃত কথাটার মানে বুঝতে পারিনি।

মনোময় আমার অবস্থা দেখে সেবার হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, "ইংলিশ-মিডিয়মে-পড়া বাঙালী মেয়েদের কী দুর্গতি!"

আমি ওর বুকে হাত রেখে বলেছিলাম, "আমার দাদু ছিলেন বেদান্ততীর্থ। দাদুমণি বেঁচে থাকলে কে তোমাকে জ্বালাতন করতো? তিনিই আমাকে বলে দিতেন 'অব্যূঢ়ান্ন' কথাটার অর্থ।"

ও আর আমাকে কষ্ট দেয় নি। নতুন বিয়ে হয়েছে তখন, বিয়ের প্রথম-প্রথম কোনো স্বামীই তার বউকে বেশী অবহেলা করে না। ও বলেছিল, "শোনো মালবিকা, ওই কথাটার মানে আইবুড়োভাত।"

আমার মনে আছে, ওর দিকে তখন বাঁকা চোখে তাকিয়েছিলাম।

"কী লোক বাবা ! জন্মমুহূর্ত থেকেই আইবুড়োভাতের ঢালাও অনুমতি।"

মনোময় আরও কয়েক বছর পরে আমাকে বলেছিল, "মায়ের লেখা ওই কাগজটা ভাল করে দেখেছো তো—নাট্যারম্ভের অনুমতি'ও রয়েছে জন্মলগ্নে। নাটকীয় অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে আমার জীবনে, তাই না মালবিকা ?"

আমি তখনই বলেছিলাম, "আমি ওইসব পঞ্জিকা-ফঞ্জিকার ফাঁদে বন্দী হতে চাই না, মনোময়।" (ভাল কথা, ওর নামটা ছোট করবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু 'মনু' কথাটা আমার কানে খুব খারাপ লেগেছিল—নিজের প্রিয়তমকে মনু বলে ডাকা যায় না, কীরকম ছন্দপতন হয়, মানসম্মানে লাগে। আমি তখন থেকেই ওর পুরো নামটাই বুকের মধ্যে রাখি—মনু আর মনোময় এক নয় কিছুতে।)

মনোময় সেবার আমার দিকে একটু দুষ্টুমিভরা নজর দিয়ে নির্বাক হয়ে বসেছিল। আমি ওকে মনে করিয়ে দিলাম, আমি অনেকদিন বিজ্ঞানের চর্চা করেছি। ইংলিশ আর সায়েন্স এবং সেইসঙ্গে এক আধ ফোঁটা ট্রাডিশনের রাসায়নিক সংমিশ্রণে আমার বাবা মালবিকা মুখার্জিকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

দেখুন, আমি কত কী ভাবছি। অথচ যার জন্যে আমার ভাবনাচিন্তা, একটা ফুলকাটা পাঞ্জাবি এবং ঢিলে পাজামা পরে সে কেমন এই ঘরের বিছানার এক কোণে পড়ে রয়েছে। আমার বাবা আধমণী ওজনের দু'খানা পাশ-বালিশের দুর্গের মধ্যে ঘুমোতেন। সেই ছোটবেলা থেকে আমার পাশ-বালিশ কিন্তু অপছন্দ। সেদিক থেকে আমি খুব ভাগ্যবতী—মনোময় পাশ-বালিশ ব্যবহার করে না। আধুনিক শয়নকক্ষে আধুনিক ডিজাইনের বিছানায় পাশ-বালিশ মানায় না—ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

মনোময়কে আমি বলেছিলাম, "ঠাকুরকে নমস্কার, তুমি পাশ-বালিশ ব্যবহার করো না।"

ও তখনও আজকের মনোময় হয়ে ওঠে নি। তখন ওর রসিকতা বোধ ছিল, কথায়-কথায় হাসতো। স্পেশাল বাংলায় ভব্যতার আইন

বাঁচিয়ে ও যা ইঙ্গিত দিয়েছিল তার অর্থ ঃ "যাদের বিয়ে হয়েছে তারা কোন্ দুঃখে শিমুল তুলোর পাশ-বালিশে সন্তুষ্ট হবে ?" ওর কথার মানে একটু দেরিতে বুঝেছিলাম, ফলে রাগ দেখানোর উপায় রইলো না। কেউ কোনো রাগের কথা বললে, সঙ্গে সঙ্গে রাগ করতে হয়—রাগের জগতে তামাদির আইনটা খুব কড়া।

ফুলকাটা পাঞ্জাবি-পরা মনোময় এখন ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরছে। এতোক্ষণ ওর ঘুমোবার কথা নয়—কিন্তু গতরাতে আমাদের বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছে। আমরা দু'জনে একটা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। পার্টিতে তেমন কোনো দেরি হয় নি। কিন্তু ফেরার পথে— থাকগে, সে-কথা বলার সময় অনেক পাওয়া যাবে।

এখন-যে মনোময় ঘুমুচ্ছে এইটাই ভাল। না-হলে ও আমাকে জ্বালাতন করতো। ওই যে পাশ-বালিশের কথা বলছিলাম। ওর একটা বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ঘুম ভাঙার সময় বিছানায় আমাকে হাতড়াবে। কিছুক্ষণ নিজের বউকেই বালিশের মতো ব্যবহার করবার ছেলেমানুষী ও কাটিয়ে উঠতে পারে না। বিয়ের প্রথম দিকে আমি আস্কারা দিয়েছি, তাই এখন রাগ দেখানোর উপায় নেই।

মনোময় বলে, "আমাদের এই ভারতবর্ষে 'প্রিসিডেন্স' বলে একটা অমোঘ শক্তি আছে। যা আগে একবার মেনে নেওয়া হয়েছে তা আর অমান্য করবার উপায় নেই। যা কিছু আপত্তি তা প্রথমবারেই তুলতে হবে।"

"ব্যাপারটার মানে কী বলো তো ?" মনোময়ের প্রভাত-আলিঙ্গনে বন্দী অবস্থায় সেবার আমি প্রশ্ন করেছি।

আলিঙ্গন আরও দৃঢ় করে সকৌতুকে মনোময় বলেছে, "এই যে বালিশের বদলী হিসাবে ডিউটি দিতে তুমি প্রথম রজনীতেই আপত্তি তোলো নি এখন অবস্থাটা মেনে নেওয়া ছাড়া তাই তোমার কোনো উপায় নেই।"

ওর একটা স্বভাব, যে-কোনো ছোট্ট ঘটনার মধ্য থেকে ঐতিহাসিক কোনো তাৎপর্য খুঁজে বার করে। আমি বললাম, "তোমার ওইসব

প্রেসিডেন্সের কানুন আপিসে এবং কারখানায় খাটবে, বাড়িতে নয়।"

আমাকে আলিঙ্গন-মুক্ত হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে মনোময় বলেছিল, "তোমার বাবাই আমাকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ বড্ড প্রাচীন দেশ—বয়োজ্যেষ্ঠ অতীতের চোখরাঙানিতে কনিষ্ঠ বর্তমান এখানে সব সময় থরথর করে কাঁপছে।"

"তাতে কী দাঁড়াচ্ছে?" নিজেকে মুক্ত করার একটুও চেষ্টা না-করে আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি, সত্যিকথা বলতে কী, এই মুহূর্তগুলো প্রচণ্ড উপভোগ করি। ওর ভালবাসার মধ্যে কোনো 'ক্রুডিটি' নেই। এই ইংরিজী কথাটারও নিশ্চয় কোনো বাংলা আছে, কিন্তু আমার বিদ্যেয় তা কুলোবে না। মনোময়কে জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই—যে মুহূর্তে ও বুঝবে আমি ওর ভালবাসার সৌন্দর্যময় দিকটা এতো পছন্দ করি সে-মুহূর্তে ও ভোঁতা হয়ে যাবে।

এই যে ভোরবেলায় একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপন সম্পর্কের মধ্যেও আমরা সম্পূর্ণভাবে পশুর মত ব্যবহার করছি না, স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যেও বিশ্বসংসারের দু'একটা কথা আলোচনা করছি, এটা যে সহজলভ্য নয়, তা আমি জানি। আমার কয়েকজন বান্ধবী আছে—একসময় তাদের কাছে দাম্পত্যজীবনের অনেক রিপোর্ট পেয়েছি। মুখ ফুটে তাদের কিছু বলি নি, কিন্তু ভেবেছি কত ভাগ্যবান আমি। আমার এবং মনোময়ের সম্পর্কের মধ্যে অমার্জিত স্থূলতা একেবারে ছেঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে—যা আছে তাকে ইংরিজীতে বলে রিফাইনমেন্ট, যার কোনো পরিভাষা বাংলায় থাকতে পারে না।

আলিঙ্গন থেকে আমাকে মুক্তি দেবার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ না-করে মনোময় বলেছিল, "মালবিকা, এ-দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠা খুব শক্ত : সারাক্ষণ অতীতের হুকুম তামিল করে ভবিষ্যতের মেরুদণ্ড নরম হয়ে গিয়েছে।"

তখন আমার মনের মধ্যেও নানা চিন্তা আসতো। বন্ধু মনোময়ের সঙ্গে যখন দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছি, তখন বান্ধবীরা ভেবেছে আমরা সারাক্ষণ শুধু তথাকথিত 'ক্রুড' প্রেম করছি, কিন্তু আসলে তুমি

কী মিষ্টি, তুমি কী সুন্দর, তোমার মুখটা একটু তুলে ধরো, এ-সব ডায়ালগ আমাদের মুখে মোটেই আসতো না। আমরা দু'জনে সমান দাপটে নানা বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা চালাতাম। ওর বুদ্ধির দীপ্তি, ওর জ্ঞানের পরিধি আমাকে বিস্মিত করতো। আমি মনোময়কে উস্‌কে দিতাম। ও আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। কপালে সিঁদুর চড়ে গেলেই সেসব অভ্যাস সঙ্গে-সঙ্গে শিকেয় তোলা যায় না।

পুরনো অভ্যাসটা আমাদের নিবিড় সম্পর্কের মধ্যেও প্রবহমান রয়েছে। বিছানায় স্বামীর খুব কাছে সরে এসে আমি জিজ্ঞেস করেছি, "যেসব দেশের ভবিষ্যৎ আছে তারা কি অতীতকে তোয়াক্কা করে না?"

মনোময় উত্তর দিয়েছে, "সে-কথা কি বলবার অপেক্ষা রাখে?"

আমি মনে করিয়ে দিয়েছি মনোময়কে, "বর্তমান বলেও একটা জিনিস আছে।"

মনোময় তার আলিঙ্গন একটুও শিথিল না করে বলেছে, "অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সামান্য একটা বিন্দুর নাম বর্তমান—বর্তমান সত্যিই আছে কিনা তা নিয়েও কেউ-কেউ সন্দেহ করে। বর্তমানের হিসেব-খাতাটাও খুব জটিল, মালবিকা। অতীতের পাওনা এবং ভবিষ্যতের দাম পুরোপুরি না ধরলে হিসেব-খাতা নির্ভুল হয় না।"

"তুমি নিশ্চয় কোম্পানির কথা বলছো, ওখানেই কস্ট্‌ অফ দ্য পাস্ট এবং কস্ট্‌ অফ ফিউচার নিয়ে টানাটানি হতে পারে।"

মনোময় তখন সমস্যার গভীরে প্রবেশ করলো। অনায়াসে ডুব সাঁতার দেবার প্রবণতা ছিল ওর। মনোময় ওই ভোরবেলায়, নিতান্ত খেলাচ্ছলেই যা বলেছিল তা অনেক দার্শনিকের চিন্তার কারণ হতে পারে। আমার স্বামী মন্তব্য করেছিল, "শুধু কোম্পানি কেন? প্রত্যেক মানুষের জীবনে একই অবস্থা, মালবিকা। অতীতের পাওনা-গণ্ডা মেটাবার এবং ভবিষ্যতের আগাম পেমেন্টের হাঙ্গামা না-থাকলে বর্তমানটা অনেক লাভের হতো।"

আমার স্বামী মনোময় এইমাত্র বিছানায় আর একবার পাশ ফিরলো।

এর মানে ওর ঘুম পাতলা হয়ে আসছে। ও হঠাৎ উঠে পড়তে পারে। এবং উঠে পড়লেই আমাকে কিছু করতে দেবে না। পাঁচ মিনিট ওর কথামতোই আমাকে চলতে হবে। এবং তারপর...

তারপরেই আজকাল আমার দুঃখ হয়। একটা দিনে চব্বিশ ঘণ্টা আছে, প্রতি ঘণ্টায় ৬০ মিনিট আছে এবং প্রতি মিনিটের মধ্যে ৬০ সেকেণ্ড লুকিয়ে আছে—কিন্তু অবশিষ্ট ৮৬, ১০০ সেকেণ্ডে আমার একটুও অধিকার থাকবে না। আমি তখন স্রেফ মিসেস মজুমদার—জাস্ট লাইক ওয়াইফ অফ এনি অতি-ব্যস্ত পুরুষমানুষ। সেইসব পুরুষমানুষ যারা কর্মজীবনে সাফল্যের স্বাদ পেয়েছে, যারা স্ত্রীকে অবহেলা করবার জন্যেই বিয়ে করে, যারা কাজের সঙ্গে প্রেম করে, অথচ বউদের সঙ্গে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় চালিয়ে যাবার লোভে বলে, 'রোজগারের জন্যেই বাধ্য হয়ে কাজের পিছনে ছুটে চলেছি।'

কিন্তু এসব আজে-বাজে চিন্তার সময় নয় এখন। ঘড়ির কাঁটাটা আমার মুখ চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকছে না। আমার স্বামীই একবার বলেছিল, সময়, স্রোত এবং মনোময় মজুমদার কারুর জন্য অপেক্ষা করে না।

আমি একবার খুঁটিয়ে ভেবেছিলাম। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে ওই পাঁচ মিনিট সময় ছাড়া আর কোনো সময় আমার স্বামী সত্যিই কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

একবার আমাদের বান্ধবী শ্রাবন্তীকে এই ভোরবেলার কয়েক মিনিটের কথা ইঙ্গিতে বলেছিলাম। শ্রাবন্তী সিন্‌হা রায়চৌধুরী মনোবিজ্ঞানের অনেক বড় বড় ডিগ্রি জড়ো করেছে। ওকে অবশ্য বলি নি যে ব্যাপারটা আমাদেরই একান্ত ব্যাক্তিগত। আমি বলেছিলাম, "ভাই শ্রাবন্তী, বম্বেতে যখন ছিলাম, তখন এক দম্পতির কথা শুনেছিলাম..."

সব শুনে শ্রাবন্তী মন্তব্য করেছিল, "ঘুম থেকে উঠে নারীর সঙ্গলিপ্সা পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিকও বটে, আবার অস্বাভাবিকও বটে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের আদিম আকর্ষণ যেমন কাজ করতে পারে আবার তেমনি হতে পারে ভদ্রলোকের শিশু বয়সের কোনো অবদমিত বাসনা..."

শ্রাবন্তী অন্য বিষয়ে সরে যেতে চাইছিল। আমি ওকে আসল বক্তব্যে চেপে ধরবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, "কী বললি, শ্রাবন্তী?"

কিন্তু শ্রাবন্তী তখন আমাকে ওর ননদের পারিবারিক খিটিমিটির বিবরণ শোনাতে আগ্রহী। সে বলল, "যাই হোক না, তোর বর যখন এরকম করে না তখন এই বিষয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

আমি একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু শ্রাবন্তীকে বুঝতে না-দিয়ে চেষ্টা চালালাম। "সবার জন্যেই পৃথিবীতে একটু-আধটু ভাবা ভাল, শ্রাবন্তী। আমার কর্তাটি তাই তো বলেন।"

শ্রাবন্তী তখন ব্যাখ্যা করলো, "তোর জানাশোনা ওই বম্বের ভদ্রমহিলা হয়তো স্বামীর ওই স্পেশাল কয়েক মিনিটের ব্যাকুলতায় খুব খুশী—কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, শিশু অবস্থায় ওঁর স্বামী সকালে ঘুম থেকে উঠে মা-কে ওই-ভাবে খুঁজতো। সেই বেবিটা মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, একটুও বড়ো হয় নি—সে এখনও ভোরবেলায় মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"ও মাই লর্ড!" ইংরিজী বেরিয়ে এলো আমার মুখে। "নিজের স্ত্রীকে নয়, গর্ভধারিণী জননীকে খুঁজছে!"

শ্রাবন্তীটা বাংলাও জানে খুব ভাল। সে বলেছিল, "হ্যাঁগো, মালবিকা, হাঁ। জায়ার মধ্যে জননীর সন্ধান চলেছে বিশ্বভুবনে নিরন্তর।"

"অর্থাৎ বেচারা স্ত্রী যখন ভাবছে সে প্রেয়সীর ভূমিকায় অধিষ্ঠাত্রী তখন আসলে সে একজন ধেড়ে খোকাকে লালন পালন করছে!"

শ্রাবন্তীটার মুখে কোনো লাগাম নেই। ঠোঁট বেঁকিয়ে সে যখন বললো, বেচারা প্রেমদায়িনী বুঝতে পারছে না তার প্রেমাস্পদ আসলে স্তনদায়িনীর খোঁজ করছে, তখন কে বলবে এই শ্রাবন্তী বড় বড় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে গুরুগম্ভীর গবেষণাপত্র পাঠ করে?

আজ সকালে আমার হাতে অনেক কাজ। কিন্তু মনোময়ের মুখ দেখে কেমন হুট করে শ্রাবন্তীর কথায় চলে এলাম। বান্ধবীর কথায় আমি গুরুত্ব দিই নি। একবার ভেবেছিলাম এমনই কোনো অলস ভোরবেলায় মনোময়ের কাছে কথাটা তুলবো। কিন্তু কী জানি, একটু সঙ্কোচ লেগেছে। ভেবেছি, ওইভাবে নিজের স্বামীর সঙ্গেও কথা বলা যায় না। মানসম্মান

থাকে না। তবে আমি ওর ছোটবেলার খোঁজখবর করেছি।

মা-কে মনোময় ভালবাসতো। ওর মুখেই শুনেছি, কম বয়সে হঠাৎ মা মারা গেলেন। তারপর...শ্রাবন্তীর মুখটা আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠায়, ওকে আমি জিজ্ঞেস করি নি।

কিন্তু একদিন আমি একটা কিছু করে বসবো। স্বামীসান্নিধ্যের সকালবেলাটা আমার বেশ ছিল, কোন দুঃখে যে শ্রাবন্তীর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলাম! ইউরোপের নোংরা-ঘাঁটা মনোবিজ্ঞানীদের ছত্রছায়ায় পণ্ডিত হয়ে ওদের মনগুলো নোংরা হয়ে গিয়েছে ; ওরা ভাবে, ভিয়েনার কয়েকটা ইহুদী খ্রীষ্টান পরিবারে ফ্রয়েড সাহেব যা লক্ষ্য করেছেন দুনিয়ার সব জায়গা, বিশেষ করে ঐতিহ্যময় এই ভারতবর্ষেও তা সত্য হবে।

কিন্তু যতোই শ্রাবন্তীর সমালোচনা করি, স্বামীর আলিঙ্গনে বন্দী অবস্থায় আজকাল কিছুতেই পুরনো আনন্দ অনুভব করি না। আমার এবং মনোময়ের মধ্যে তৃতীয় একজনের দেহহীন উপস্থিতি আমাকে অস্বস্তির ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে দেয়। আমার শরীর ও মন শিরশির করে ওঠে। ওকে প্রশ্রয় না দিয়ে আরও উত্যক্ত করতে ইচ্ছে হয়—ওকে অশান্তিতে ফেলবার জন্য মনটা ছটফট করে।

যেমন ধরুন গতকালের কথা। ভোরের আলো তখন সবে পূর্বদিগন্ত থেকে আমার এই ডানলোপিলো মোড়া বেডরুমে উঁকি মেরেছে ; আলোর দ্বিধাও তখনো কাটে নি। মনোময় সেই সময় ঘুমের রাজ্য থেকে আচমকা ফিরে এসে আমাকে খোঁজ করলো। আমি বললাম, "এখনো আলো ফোটে নি—আর একটু ঘুমোও।" কিন্তু স্ত্রীর কথা শুনে আলস্যে দেহ ভাসিয়ে দেবার পুরুষ মনোময় মজুমদার নয়—সে আমাকে কাছে টানতে লাগলো, ঘুমন্ত মানুষ যেভাবে পাশ-বালিশটা নিজের দিকে টেনে নেয়।

আমি জানি, এর অর্থ আর তিনশ সেকেণ্ডের বিলাসিতা—মনোময় মজুমদার এবার সারাদিনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে মনস্থির করে ফেলেছে।

আমি ওর সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করছিলাম না—নিজের জায়গায় একটা ভারি পাথরের মতো শুয়ে রইলাম। মনোময়ের শরীরে দ্বিধাহীন

যৌবন, ওর অনুগত পেশীগুলো হঠাৎ ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে প্রায় সাঁড়াশির মতো আমার দেহকে ওদের মনিবের দিকে টেনে নিয়ে গেলো, তারপর মনোময় আমাকে নিঃশব্দে নিবিড় আলিঙ্গনজালে বন্দিনী রাখার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো।

একমুহূর্ত ওর পেশীগুলো শিথিল হয়েছিল, আমিও চকিতে কয়েক ইঞ্চি দূরে ফোম রবারের বিপজ্জনক সীমান্তদেশে সরে এসেছি। ঘুমের ঘোর পুরো না কাটলেও, মনোময় কাতরভাবে আমাকে চাইলো। বললো, "ভোরবেলায় তোমাকে না পেলে আমার একদম চলে না, মালবিকা।"

অসংখ্যবার এই কথাগুলো আমাকে আনন্দ দিয়েছে, ওর অসহায় শারীরিক মানসিক অবস্থা আমি উপভোগ করেছি। কিন্তু গতকাল আমি অন্য মুডে ছিলাম। আমি বললাম, "ভোরবেলাতেই কী সব বলছো মনোময়? এই তো তিনদিনের দিল্লী-ট্যুরে আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম না। ভোরবেলায় তোমার কোনো অসুবিধা হবার রিপোর্ট তো আমার কানে আসে নি।"

মনোময় আমাকে আবার আলিঙ্গনবন্দী করবার জন্য অনেকখানি কাছে সরে এলো, তারপর কোনোরকম রাগ না-দেখিয়ে বললো, "আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে প্রত্যেক ট্যুরে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম।"

তারপর সে শিশুর মতো আমাকে দখল করে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ঠিক করেছিলাম বলবো, "এটা তোমার ভালবাসা নয়, মনোময়। আমার বদলে একটা প্রমাণ সাইজের পাশ-বালিশ পেলেই তোমার কাজ চলে যাবে।"

কিন্তু এসব কিছুই বলা হলো না। আমার হঠাৎ মনে হলো, একটা অসহায় শিশু স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে তার মাকে জড়িয়ে আছে।

একটু পরেই মনোময় তড়াং করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে—আমি যে একটা প্রাণী ওর সঙ্গে একই বিছানায় রাত কাটালাম তা যেন এই পুরুষমানুষটির খেয়াল নেই।

আজ এখনও মনোময়ের ঘুম ভাঙে নি। কালকের পার্টি থেকে ফিরবার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেলো। আজকাল ড্রাইভারের ওভারটাইমের হাঙ্গামা অনেক। কোম্পানির খরচ কমাবার জন্যে মনোময় নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। পুরো একঘণ্টা জনহীন পথের ধারে ওকে কালিঝুলি মাখতে হলো। গাড়ির দোষ খুঁজছে মনোময় আর আমি টর্চ লাইট ধরে দোষের ওপর আলোকসম্পাত করছি।

একটু ভয়-ভয় করছিল। রাতের এই শহরকে আজকাল বিশ্বাস নেই। এই বিশ্ববিশ্রুত আদর্শবাদী নগরীর রাজপথে সালঙ্কারা রমণীরা আগেকার মতো নিরাপদ বোধ করে না।

গাড়ির মানভঞ্জনের চেষ্টার মাঝে-মাঝে মনোময় নিজেও এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখছিল। "যা দিনকাল," ও বলে উঠলো।

আমার দেহে কোনো স্বর্ণালঙ্কার নেই, এই যা ভরসা। "সব ফল্‌স জুয়েলারী," আমি সুখবরটা মনোময়কে বলতে গেলাম। আর মনোময় মাঝরাতের এই দুঃসময়েও রসিকতা বন্ধ করলো না। "মালবিকা, সোনার গহনা এবং দামী পাথরই শুধু অলঙ্কার নয়—মহাকবি কালিদাস বলে গিয়েছেন, সুন্দরী রমণীদের অঙ্গপ্রতঙ্গও এক একটি অমূল্য অলঙ্কার !"

আমার ভীষণ ভয় হবার কথা—কিন্তু মনে আছে, মনোময় একবার গভীর রাত্রে হাঁটতে-হাঁটতে আমাকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। জনমানবহীন রাস্তায় তখন কোনো ট্যাক্সি ছিল না। ভরসার মধ্যে শুধু দু'খানা আধলা ইট যা মনোময় রাস্তা থেকে তুলে নিয়েছিল। ইট দুটো ক্রিকেট বলের মতো খেলতে-খেলতে আমাকে সে পাহারা দিয়েছিল। মনোময়ের ওপর আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে।

"তাড়াতাড়ি গাড়ি সারাও," টর্চ ধরে আমি বকুনি লাগিয়েছিলাম।

মনোময় আমার কথায় কান না দিয়ে বললো, "কেন ? শোনো নি ? সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার ?"

"মেয়েদের ফিজিওলজি ও অ্যানাটমি নিয়ে রিসার্চের অধিকার কবিদের, কোম্পানির অফিসারদের নয়," আমি বকুনি লাগিয়েছিলাম। এর পরেই আমি টর্চটা নিভিয়ে দিলাম। কিন্তু হঠাৎ বেহুঁশ গাড়িটা কাঁপতে

কাঁপতে সজীব হয়ে উঠলো। আমার শাড়ির আঁচলে নোংরা হাতটা মুছে নিয়ে ও গাড়ির বনেট নামিয়ে দিলো।

তারপর বাড়ির পরিপূর্ণ নিরাপত্তায় ফিরে এসে মনোময় আর ঘুমোতে পারে না।

"কী হলো ? ঘুমোচ্ছ না কেন ?" বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছি।

মনোময় বললো, "অন্ধকার রাস্তায় দেহের অলঙ্কার নিয়ে রসিকতা করেছিলাম—আমার দুশ্চিন্তা ঢাকবার অন্য কোনো উপায় ছিল না। জায়গাটা খুব খারাপ—মাসখানেক আগেই ওখানে যা কাণ্ড হয়েছে। ওই সেম্ কেস—বিকল গাড়ি—একটি পুরুষ, একটি যুবতী ও..."

বিপদ কাটিয়ে আসবার পরে অনেক সময় নার্ভাসনেস বেড়ে যায়। আমি ওকে মিষ্টি করে বললাম, "ঘুমিয়ে পড়ো, রাত অনেক হয়েছে।"

তারপর কখন রাত কেটে গিয়েছে। ভোরের আলো আবার এসে পড়েছে এই ঘরে। ঘরের চার দেওয়াল ঘিরে পর্দার পাঁচিল তোলা আছে, শুধু পুবের কোণটুকু ছাড়া। ওইখান থেকেই আমরা দু'জন ভোর হবার কথা জানতে পারি।

মনোময় আবার পাশ ফিরলো—যার অর্থ যে-কোনো মুহূর্তে মিস্টার মজুমদার জেগে উঠতে পারেন। অতএব আমার কাজগুলো এবার চটপট সেরে নিই।

আমার টেলিফোনটা মনোময়ের মাথার গোড়াতেই রয়েছে। হাল্কা মেরুন রঙের স্পেশাল অর্ডার দেওয়া তন্বী টেলিফোন রিসিভার। নামটাও আকর্ষক—প্রিয়দর্শিনী। এই ফ্ল্যাটে আসবার পর টেলিফোনটা কোথায় বসবে সে-নিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে কিছু মতের আদান-প্রদান হয়েছিল।

মনোময় শেষ পর্যন্ত বললো, "শয়নকক্ষ ছাড়া প্রিয়দর্শিনীদের আর কোথাও স্থান দেওয়া যায় না!"

টেলিফোন কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার একবার

দেখা হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলাম, "আপনাদের কোনো নীতিবোধ নেই। টেলিফোনের নাম হওয়া উচিত ছিল প্রিয়ভাষিণী—কখনই প্রিয়দর্শিনী নয়।"

ভদ্রলোকের স্ত্রীও সুরসিকা। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন, "ভাল করে শুনিয়ে দিন ওঁকে—আমার কথা কানেই তোলেন না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে পুরুষমানুষদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—হয়তো শুনবেন, পরের যন্ত্রটার নাম হয়েছে 'সুতনুকা'।

প্রিয়দর্শিনী আমার স্বামীর মাথার কাছটা আলো করে প্রহর গুনলেও তার গতিবিধি সুদূরপ্রসারী। এই যন্ত্রের সঙ্গে মাইলখানেক লম্বা তার জুড়ে নেওয়া হয়েছে! বাইরের বারান্দা, লিভিংরুম, এমন কি বাথরুম পর্যন্ত যেখানে খুশি সান্নিধ্য লাভ করা যায় প্রিয়দর্শিনীর।

আমি একটা নম্বর ডায়াল করলাম। তিনবার ডায়াল তো ঘুরোলাম, কিন্তু কোথায় রিং? এই সাতসকালে কলকাতার গৃহবধূরা নিশ্চয় বেডরুম থেকে তাঁদের অন্তবিহীন ফোনালাপ শুরু করে নি। আসলে এই দূরভাষিণীটি মোটেই আমার অনুগত নয়। আমি দেখেছি, মনোময় লাইন চাইলেই পায়, কিন্তু আমি ডায়াল করলেই প্রিয়দর্শিনী হয় নিস্তব্ধ, নয় 'খট', নয় 'কোঁ কোঁ'। নারীর অনুগত নতুন নতুন ফোনযন্ত্র বের করুন টেলিফোন কোম্পানি—নাম হোক 'প্রিয়দর্শন অথবা 'পুরুষোত্তম'।

টেলিফোন লাইন না পেলে একটানা ডায়াল ঘুরিয়ে যেতে বারণ করে মনোময়। "একবার চেষ্টা করো, তারপর একটু সময় দাও।" আমি ফোন নামিয়ে এক থেকে একশ কাউন্ট করলাম। আবার ডায়াল।

"হ্যালো, হ্যালো মণিদীপা—এই সাত সকালে কার সঙ্গে এতো কথা বলছিলি?...হ্যালো, হ্যাঁ, দিস ইজ মালবিকা মজুমদার স্পিকিং।"

ওদিক থেকে উত্তর এলো, "উঃ কি ভাগ্য আমার।"

"ভাগ্য ফাগ্য নয়। শোন, আমার চিঠি পেয়েছিস তো? তা হলে কর্তাকে নিয়ে ১৫ই ডিসেম্বর আসছিস? সকাল-সকাল চলে আসবি—সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার মধ্যে।"

"হ্যালো...কি হলো? কী কারণে নেমন্তন্ন জানতে চাইছিস? কারণ

আবার কী?"

"উঁহু। বিশ্বাস হচ্ছে না। নিশ্চয় একটা কিছু কারণ..."

"উঃ! মণিদীপা! তোদের মনটা বড্ড কূটকচালে! সব ব্যাপারে কারণ খুঁজে বেড়াতে চাস। কারণ কিছু নেই...কতকাল পরে কলকাতায় ফিরে এসেছি...একদিন পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পুনর্মিলন হবে না?"

আমার বান্ধবী মণিদীপা রায়চৌধুরী এখনও বোধহয় বিশ্বাস করতে চাইছে না।

আমি বললাম, "মনোময় অনেকদিন থেকেই বলছে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে একদিন একটু হৈ-চৈএর ব্যবস্থা করো। কিন্তু হয়ে উঠছিল না। বাবার ব্যাপারটা তো জানিস, এতোদিনে একটু সামলে নিয়েছি।"

মণিদীপা এখনও আমাকে জেরা করছে। উত্তরে আমারও যে আসল কথাটা বলবার লোভ হচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু মনোময়ের বারণ। মনোময় বলে, "লোককে একদিন বাড়িতে ডাকবে তো এমনি ডাকো। কোনো একটা উপলক্ষের গন্ধ থাকলেই নিমন্ত্রিতদের অর্থদন্ড দিতে হয়। একটা কিছু উপহার ছাড়া কেউ বাড়িতে ঢুকবে না।"

টেলিফোনের অন্যপ্রান্তে বান্ধবী মণিদীপা এখনও হ্যালো, হ্যালো করছে।

আমি জানালাম, "মনোময় বিশেষ করে তোর কথা বলেছে! তোকে কতদিন দেখে নি!"

"তুইও তো আমাকে অনেকদিন দেখিস নি মালবিকা।"

"আমি দেখেছি তোকে নিউ মার্কেটের বুকশপের কাছে— সুসজ্জিতা, প্রস্ফুটিতা মণিদীপা রায়চৌধুরীকে! আমার মুখে তোর সেই বর্ণনা শোনার পর থেকেই মনোময় রোজ তাগাদা দিচ্ছে, মণিদীপাকে বাড়িতে ডাকো।"

"ওমা! সে তো আধমিনিটের জন্যে তুই আমাকে দেখলি। আর তখন তো বিকেল চারটে—মুখে তেল চকচক করছে— সুসজ্জিতা কী করে হলাম, মালবিকা?"

"তার মানে বোঝা যাচ্ছে, তুই সেই বিরল বাঙালিনীর একজন,

প্রস্ফুটিতা অবস্থায় যাঁদের সাজসজ্জার প্রয়োজন হয় না।"

"মনোময় তোর বাংলাটার খুব উন্নতি করিয়ে দিয়েছে।" মণিদীপা এবার আমাকে মৃদু আক্রমণের চেষ্টা করলো।

ওর কথায় কান না দিয়ে আমি বললাম, "যাই হোক তুই আসছিস। একলা নয়—সঙ্গে অবশ্যই থাকবে তোর হেড অফ দ্য ডিপার্ট।"

আরও কয়েকটা ফোন করবার প্রয়োজন আছে আমার। আমি নিজেই ঠিক করে দিয়েছি, আগামী ১৫ই ডিসেম্বর কারা কারা আমাদের বাড়িতে আসবে। যাদের আমি পছন্দ করতাম, যাদের আমি অনেক দিন দেখি নি, যাদের সঙ্গে এই শহরে ফিরে আসবার পরে তেমন যোগাযোগ হয়ে ওঠে নি, তাদের আমি নেমন্তন্ন করছি।

মনোময়কে আমি কয়েকবার অনুরোধ করেছি, তুমি যদি নিমন্ত্রিতদের লিস্টিটা একবার দেখে নাও। দেখবো বলে কাগজটা সেই যে ও ব্যাগে পুরে নিয়েছে তারপর আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। গতকালও আমি মনোময়ের ব্যাগ তল্লাসি করেছি—কাগজটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নিজের নিতান্ত ব্যক্তিগত কাগজও অফিসের পি-এর হাতে তুলে দেবার বদ অভ্যাস আছে ওর।

এর জন্য মনোময় খুব কায়দা করে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। বলেছে, "পিটার ড্রুকার, নর্থকোট পার্কিনসন থেকে আরম্ভ করে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের বাঘা-বাঘা বিশেষজ্ঞরা সবাই ম্যানেজারদের স্ত্রীকে মান্য করতে উপদেশ দিয়েছেন।"

"মুখে তো খুব পত্নীপ্রেম! কিন্তু কাজে তো কিছুই দেখা যায় না।" আমি একটু রাগ দেখাবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমি কিছুতেই ওকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারি নি। আমি যে ব্যর্থ হচ্ছি তা বুঝতে পারছিলাম—ওর ব্যক্তিত্বের কাছে আমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ি। অথচ চিরদিন তো এমন ছিল না। একদিন—মানে এই ক'বছর আগে এই মনোময়ই তো ছিল আমার খেলার পুতুল। আমিই নিজের ইচ্ছামতো ওকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। তখন একবার

কে যেন বলেছিল, মনোময় যদি যন্ত্র হয়, তা হলে তুমি যন্ত্রী। মনোময় একটা গাড়ি, তুমি তার ড্রাইভার।

এই ভোরবেলায় বেডরুমের দরজা খোলার আগে এসব কথা মনে আনবার নয়। কাজকর্মবিহীনা গৃহলক্ষ্মীরা দুপুরবেলায় আকণ্ঠ ভোজনের পরে এই ধরনের চিন্তায় বিভোর হতে পারেন। এখন আমার হাতে অনেক কাজ। তবু মনোময়ের দিকে তাকাচ্ছি আমি। আমার সমস্ত মাধুর্য ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি, অথচ ওকে আয়ত্তে আনতে পারছি না ভাবতে খুব কষ্ট লাগছে।

মনোময় সেদিন আমাকে মনোরঞ্জনী বাণী শোনাতে আরম্ভ করেছিল। "কাগজটা খুঁটিয়ে দেখব বলে আমি আপিসের টেবিলে রেখেছিলাম। আর্জেন্ট পেন্ডিং ফাইলের মধ্যে আমার পি-এ নিশ্চয় ঢুকিয়ে ফেলেছে। কালই পেয়ে যাবে তুমি, সেই সঙ্গে আমার 'বিনীত' মতামত ইফ এনি, আপনার সুবিবেচনার জন্যে।"

আমি তখন রেগে ওঠবার চেষ্টা করেছি। মাঝে মাঝে রাগ দেখানো বিশেষ প্রয়োজন—পৃথিবীতে কেউ, এমন কী স্বামী পর্যন্ত তোমাকে যেন হাতের পাঁচ না মনে করে। মণিদীপা সেদিন টেলিফোনে বলেছিল, "যেসব মেয়েরা টেকন ফর গ্র্যানটেড অর্থাৎ হাতের পাঁচ হয়েছে তারা ভুগেছে। তোমার উপস্থিতি যেন স্বামী সারাক্ষণ অনুভব করেন—" মেক ইওর প্রেজেন্স ফেল্ট-এর ইংরিজী অনুবাদের চেষ্টা করেছে মণিদীপা রায়চৌধুরী।

কিন্তু মনোময় আমাকে রাগ দেখাবার সুযোগ দেয় নি। সে বলেছিল, "বশংবদ স্বামী না-হওয়ার কোনো যুক্তি নেই মালবিকা। ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে পৃথিবীর টপ একশ কোম্পানির এক নম্বরদের যে খবর বেরিয়েছে তাতে বলছে সাড়ে-সাতানব্বই জনই স্ত্রীর নিতান্ত অনুগত হাজবেন্ড।"

"সমস্ত হিসেবটা নিশ্চয় মিথ্যা—না হলো সাড়ে-সাতানব্বই জন কেমন করে হয়?" আমি বলেছিলাম মনোময়ের মুখের ওপর। ওর অফিস থেকে নিয়ে আসা জার্নালগুলো আজকাল আমিও মাঝে-মাঝে উল্টে দেখি।

মনোময় মোটেই দমবার পাত্র নয়। খুব উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, "ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল কখনও হিসেবে ভুল করে না। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত অর্থনৈতিক সংবাদপত্র।"

"তা হলে, একটা লোক নিশ্চয় অর্ধেক স্ত্রীর বশংবদ এবং অর্ধেক বেপরোয়া।"

মনোময় বলে উঠলো, "আমি তোমার কোনো সন্দেহ রাখবো না, মালবিকা। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল পরামর্শ দিয়েছে, যেসব মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় হতে চায় তাদের অবশ্যই স্ত্রীর বাধ্য হয়ে চলার মানসিকতা বিকশিত করতে হবে।"

"বটে !" মনোময়ের দুষ্টুমি আমি ধরতে পারছি।

দমলো না মনোময়। এই গুণটা আগে ছিল না ওর, এই ক'বছরে সে যথেষ্ট আত্মোন্নতি করেছে। মনোময় বললো, "ওই যে একশ জনের মধ্যে সাড়ে-সাতানব্বই জন—ওই ব্যাপারে কয়েক হাজার চিঠি এসেছিল বিভিন্ন দেশের গৃহিণীদের কাছ থেকে। তাঁদের প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়েছে ওয়াল স্ট্রীট। সম্পাদক বলেছেন, প্রত্যেক বড় কর্তা এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে আলাদা আলাদা ফর্ম পাঠানো হয়েছিল। একটি ক্ষেত্রে স্ত্রী অনুযোগ করেছেন স্বামী তাঁর বাধ্য নন, অথচ কর্তা দাবী করেছেন তিনি অনুগত। ওখানেই একটা নম্বর অর্ধেক হয়ে সাড়ে-সাতানব্বই-এর সমস্যা সৃষ্টি করেছে !"

আমি এখন আবার মন দিয়ে টেলিফোনে ডায়ালিং শুরু করেছি। দূরভাষ যন্ত্রে কথা বলার পক্ষে এইটাই প্রশস্ত সময়—কারণ প্রত্যেকের কর্তাটি এই সময় হাতের গোড়ায় রয়েছেন। 'ওঁকে জিজ্ঞেস করে জনাবো' বলে এড়িয়ে যাবার সুযোগ পাবে না কোনো বান্ধবী।

এই দেখুন ! মিসেস বিশ্বাসও জিজ্ঞেস করছেন, নেমন্তন্নর কারণটা। অকারণেও যে নেমন্তন্ন করা যায় তা এই শহরের লোকেরা ভুলতে বসেছে।

মিসেস বিশ্বাস খুব রোমান্টিক। জিজ্ঞেস করলেন "বিবাহবার্ষিকী নাকি ?"

"মোটেই না, মিসেস বিশ্বাস। আমাদের বিয়ে হয়েছিল ৯ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল।"

"ওই দিনটায় নতুন করে হনিমুন প্র্যাকটিশ করেন বুঝি ?" মিসেস বিশ্বাসের কৌতূহলী প্রশ্ন। জেরা চালিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছেন ভদ্রমহিলা ! "তাহলে কি, মিসেস মজুমদার ওই দিন বড় কোনো অঘটন ঘটেছিল ?"

"ওই রকম একটা ধরে নিন না মিসেস বিশ্বাস। যেমন..."

"ও আন্দাজ করতে পারছি এবার, মিসেস মজুমদার। বম্বেতে আমার এক বান্ধবীও বিবাহবার্ষিকী পালন করে না, ওরা হৈ-চৈ করে যেদিন ওদের প্রথম দেখা হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি প্রথম পরিচয়ের দিনটাই তো সবচেয়ে স্মরণীয় তারিখ।"

"আপনারাও তাই করেন নাকি ?" মিসেস বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করি।

"ও গুড়ে বালি ! আমাদের প্রথম দেখা তো ছাঁদনাতলায়। মিস্টার বিশ্বাস খুব রসিক। উনি বলেন, আমাদের সেলিব্রেট করা উচিত সেই দিনটা যেদিন আমাদের ঘটক এবং তোমাদের ঘটক শিবপুর আশ্রমের সামনে দেখা করে দু'জনের কোষ্ঠী বদল করেছিলেন।"

আমি আবার টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছি। রং নাম্বার হয়ে গেলো। একটা লোক ঘুমের ঘোরে ফোন তুলে নারীকণ্ঠস্বর শুনে নোংরা কথা বললো। পুরুষমানুষরা যে এখনও পশু আছে তার প্রমাণ প্রায়ই পাওয়া যায় এই টেলিফোনে। যেহেতু ধরা পড়বার বা পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই সেহেতু সভ্যভব্য বহু লোক কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করতে লজ্জা পায় না। টেলিফোনের তার বেয়ে নর্দমার জল যেন কানে ঢুকছে—সমস্ত দেহটা এই সকালে নোংরা হয়ে গেলো। শরীরটা ঘিন ঘিন করছে আমার।

"অসভ্য জন্তু কাঁহাকার," এই বলে ফোনটা বোধ হয় একটু জোরেই নামিয়ে দিয়েছি আমি।

সেই আওয়াজেই মনোময়ের ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ না খুলেই

মনোময় বিছানায় আমাকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। অগত্যা বাধ্য হয়েই আমাকে ওর কাছে সরে আসতে হলো।

আমি এখন এই ভদ্রলোকের ছেলেমানুষীর খেলনা। আধাঘুমন্ত অবস্থায় ও আমাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছে যেন আমি পালাবার চেষ্টা করছি।

"এই ছাড়ো, অনেকক্ষণ হয়ে গেলো।" আমার শান্ত, ভদ্র এবং সঙ্গত আবেদন বোধ হয় ওর কানে পৌঁছলো।

"আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, তুমি আমাকে বলছো, অসভ্য জন্তু কাঁহাকার।"

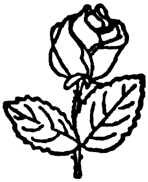
"বলেছি। তবে তোমাকে নয়। একটা নোংরা পুরুষমানুষকে।"

"এ্যাঁ ! কখন ? কোথায় ?"

"এখনই। টেলিফোনে। শ্রাবন্তীকে টেলিফোন করতে গিয়ে।"

"শ্রাবন্তী ? কিন্তু নোংরা পুরুষটা কে ?"

"আঃ মনোময় ! তুমি এখনও ঘুমের ঘোরে রয়েছো। চোখে জল দিয়ে এসো। তারপর সব শুনবে। সুযোগ পেলেই এ দেশের পুরুষগুলো এক একটা জানোয়ার হয়ে ওঠে।" আমার রাগটা বেশ চড়ে গিয়েছে।



সাঁইত্রিশ বছরের মনোময় মজুমদার এবার ফোম রবারের বিছানা থেকে যেভাবে মেঝের নাইলন কার্পেটে লাফিয়ে পড়লো তাতে ফুটবল প্লেয়ারদের খেলার মাঠে নামার কথা মনে পড়ে যায়।

মনোময়ও ফুটবল খেলেছে—কিন্তু সে তো কবেকার কথা। একবার দু'বার মালবিকাও বোধ হয় ওকে খেলার মাঠে দেখেছে। যে মনোময়কে ক্লাসরুমে রোজ দেখতো মালবিকা সেই মনোময় বুট, জার্সি এবং পরিবেশের কল্যাণে অন্যরকম হয়ে যেতো। সাধে কি আর বিদেশী

কলেজে নারীহৃদয়বিজয়ী পুরুষরা ক্রীড়াকুশলী ! মেধাবী ছাত্রদের বাজার দর ওখানে অনেক কম।

মনোময়ের দল সেবার অনেকগুলো গোল খেয়েছিল, তবু মালবিকার ভাল লেগেছিল মনোময়ের দ্রুতসঞ্চার—কেমন অবলীলাক্রমে সে মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত চকিতচরণে বিচরণ করছিল।

মনোময়ের মনে আছে, মালবিকা পরে বলেছিল, "গোল খেয়েছেন বটে, কিন্তু সেদিন আপনাকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।"

মনোময় ছিল লাজুক। জোর দিয়ে কিছু বলার অভ্যাস তখনও সে আয়ত্ত করে নি। সে হেসে উত্তর দিয়েছিল, "বন্যেরা বনে সুন্দর এবং প্লেয়াররা মাঠে।"

এখন অনেকদিন খেলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই মনোময় মজুমদারের। ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে নামার সময়েই চকিতে একবার পুরনো মনোময়কে মুহূর্তের জন্য খুঁজে পাওয়া যায়।

চোখে জলের দ্রুত ঝাপটা দিয়ে মনোময় মজুমদার ঘরে ফিরে এলো। মালবিকার টেলিফোন বিভ্রাট কিছুটা সে আন্দাজ করতে পারছে। এই ভুতুড়ে ফোন-কলের নোংরামী কোনো কোনো মধ্যবয়সিনী নিজেদের অজ্ঞাতসারেই উপভোগ করে থাকেন। মুখে হম্বিতম্বি হয়, কিন্তু হৃদয়ে বয়ঃসন্ধি ও মধ্যযৌবনের পুলক উপস্থিত হয়। মালবিকার বান্ধবী শ্রাবন্তী মজুমদার একবার কথাটা বলেছিল, কিন্তু মালবিকার এখন যা মেজাজ তাকে তা মনে করিয়ে না দেওয়াই ভাল।

মনোময় বললো, "রাস্কেল ! তোমার ফোন নম্বরটা জানতে পারে নি তো ?"

"কেন ? জানলে কী হবে ?" মালবিকার কণ্ঠে উদ্বেগ।

"সময়ে-অসময়ে জ্বালাবে," মনোময় গম্ভীরভাবে জানিয়ে দেয়।

"সর্বনাশ। অসভ্যগুলোকে ধরবারও তো কোনো উপায় নেই।"

মালবিকার উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে। টেলিফোনে সে একবার বলে ফেলেছে, মিসেস মনোময় মজুমদার কথা বলছি। তার থেকে লোকটা হয়তো নম্বরটা বের করে বসবে।

সাত-সকালে কি হাঙ্গামায় পড়া গেলো! মনোময় ভরসা দিলো, "কোনো চিন্তা নেই। প্রয়োজন হলে টেলিফোনে কে অসভ্যতা করছে তা ধরা যায়—তবে একটু কাঠখড় পোড়াতে হয়।"

"আমি তাহলে কী করবো?" মালবিকার স্বরে এখনও অস্বস্তি। মেয়েরা এতো অল্পে ভয় পায়! মনোময় একটু অবাক হয়ে যায়। নানা কাজে মালবিকা প্রিয়সখীর মতো তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহস জুগিয়েছে, অভয় দিয়েছে, ঘোর দুর্যোগেও আত্মবিশ্বাস হারায় নি, অথচ সামান্য একটা নোংরা টেলিফোনে কীরকম ভয় পেয়েছে।

"কোনো চিন্তা নেই। এ রোগের একটাই ওষুধ—কোনো রকম আস্কারা না দেওয়া, কে কল করছে বোঝামাত্র ঝটতি ফোন নামিয়ে ফেলা।" মনোময়ের উপদেশ মালবিকা শুনে নেয়।

এই সময় মালবিকা কী চায় তা আন্দাজ করতে পারে মনোময়। এই বিজন শয়নমন্দিরে পাশাপাশি শুয়ে-শুঁয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলার ইচ্ছে তার। কত কথাবার্তা জমা হয়ে থাকে মালবিকার বুকে—বিশ্বসংসারে কত কী ঘটে যাচ্ছে, যার ছায়া পড়ছে ওর মনে। এক সময় ওর বাবা আদরের মেয়ের সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনতেন।

ইস্কুলের গল্প, বন্ধুদের কথা, পথের নানা বিক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ, এমন কি সিনেমা দেখা হলে চলচ্চিত্রের চরিত্রদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার সংক্ষিপ্তসার মালবিকা বলে যেতো বাবার কাছে অনর্গল। বাবা খুব মন দিয়ে শুনতেন, মেয়ের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সঙ্কটে অংশগ্রহণ করতেন। মালবিকার বুকটাও হাল্কা হয়ে যেতো—মনের অন্ধকার কোণে সংশয়ের বোঝা জমা করে রেখে নিরন্তর পাহারা দিতে হতো না।

কলেজের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনোময়ের সঙ্গে মালবিকার পরিচয়। মালবিকা মুখার্জি তখন কফি হাউসে, লাইব্রেরীতে, এমন কি বাসে-ট্রামে কত অবান্তর বিষয়ে অনর্গল আলোচনা করেছে মনোময়ের সঙ্গে।

মনোময়, সেসব কথা কি তোমার এখন মনে আছে? মালবিকার ওই সব কথা তখন কত মন দিয়ে শুনতে তুমি, ওর প্রত্যেকটি ভাবনা

চিন্তায় অংশ নেবার জন্যে তখন কত আগ্রহ তোমার। তারপর একবার কলেজ লাইব্রেরীর বসন্তবাবু নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে মনোময়কে বললেন,"এতো কথা কেন ?" বসন্তবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি, যা কিছু শাসন মনোময়কেই করলেন, কিন্তু মালবিকা জানে সেদিন মনোময় একটা কথাও বলে নি, সে চুপ করে মালবিকার কথাই শুনে যাচ্ছিল।

কিন্তু মনোময় সেদিন আদর্শ পুরুষের কাজটি করেছিল—দোষটা মালবিকার দিকে ঠেলে না দিয়ে নিজেই নিয়েছিল। যদিও মালবিকা পরে বলেছিল, "আমার খুব খারাপ লাগলো। আপনি আমার দোষ ঘাড়ে নিলেন কেন ? আপনার মতো স্টুডেন্টকে কেউ অন্যায়ভাবে অপমান করলে খারাপ লাগে।"

"সামান্য ব্যাপার" বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল মনোময়। কিন্তু মালবিকা পরের দিন বললো, "খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। বাবা সব শুনে বললেন, বসন্তবাবুকে আমারই বলা উচিত ছিল দোষ আমার।"

কী আশ্চর্য ! সামান্য এই ব্যাপারেও বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেছে মেয়েটা ! মালবিকা বললো, "জেনে রাখুন, এই পৃথিবীতে যে যার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে—বাবা আমাকে সংস্কৃত থেকে পড়ে শোনালেন।"

"কৃতকর্ম অপরের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা যায় না ?" মনোময় হেসে জিজ্ঞেস করেছিল।

"প্রাচীন ঋষিরা তাইতো বলেছেন।" মালবিকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে।

মনোময় হেসে উত্তর দিয়েছিল, "প্রাচীন ভারতে হিসাবশাস্ত্র তেমন উন্নত ছিল না। এ যুগের অ্যাকাউনটেন্টরা হামেশাই যা ইচ্ছে ট্রান্সফার করছে—একের কর্মফলে অপরের সুখ অথবা দুঃখ ভোগ হচ্ছে।"

পরের দিনটা এখনও মনোময় বিস্মৃত হয় নি। মালবিকা সেদিন একটা বাংলা তাঁতের হাল্কা সবুজ শাড়ি পরেছিল। লাইব্রেরীতে কথা না বলে মালবিকা সেদিন একটা স্লিপ এগিয়ে দিয়েছেন। তাতে লেখা ঃ "আপনি একটা সার্টিফিকেট পেয়েছেন।"

"কে দিয়েছেন?" জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল মনোময়।

"আপনার কথাগুলো বাবাকে বলেছি। সব শুনে বাবার মন্তব্য, ছেলেটি বেশ ইনটেলিজেন্ট।"

স্লিপে আর কত লেখালেখি করা যায়? লাইব্রেরী থেকে ওরা দু'জনে বেরিয়ে এসেছিল। মালবিকা তখন মিষ্টি গলায় শোনাচ্ছে, "বাবা বলছিলেন, ব্রহ্মলোকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ অচল। পূর্ণ থেকে পূর্ণ বিয়োগ করলে পূর্ণই থেকে যায়। উঃ কী একটা খটমট স্যানসক্রিট কোটেশন...দাঁড়ান....ওঁ পূর্ণমিদং...."

একদম গোলমাল করে ফেলেছে মালবিকা। "ভেরি স্যরি, গতকাল তিন-চার বার রিহার্সাল দিয়েছি...তবু মনে করতে পারছি না।"

মৃদু হেসেছিল মনোময়। তারপর স্তোত্রটা নিজেই শুনিয়ে দিয়েছিল মালবিকাকে ঃ

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায়— উহা পূর্ণ ইহাও পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন; পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।"

"শ্লোকটা আপনি জানেন!" মালবিকার কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। "বাবা বলছিলেন, এটা ধর্মের কথা, আবার অঙ্কশাস্ত্রের চূড়ান্ত প্রতিবাদ্যও বটে—যা বিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানীরা সত্য বলে অনুভব করছেন। কিন্তু আপনি মুখস্থ বললেন কী করে? আমার বাবা বয়স্ক মানুষ—উপনিষদ, বেদান্ত এই সব নিয়েই থাকেন।"

মনোময় হেসে উত্তর দিয়েছিল, "আমরা যে ইস্কুলে পড়েছিলাম সেখানে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করতে হতো।"

"কী ভাগ্যবান আপনারা! আমাদের কনভেন্ট ইস্কুলে এসব শেখানো হয় নি। বুড়োবয়সে শিখবো বলে তুলে রেখে দিয়েছি।"

মনোময় তখন যা বলেছিল, তাও এই ভোরবেলায় আবার মনে পড়ছে। "আমাদের ইস্কুলের সুধাংশুবাবু স্যর বলতেন—ছোটবেলাটাই শাস্ত্রশিক্ষার শ্রেষ্ঠ সময়—রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ যদি

কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে উপকারে না লাগলো তাহলে বার্ধক্যে ওসব মুখস্থ করে কী কাজ হবে?"

কলেজ জীবনে মনোময়ের সঙ্গে অনেক ঘুরেছে মালবিকা। আপনিটা কবে তুমি হয়ে গিয়েছে। মালবিকা বলেছে,"তোমার সঙ্গে আমার কত তফাৎ। উপনিষদের বাণী তুমি কণ্ঠস্থ করেছো অথচ বিশ্বাস করো না; আর আমি ওসব ভালভাবে মনে রাখতে পারি না, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করি।"

তারপর তো বেশ কিছুদিন কেটেছে—গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গিয়েছে। এখন মালবিকা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকটা কাজের কথা সেরে নেবার জন্যে।

"শোনো, অনেকগুলো কাজের কথা আছে। আজকের তারিখটা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। ১৪ই ডিসেম্বর। ১৫ই ডিসেম্বর আসতে আর চব্বিশ ঘণ্টাও দেরি নেই।" মালবিকা মিষ্টি গলায় স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলো।

মনোময়ের কানে কথাগুলো কি ঢুকেছে? না অন্য কোনো চিন্তায় সে ইতিমধ্যেই বুঁদ হয়ে আছে?

"হ্যাঁ, আজ চোদ্দই ডিসেম্বর।" দায়সারা ভাবে উত্তর দিচ্ছে মনোময়, যেন আসন্ন ১৫ই তারিখের কোনো গুরুত্ব নেই তার জীবনে।

"শোনো মশাই, তুমি যেরকম চেয়েছিলে সেরকমই হচ্ছে" মালবিকা এবার কৃতী স্বামীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে।

ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে মনোময়। এই ঘড়ির দিকে তাকানোর অর্থ বোঝে মালবিকা। ঠিক এই সময় এ-বি-সি ড্রাগসের রিষড়া কারখানা থেকে একটা ফোন আসে। এই ফোনের দেরি সহ্য করতে পারে না মনোময়।

অভিমানে ফুঁপিয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে মালবিকার। ভোরবেলায় যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে—যখন বিশ্বসংসারে কোনো অফিসার কাজ আরম্ভ করে নি, তখন না আসা একটা অফিস ফোনের

কথা ভেবে একমাত্র মনোময়ই স্ত্রীকে অবহেলা করতে পারে।

মালবিকার ইচ্ছে হলো স্বামীকে বলে, "আশ্চর্য তোমার এই তথাকথিত পেশাদার ম্যানেজাররা। যেখানে যেমন তোমরা সেখানে তেমন। মনোময়, তোমাদের মতো মানুষকে বোঝা সত্যিই শক্ত। এই তো, কয়েক মাস আগে তুমি কলকাতার এ-বি-সি ড্রাগস্ কোম্পানিকে চিনতে না, রিষড়ার এই রকম কোনো কারখানা যে পৃথিবীর বুকে টিকে আছে তাও বোম্বাইতে বসে তুমি জানতে না। বেশ চলে যাচ্ছিল বিশ্বসংসার। তখন বম্বে থেকে মাইল কয়েক দূরে কালোয়ার ওই কেমিক্যাল কারখানা নিয়েই তোমার যত কিছু ভাবনা-চিন্তা।"

মালবিকা মনে মনে বলে যাচ্ছে, "মনোময়, তখন তোমাকে দেখে মনে হতো, কালোয়ার ওই কারখানা এবং কোম্পানিকে বাঁচাবার জন্যেই তুমি পৃথিবীতে এসেছো—ওই কেমিক্যাল কারখানাটা ছাড়া জগৎসংসারের কিছুই. জানো না তুমি।"

আর এই ক'মাসের ব্যবধানে মনে হচ্ছে, কালোয়ার বলে কোনো জায়গাই চেনে না মনোময়। শ্রীরামপুরের কাছে রিষড়ার এ-বি-সি ড্রাগসের এক নম্বর কারখানার জন্যেই যেন মনোময় মজুমদার ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছে।

আড়চোখে মনোময় যতই ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে মালবিকার রাগ ততই বাড়ছে। রিষড়া থেকে ফোন আসতে দেরি হলে স্বামী কেন চিন্তিত হয়ে পড়ে মালবিকা নিশ্চয় এতদিনে বুঝতে পেরেছে।

মোটেই বোঝে নি মালবিকা। বোঝবার একটুও ইচ্ছা নেই তার। "তুমি কি আমার দুটো কথা শুনবে?" একটু বিরক্তভাবেই মনোময়ের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলো মালবিকা।

মনোময় তার পোলারয়েড কালার-কারেকটেড লেন্সের স্টীল ফ্রেম চশমাটা পরে নিয়েছে—আলোর ঔজ্জ্বল্য অনুযায়ী এর কাঁচ এক-এক কলেবর ধারণ করে—যে পরেছে সে সব দেখতে পায়, কিন্তু মনোময়কে বুঝতে মালবিকার বেশ অসুবিধা হয়।

হাল্কা রঙিন চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকাচ্ছে জমনলাল বাজাজ

ইনস্টিটিউট্ অফ ম্যানেজমেন্টের একদা অনারারি ভিজিটিং লেকচারার মনোময় মজুমদার। বোম্বাই ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরুণতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোময় মজুমদার এবার অনেক চেষ্টা করে যেন নিজের স্ত্রীর জন্য খানিকটা সময় স্পেয়ার করতে প্রস্তুত হয়েছেন।

"শোনো, যাদের বলবার আমি সবাইকে বলে দিয়েছি। আমার মনে হয় সবাই আসবে। তোমার এবং আমার ইনভিটেশন অবজ্ঞা করার মতো দম্পতি খুব বেশী নেই। খুব বেশী লোক ডাকা হচ্ছে না—তুমি যা বলেছিলে। সাত-আট জনের বেশী অতিথি থাকলে ডিনার পার্টিটা বাজার হয়ে যায়। আর জানো....."

"কী জানবার আছে আমার ?" মনোময় এমনভাবে প্রশ্ন করছে যে মালবিকার মনে হলো এই কয়েক মুহূর্তে যুগলশয্যা থেকে সে দূরে বহুদূরে কোথায় সরে গিয়েছে।

এই মনোময় মজুমদারই কি একদিন মালবিকার জন্যে দু' ঘণ্টা কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের সামনে দাঁড়িয়েছিল ? মালবিকা না আসায় এবং ট্রামবাসের জট পাকিয়ে কলকাতার জনপরিবহন বিপর্যস্ত হওয়ায় পায়ে হেঁটে ভবানীপুরের নন্দন রোডের বাড়িতে হাজির হয়েছিল কি এই মনোময় ? মনোময়ের তখনও মালবিকার বাড়িতে ঢুকবার ঢালাও স্বাধীনতা ছিল না।

চাকর এসে মালবিকাকে বললো, কে একজন লোক দিদিমণিকে ডাকছে। মালবিকা সেদিন প্রত্যাশাই করে নি মনোময়কে দেখবে। "তুমি !" অবাক হয়ে গিয়েছিল মালবিকা। "ট্রামবাসের হাঙ্গামা দেখে আজ আর এগোই নি কলেজ স্ট্রীটের দিকে। আমি ভেবেছিলাম কারণটা তুমি আন্দাজ করে নেবে।"

"রাস্তাঘাটে একলা-বেরনো কোনো মেয়ের সবটা আন্দাজ করে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় মালবিকা ?" মনোময়ের সেদিনের গলার স্বরটা শুনতে পাচ্ছে মালবিকা।

"তুমি এলে কী করে ?" মালবিকার প্রশ্নের উত্তরে খুব হাল্কাভাবে মনোময় বলেছিল, "এই চলে এলাম—তেমন কোন অসুবিধা তো

হয়নি।”

সেদিন মনোময়কে বাড়ির ভিতর আসতে বলতে পারে নি মালবিকা। পরে যখন সে শুনেছে ভবানীপুর থেকে বাগবাজার পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটা মনোময়কে পায়ে হেঁটে ফিরতে হয়েছে তখন খুব লজ্জা হয়েছে। আবার একটু গর্ব এবং আনন্দও হচ্ছিল এই ভেবে যে পৃথিবীতে বাবা ছাড়া এমন একজন মানুষ আছে যে মালবিকার জন্য চিন্তা করে, বিপদ-আপদের কথা ভেবে মাইলের পর মাইল পথ হাঁটতে দ্বিধা করে না।

মনোময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বহুকাল আগের সেই ছোকরা মনোময় মজুমদারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মালবিকা। কিন্তু আজকের মনোময়ের চোখে-মুখে এই মুহূর্তে অধৈর্যের ছাপ। বাধ্য হয়ে মালবিকা কাজের কথাটা সেরে ফেলতে চাইলো, “ওদের বলেছি, এমনি নেমন্তন্ন। কতদিন পরে কলকাতায় ফেরা হয়েছে তাই আমাদের একটু গল্পগুজবের ইচ্ছা। আমি বলি নি, ১৫ই ডিসেম্বরটা কী?”

মনোময়ের চোখেমুখে কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না। সে আদৌ কোনো মন্তব্য করতো কিনা সন্দেহ। ভাগ্যিস টেলিফোনটা বেজে উঠলো, তাই অন্তত সন্দেহের সুবিধে দেওয়া গেলো।

“হ্যালো মজুমদার স্পিকিং.......গুড্ মর্নিং......মল্লিক.......কী ব্যাপার আপনার? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?”

প্রিয়ব্রত মল্লিককে দেখেছে মালবিকা। বয়সে মনোময়ের থেকে অন্তত পঁচিশ বছরের বড়। কিন্তু যেহেতু তিনি অফিসে জুনিয়র, মনোময় কেমন অবলীলাক্রমে ওঁকে শাসন করছে....এমনভাবে কথা বলছে যেন মল্লিক ওর থেকে দশ বছরের বয়োকনিষ্ঠ। আগে তো মনোময় এমন ছিল না।

“হ্যালো....হ্যালো.....কী বললেন? নাইট শিফ্‌টে আচমকা কামাই ছিল? হোয়াট? দু'নম্বর জেনারেটর কাজ করে নি। ডিজেল কম ছিল স্টকে।”

“লুক হিয়ার.....মল্লিক.....ফিডিং বট্‌ল ম্যানেজারদের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে......আশাকরি আপনি বুঝেছেন, কোম্পানি আপনাকে ঝিনুকবাটি উপহার দেবার জন্যে ব্যস্ত নয়......।”

নির্মম কথাগুলো কী শান্তভাবে বলে চলেছে মনোময় অথচ এই লোকটা একদিন কোনো মানুষকে আঘাত দিতে পারতো না।

নোটবুক এবং পেন্সিল হাতে নিয়ে মনোময় কীসব নোট করে চলেছে। মনোময় বলছে, "মল্লিক, যখনই আপনার ফোন আসতে দেরি হয়েছে তখনই আন্দাজ করছিলাম রিষড়ায় গত রাত্রে নিশ্চয় কোনো গোলমাল হয়েছে। রাতের প্রোডাকশন ইন-চার্জ ছিল কে? রাঘবেন্দ্র মিশ্র। কারখানা ছেড়ে যাবার আগে ওকেও একটা ফিডিং বট্‌ল কিনে উপহার দিন। বলবেন, টেলিফোনে হেড-আপিসের নির্দেশ মতো এই চুষি-বোতল দেওয়া হচ্ছে আপনাকে।"

এবার নানা পরিসংখ্যানের কথা উঠছে। মনোময় তার নোটবুক থেকে কীসব নির্দেশ দিচ্ছে, আবার কীসব অঙ্ক খাতায় টুকেও নিচ্ছে।

মালবিকা জানে এইভাবে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলবে। মনোময়ের চা তৈরি করে দক্ষিণের বারান্দায় সে অসহায়ভাবে অপেক্ষা করবে, দু'তিনবার ঘণ্টা বাজাবে মালবিকা, ঘণ্টার মেজাজ ক্রমশ চড়া হবে, তারপর টেলিফোনটা হাতে নিয়ে লম্বা তার খুলতে-খুলতে মনোময় ব্যালকনিতে হাজির হবে.....চায়ের কাপটা ঠোঁটে ঠেকোবার আগে সে বলবে, "হ্যালো মল্লিক......লাইন কাটবেন না.....ওয়ান মিনিট।"

মালবিকা লক্ষ্য করেছে ওদের আলোচনার বিষয় প্রতিদিনই এক। একই শব্দ প্রতিদিন রিষড়া থেকে টেলিফোনে বাহিত হয়ে এই বাড়ির পুরুষমানুষটিকে আক্রমণ করে, ঠিক তখনই ভোরের সূর্য বাড়ির পূর্বমুখী বারান্দাকে তরল সোনায় উজ্জ্বল করে তোলে। বারান্দার অপর অংশে অতিদূর বঙ্গোপসাগর তখন মধুর বাতাস উপহার পাঠায়, সযত্নে পরিচর্যিত টবের আদুরে গাছগুলো রঙিন ফুলের ডালি নিয়ে তখন মালবিকা এবং মনোময়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু সাপের মতো ওই টেলিফোনের তারটা এ বাড়ির পরিবেশ বিষাক্ত করে দেয়।

আজও তাই চলেছে, মনোময় মজুমদার মাঝে মাঝে চাপা বিরক্তি প্রকাশ করছে; আবার কখনও সে একমনে কীসব কথা শুনে

যাচ্ছে—গতরাত্রে রিষড়ায় এ-বি-সি ড্রাগস্ কারখানায় যেন মহাভারতের নতুন কোনো পর্ব রচিত হয়েছে।

মালবিকা নিজের চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে এক-একবার অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে এ-সংসারের নায়কের দিকে—তার নিজের হাতে-গড়া নায়ক বললে কি বিশেষ বাড়িয়ে বলা হবে?

মনোময়কে একটু আগেই সে মনে করিয়ে দিয়েছে আসন্ন জন্মদিনের কথা। কিন্তু কই? কোথাও কোনও উচ্ছ্বাস নেই, উৎসাহ নেই, উত্তাপ নেই। আধা-বাংলা, আধা-ইংরিজী, আধা-হিন্দীতে ততক্ষণ প্রোডাকশন, প্ল্যানিং, কাঁচা মাল, এনার্জি, অনুপস্থিতি, ওভারটাইম নিয়ে শত সহস্র শব্দের জবুরী বিনিময় চলেছে।

মনোময়ের কি খেয়াল আছে যে একদা-বান্ধবী এবং বর্তমানে স্ত্রী মালবিকা অনেকক্ষণ তার সান্নিধ্যভিখারিণী হয়ে বসে আছে?

আর সেই সব দিনগুলো?

চকচকে ঝকঝকে স্পার্কলিং মালবিকা মুখার্জির বুকটা সেদিন কেন যে একটা সাধারণ, লাজুক, বিষণ্নবদন যুবকের জন্যে কেঁদে উঠেছিল?

কী ছিল ওই মনোময়ের মধ্যে? ভাবতে লাগলো মালবিকা। পড়াশোনায় ভাল ছিল মনোময় অবশ্যই। কিন্তু জামাকাপড়ে ওর অতিসাধারণ সাংসারিক অবস্থার সুনিশ্চিত ছাপ ছিল। অনেকেই অসচ্ছল পরিবার থেকে কলকাতার কলেজে পড়তে আসতো, কিন্তু তাদের শার্ট-প্যান্ট-জুতো সে-কথা উঁচুগলায় ঘোষণা করতো না।

মনোময়ের ছিল আশ্চর্য দুটো চোখ! শ্যামল ও সুদর্শন মনোময়ের শান্ত অথচ গভীর চোখ দুটো অজানা এক জগতের সন্ধান দিতো মালবিকাকে। ওই চোখের পথ দিয়ে, হৃদয়ের সিঁড়ি বেয়ে গভীর এক অনুভূতির সমুদ্রে প্রবেশের ইচ্ছা সুবেশিনী, সুহাসিনী, সুন্দরী এবং মেধাবিনী মালবিকাকে পেয়ে বসতো।

সেসব অনেক কথা—কেমন করে একটুকরো সাহসিকতার মধ্যে পরিচয় হলো দু'জনের। এই সাহসটুকু না দেখালে মনোময় নিশ্চয় ভুল করতো; বুকের মধ্যে যত ইচ্ছাই থাক, মুখফুটে সুতনুকা ও স্মার্ট

মালবিকা কিছুতেই মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতো না।

সেসব কথা এখনও কর্মহীন অলস অপরাহ্ণে মালবিকা যে স্মরণ করে না তা নয়। টেলিফোনে মিসেস চট্টরাজ, মিসেস ব্যানার্জি, মিসেস রাঘবন মাঝে মাঝে তাস খেলবার নিমন্ত্রণ জানান। গড্ ইজ গুড্—এই তাসের সৃষ্টি না হলে দুপুরে কলকাতার অভিজাত গৃহবধূদের কী যে হতো কল্পনা করা যায় না। অথচ মালবিকার জাতক্রোধ রয়েছে এই খেলাটার ওপর। মালবিকা একদিক থেকে ভাগ্যবতী—মনোময়ও এই খেলা পছন্দ করে না। মদ বন্ধ করার আগে সরকার যদি এই অভাগা দেশ থেকে তাস বিদায়ের ব্যবস্থা করতেন তাহলে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হতো।

বোম্বাইতে মনোময়কে একবার মালবিকা বলেছিল,"যেদিন দেখবো এই তাসের দিকে ঝুঁকেছো সেদিন বুঝবো তুমি আমাকে আর ভালবাস না।"

তাস এখনও ঢোকে নি এই বাড়িতে—যদিও মনোময় সাজেস্ট করেছে, যদি ইচ্ছে হয় দুপুরে কিছু একটা করো, নিজেকে ব্যস্ত রাখো। মালবিকা কোনো উত্তর দেয় নি। একটুখানি 'সৌন্দর্যনিদ্রা' ছাড়া বাকি সময়টা নানা ভাবনার জালে নিজেকে বন্দী করে রাখে মালবিকা।

প্রেম ও পরিণয়ের সুনির্বাচিত ফ্ল্যাশব্যাকগুলো মালবিকা দুপুরের জন্যেই তুলে রাখতে চায়। কিন্তু এই ভোরবেলায় ম্যারাথন রিষড়া টেলিফোন কলের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মালবিকা এখন সেই দিনটির কথা ভাবতে চায় যেদিন ১৫ই ডিসেম্বরের কথাটা প্রথম তার কাছে ধরা পড়েছিল।

তখন মালবিকা ও মনোময় দু'জনেই কলকাতা থেকে অনেক দূরে সেই ছোট্ট বিশ্ববিদ্যালয় শহরে পড়াশোনা করছে। কলকাতায় পড়ার পাট চুকিয়ে অনেক দূরের ওই শহরে পড়তে যাবার পরিকল্পনাটা মালবিকার। কলকাতার সব কিছুই তখন পিছিয়ে পড়ছে। জব্ চার্নকের শহরে চোদ্দ মাসে বছর। যারা কলকাতার বিদ্যাকে আঁকড়ে থাকবে তারা যে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে না সেটা বয়স কম হলেও

বুঝেছিল মালবিকা। মালবিকার বাবা আপত্তি করেন নি। ছেলেরা যেখানে খুশি পড়তে পারে, অথচ মেয়েরা পারে না, তা বিশ্বাস করতেন না মালবিকার বাবা।

দূরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকযোগে দু'খানা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আনিয়েছিল মালবিকা। এটাও একটা খেয়াল বলতে পারা যায়।

তারপর একদিন কফি হাউসে দেখা হয়ে গেলো মনোময়ের সঙ্গে। তখনকার মনোময় ভারতীয় শিক্ষাজগতের কোনো খবরাখবরই রাখতো না, বাড়িতে এসে একমনে শুধু পড়াশোনা করতো।

মালবিকা বলেছিল,"সমস্ত পৃথিবীটা কীভাবে চলেছে তার খোঁজ-খবর রাখা বিশেষ প্রয়োজন।"

মনোময় তখনও টিপিক্যাল ঘরকুনো কলকাত্তিয়া। বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে বেজায় ভীতি। "কলকাতার এতোগুলো ছাত্রছাত্রীর যা-হবে আমারও তাই হবে" এমন একটা নিশ্চিন্ত ভাব ছিল ওর মনে।

মালবিকা জানে, ইংরিজীতে একে বলে ড্রিফটিং—যে দিকে স্রোত সেদিকেই ভেসে যাওয়া, নিজের কোনো গতি নেই, লক্ষ্য নেই।

মালবিকা বলেছিল,"আমি তোমার কথায় একটুও সন্তুষ্ট হতে পারছি না, মনোময়। এ পৃথিবীতে কারও মনোস্কাম পূর্ণ হবে, কারও হবে না। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে নিজেকেই বিচার বিবেচনা করে এগোতে হবে। তুমি কি জানো না, বহু ছাত্রছাত্রী অবস্থা বুঝে যথাসময়ে কলকাতা থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ছে।"

"কেন? কলকাতার শিক্ষার কোনো সম্মান নেই বলে?" একটু বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করেছে মনোময়।

"মান-ইজ্জতের প্রশ্ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? ওটা তো সেন্টিমেন্টের কথা হলো। আসলে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে এই শহর, আর অন্য অনেক কেন্দ্রে জ্ঞানের সাধনা শুরু হচ্ছে নবীন উদ্যমে।" মালবিকা বেশ জোরের সঙ্গেই কথা বলেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মনোময়। বন্ধুর কফির কাপে চিনি ঢালতে ঢালতে মালবিকা বলেছিল, "তুমি তো খবর রাখো না—আমি রাখি।

এক সময় সারা দেশের ছাত্রছাত্রীরা আসতো আমাদের এই শহরে ; আর এখন বোম্বাই, আমেদাবাদ, দিল্লী, কানপুর, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, পিলানী এমন কি জামসেদপুরেও কলকাতার ছাত্রছাত্রী দেখতে পাবে। কলকাতা তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে।"

"ইতিহাস কি এমনি করেই প্রতিশোধ নেয় ?" বেশ দুঃখের সঙ্গে প্রশ্ন করেছে মনোময়। মালবিকার কথাগুলো বোধ হয় তার মাথার মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করেছে।

"ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি এসব তো অনেক বড় বড় কথা হলো। আমি অত বুঝি না, মনোময়। সমস্ত ভারতবর্ষটাই যখন আমার দেশ তখন যেখানে সুযোগ সেখানেই আমি যেতে চাই।"

মনোময় তখনও চুপ করে বসে ছিল। ওকে আরও একটু নাড়া দেবার জন্যে মালবিকা বলেছিল, "বাঙালীরা বেজায় ঘরকুনো—বাইরে বেরোতে আমাদের ভীষণ ভয়।"

এইবার একটু ভুল করে বসেছিল মালবিকা। উদাসভাবে মনোময় উত্তর দিয়েছিল, "সেনসাস রিপোর্ট কিন্তু তা বলে না, মালবিকা। কেরলদেশী ছাড়া একমাত্র বাঙালীরাই নিজ রাজ্যের বাইরে সব চেয়ে বেশী ছড়িয়ে আছে। তবু ঘরকুনো অপবাদ কেন জোটে আমাদের ?"

মালবিকা নিজের ভুল স্বীকার করেও হেসেছে। "ওসব তো ঐতিহাসিক খবরাখবর ! সেনসাসের ওপর ইতিহাসের ছায়া পড়ে রয়েছে। কিন্তু একালের কলকাত্তিয়ারা ঘর সামলাতেই ব্যস্ত, বাইরে যাওয়ার কথা তাদের মাথায় আসে না।"

"তুমি তাহলে কী বলছো ?" এবার একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল মনোময়।

সঙ্গে সঙ্গে মনোময়কে অবাক করে দিয়ে বিদ্যানগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা মালবিকা খাম সুদ্ধ এগিয়ে দিয়েছিল।

সেই খামটার ছবি এখনও চোখের সামনে দেখতে পায় মালবিকা—"মনোময় মজুমদার কেয়ার অফ মিস মালবিকা মুখার্জি ১৮২/২ নন্দন রোড,

কলিকাতা।"

এই 'কেয়ার অফ' শব্দ দুটো একটু লজ্জার কারণ হচ্ছিল। কিন্তু মনোময় তখন অভিভূত। ওইখানে বসেই মালবিকার কলমটা চেয়ে নিয়ে আধঘণ্টা ধরে আবেদনপত্রটা সে পূরণ করেছিল।

আর একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। ডাকঘরে গিয়ে একখানা খামের মধ্যে দু'খানা আবেদনপত্র পাঠিয়ে, রেজিস্ট্রি খরচের সাশ্রয় করা হয়েছিল। বুদ্ধিটা মালবিকার। তখন মনোময় ছিল অনেক অসহায়, এই পৃথিবীর বাস্তব অভিজ্ঞতা তার ছিল না বললেই হয়। মালবিকাই ঠিক করতো কখন কোনদিকে যেতে হবে।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে নতুন বিদ্যানগরীতে অপরিচিত পরিবেশে দু'জন বিদ্যার্থীর পরিচয় নিবিড় হতে লাগলো। মনোময় থাকতো এভারেস্ট ছাত্রাবাসে, আর মালবিকা অলকানন্দা ছাত্রীনিবাসে।

ওখানে পড়াশোনার পরিবেশ অন্য রকম। বসবাসের মধ্যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধের দুর্ভিক্ষ নেই। ওখানে পুরুষদের হোস্টেলগুলো গিরিশৃঙ্গের নাম অনুযায়ী—এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ত্রিশূল ইত্যাদি, আর মেয়েদের আবাসগুলি নদীর নামে—ভাগীরথী, অলকানন্দা, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি।

পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নবীন জীবনধারা বিদ্যানগরীতে ছায়া বিস্তার করেছে। স্ত্রী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের মধ্যে হাঁপধরা বিধিনিষেধের দেওয়াল নেই, অথচ কুৎসিত বিশৃঙ্খলাও নজরে পড়ে না। দেশটা যে ভারতবর্ষ তা বিদ্যানগরীতে বসে থাকলে মনেই হয় না।

এই পরিবেশই পছন্দ হয়েছিল মালবিকার। মনোময়কে সে বলেছে, "বিদেশ না-গেলেও আর দুঃখ রইলো না আমার। বইতে যা পড়েছি, সিনেমায় যা দেখেছি, লোকমুখে পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যা শুনেছি তার কিছুটা আস্বাদ এদেশেই মিলে গেলো।"

মনোময় তখন বিশেষ কোনো মন্তব্য করতো না। মালবিকার পরামর্শ মতো এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে সে একটা স্কলারশিপ জুটিয়ে নিয়েছে।

মলবিকা বলেছিল, "দেখলে তো খোঁজখবর রাখলে এদেশে এখন

অনেক সুবিধে এবং সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। অথচ কলকাতায় আমরা অনেকে ধারণা করে বসে আছি যে পড়াশোনায় সি ভি রমন বা সত্যেন বোঁস না হলে স্কলারশিপ জুটতে পারে না।" স্কলারশিপ না পেলে মনোময়ের পক্ষে পড়াশোনা চালানো শক্ত হতো।

স্বাস্থ্যকর সুন্দর পরিবেশে দিবারাত্র জ্ঞানের সাধনায় ডুব দিয়েছে মনোময়। পরীক্ষায় ভাল ফল করার জেদ চেপেছে তার মধ্যে। আবার এই পরিবেশে মালবিকা এবং সে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে।

অবশেষে একদিন এলো ১৫ই ডিসেম্বর। বিদ্যানগরের সেই ঝলমলে ভোরবেলাটা মালবিকার এখনও মনে আছে। ক্লাশরুমের বাইরে ইউনিভার্সিটি টি-হাউসে এক কাপ চায়ের সামনে বসে একখানা চিঠির মধ্যে ডুবে ছিল মনোময়। এতোই একাগ্রতার সঙ্গে চিঠি পড়ছিল মনোময় যে কখন মালবিকা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করে নি।

মালবিকা দেখলো মেয়েলী হস্তলিপি। ভারি সুন্দর মুক্তোর মতো হাতের লেখা। টেবিলে রাখা চিনির বাটিটা আলতো ঠুকে দিলো মালবিকা। তখন যেন সংবিৎ ফিরে এলো মনোময়ের। "ভাবছিলাম পিছনে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা চুপিচুপি আমিও পড়ে নেবো" রসিকতা করতে চেয়েছিল মালবিকা।

কিন্তু মনোময় নিজেই চিঠিখানা এগিয়ে দিলো মালবিকার দিকে! চিঠিটা পড়তে চায় নি মালবিকা। পরের চিঠি পড়ার নোংরা স্বভাবটা ওর বাবা ঘৃণা করতেন। চিঠিখানা না-পড়ে ফেরত দিতে গিয়েই ভিতর থেকে একটা সিঁদুরমাখা ফুলের পাপড়ি টেবিলে পড়ে গেলো।

মালবিকা তখনও রসিকতা করতে যাচ্ছিল, "তুক না কি?"

কিন্তু মনোময় বললো, "মাসীমার চিঠি। বছরে এই একবার মস্ত চিঠি লেখেন মাসীমা—পুজোর ফুল পাঠান এবং সেই সঙ্গে জন্মদিনের আশীর্বাদ।" মালবিকা শুনেছে মাসীমার কাছেই মানুষ হয়েছে মনোময়।

সেই প্রথম ১৫ই ডিসেম্বর মাসীমার ভালবাসার বাক্স থেকে বেরিয়ে মালবিকার কাছে ধরা দিলো।

"আজই তো ১৫ই ডিসেম্বর, মনোময়।"

মনোময় তখন দূরের ফুলবাগান এবং পাতাবাহারী গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। আরও দূরের ছোট্ট সবুজ পাহাড়টা হঠাৎ আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মালবিকা বলেছিল, "বাবার কাছে শুনেছি, বিশ্বপ্রকৃতি গাছপালা অরণ্য পর্বত নদীর মাধ্যমে জন্মদিনে জাতককে নিঃশব্দ বাণী পাঠায়। তুমি কিছু বুঝতে পারছো আজ, মনোময়?"

"যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে, যারা আমার সম্বন্ধে অবহিত, জন্মদিনে তারা আমার অস্তিত্বকে অসম্মান করছে না ভাবতে মন্দ লাগে না মালবিকা।"

এই প্রথম জন্মদিনে মাসীমার কাছ থেকে দূরে রয়েছে মনোময়। তাই বোধহয় সে একটু কাব্যিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনোময়ের এই মানসিকতা মালবিকার মন্দ লাগে না। বছরে অন্তত একটা দিন নিজের ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা তো মানুষের পক্ষে খারাপ নয়।

মালবিকা চটপট বলেছিল, "তোমার শেষ ক্লাশ তো পাঁচটায়। তারপর দেখা হওয়া চাই।"

বিকেলের শেষ দুটো ক্লাশে কিন্তু মালবিকাকে দেখা যায় নি। কোথায় গেলো মেয়েটা? মনোময়ের একটু চিন্তা হয় নি এমন নয়। ক্লাশ কামাইয়ে বাধা নেই—এখানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে জেলখানার কয়েদীদের মতো ব্যবহার করা হয় না। যথাবিহিত দায়িত্ববোধ উদয়ের পরেই মানুষেরা উচ্চতম শিক্ষার সন্ধানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করে—সহজ এই বিশ্বাসটুকু বিদ্যানগরী থেকে বিলুপ্ত নয়।

ক্লাশ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মনোময় সোজা অলকানন্দা হোস্টেলে হাজির হয়েছিল। মালবিকা ওইখানেই ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ক্লাশ কামাই করে সে অনেক কাজ সেরে ফেলেছে। মিল্কবার থেকে দুধ কিনে এনেছে, তারপর ঘরের বৈদ্যুতিক হিটার জ্বালিয়ে চটপট স্পেশাল চিঁড়ের পায়েস তৈরি করেছে। চিঁড়েটা কলকাতা থেকে অনেক আগেই এসেছিল। মালবিকার বাবার বদ্ধমূল ধারণা চিঁড়ে খেলে শরীর

ভাল থাকে।

ইউনিভার্সিটি টি-সেণ্টারের চেয়ারে মনোময়কে বসিয়ে অন্য খাবারের সঙ্গে পুরো পায়েসটা খেতে বাধ্য করেছিল মালবিকা।

"কোনোরকম আপত্তি চলবে না—খুব খারাপ হলেও খেতে হবে" জোর করেছিল মালবিকা। "এবং এই সঙ্গে মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। সো দ্যাট..."

"তাহলে কী? পিছনে একটা কণ্ডিশন জুড়ে দিচ্ছো কেন, মালবিকা!"

"সো দ্যাট আমার বার্থডে মিল্ক পুডিং ক্রমশ ভাল হতে হতে সুপার্ব হয়ে যাবে।" ইস্কুলের ছাত্রীর মতো নিষ্পাপ স্নিগ্ধ হাসির ফুল ফুটে উঠেছিল ওর মুখে।

"১৫ই ডিসেম্বর একদিন স্মরণীয় দিন হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা—যেমন ২৫শে বৈশাখ, যেমন ২৩শে জানুয়ারী, যেমন ২রা অক্টোবর, যেমন ৭ই জুন।" মালবিকা কথা বলেই চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র এবং গান্ধীজী তো বোঝা গেলো, কিন্তু ওই ৭ই জুন নিয়ে একটু বিপদে পড়ে গেলো মনোময়।

"ওই দিনটা আমার বাবার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ—ওই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম!" আবার হেসে উঠেছিল মালবিকা।

মনোময় তখনও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে নি। কীসব ভাবতে ভাবতে সে বলেছিল, "ভাগ্যবান আমি। নইলে প্রবাসের নির্বাসনে কেন এইভাবে কেউ আমার জন্যে জন্মদিনের পায়েস রাঁধবে? কিন্তু..."

"কিন্তু, কী হলো?" মালবিকা আশা করেছিল মনোময় কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত খুশিতে ভরপুর হয়ে থাকবে।

মনোময় যেন ওর দেহটাকে ইউনিভার্সিটি টি-সেণ্টারের চেয়ারে ফেলে রেখে অন্য কোথাও সরে যাচ্ছে। আপন মনে সে বলছে, "১৫ই ডিসেম্বরকে ভালবেসো না মালবিকা। তারিখটা মোটেই ভাল নয়।"

"কী সব আবোল-তাবোল বকছো জন্মদিনে?" স্নেহের ভর্ৎসনা ছুঁড়ে দিয়েছিল মালবিকা মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু মনোময়কে থামানো যায় নি। সে তখন বলছে, "আমি অনেক খোঁজ-খবর করে দেখেছি।"

জন্মদিন সম্বন্ধে কী খোঁজ-খবর করা যায়? মাথায় আসছে না মালবিকার।

মনোময় মৃদু হেসে বলেছে, "মাসীমাকে তো লেখা যায় না, মালবিকা তুমিই শোনো ১৫ই ডিসেম্বরের কীর্তিকাহিনী।"

তখন কী ঝকঝকে বাকভঙ্গি ছিল মনোময়ের—আজও এই এগারোতলার ফ্ল্যাটে দক্ষিণের বারান্দায় বসে মালবিকা তা স্মরণ করতে পারছে।

মালবিকার হাতে তৈরি পরমান্নর পর তখন কফির অর্ডার গিয়েছিল। ব্ল্যাক বিটার কফি—সাদা সুমিষ্ট বরফ-ঠাণ্ডা পায়সান্নের বিপরীত বলা যায়।

চিবুকটাকে নিজের বাঁ হাতের স্তম্ভের ওপর ধারণ করে মনোময় বলেছিল, "১৫ই ডিসেম্বর যারা জন্মায় তারা বোধ হয় মায়ের প্রিয় হয়। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি বিধবা মায়ের নয়নের মণি ছিলেন। ছেলের কথা ভেবেই মা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন এক সম্রাটকে। রানী কৈকেয়ীর মতো সুযোগ বুঝে দশরথকে দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সতীনপুত্রের দাবি নস্যাৎ করিয়ে নিজের ছেলেকে ভবিষ্যৎ সম্রাট মনোনয়ন করালেন। তারপর অধৈর্য রানী একদিন স্বামীকেই বিষ খাইয়ে খুন করলেন, সতের বছর বয়সে ছেলে সিংহাসনে চড়লেন। নতুন সম্রাট প্রথম সুযোগেই বৈমাত্রেয় দাদাকে হত্যা করালেন এবং ঠিক চার বছরের মাথায় মাকেও বাদ দিলেন না।"

"উঃ!" আর্তনাদ করে উঠেছিল মালবিকা। "জন্মদিনে এসব কী গল্প?"

"রাজা হবার নেশা তো!" মনোময় তখন বলে চলেছে। "প্রথমা স্ত্রীকেও সম্রাট একদিন তালাক দিলেন, তারপর সেই রমণীর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। এই রাজা হঠাৎ একদিন রাগের মাথায় দ্বিতীয়া স্ত্রীকেও খুন করেছিলেন। এবার যাঁকে তিনি বিয়ে করতে চাইলেন, সেই সুন্দরী মহিলা

সম্রাটের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখালেন না। সুতরাং তাঁকেও প্রাণ দিতে হলো। এরপর এক বিবাহিতা রমণীর দিকে নজর পড়লো সম্রাটের—স্বামীটিকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হলো যাতে সম্রাটের নতুন পত্নী নির্বাচনে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। নিজের মাস্টারমশায়, ছোটবেলায় যিনি হাতে ধরে শিক্ষা দিয়েছেন, সম্রাট তাঁকে একদিন বাধ্য করলেন আত্মহত্যা করতে।...কী অতো বড় বড় চোখ করছো কেন, মালবিকা ? এই নরপতি কিন্তু নিজেকে মস্ত বড় শিল্পী বলে মনে করতেন। তারপর অবশ্য নিজেও প্রাণ হারালেন বেঘোরে। শত্রুরা যখন তাঁকে ধরতে আসছে তখন দেহরক্ষীকে আদেশ দিলেন, ওরা আসছে, ওরা আসছে, আমাকে হত্যা করো।"

একটু থেমেছিল মনোময়। তারপর বলেছিল, "জানো মালবিকা, এই মহারাজাধিরাজ জন্মেছিলেন ১৫ই ডিসেম্বর।"

ইতিহাসের অত খোঁজ-খবর রাখতো না মালবিকা। কিন্তু মনোময়ের কৌতূহল নানা বিষয়ে। রাজার নামটা জানবার জন্যে ছটপট করছিল মালবিকা। মনোময়ের বলার ভঙ্গিটা এমন সুন্দর যেন পশুত্বের সঙ্গে ১৫ই ডিসেম্বরের সত্যিই কোনো অদৃশ্য সম্পর্ক রয়ে গিয়েছে।

মালবিকার কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে মনোময় বলেছিল, "ভাবছো এমন লোক পৃথিবীতে কোনোদিন জন্মায় নি—কিন্তু সত্যিই তিনি বেহালা বাজাতে বাজাতে মানুষের সর্বনাশ করতেন। রোমান সম্রাট নিরো। জন্ম ১৫ই ডিসেম্বর, খ্রীষ্টাব্দ '৩৭।"

আঁতকে উঠেছিল মালবিকা। "রাজা হবার ইচ্ছেটাই যত নষ্টের গোড়া, আমার মনে হয়। শেষ পর্যন্ত বেঘোরে প্রাণ হারাতে হলো" বললো মনোময়।

"উঃ! খুঁজে-খুঁজে বারও করেছো তো। ১৫ই ডিসেম্বর আমার মামাতো ভাই সুধাংশুর জন্মদিন, আমার মাসীমা রুচিরা চ্যাটার্জীর জন্ম ওই ১৫ই ডিসেম্বর। কই তাঁরা তো কোনোদিন এইসব আষাঢ়ে গল্প ফাঁদেন নি!"

"১৫ই ডিসেম্বর যাদের জন্ম—এক-একজন সম্রাট তাদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে, আমরা জানতে পারি না", কথাটা

রসিকতাচ্ছলে মনোময় কতদিন আগে সেই পড়ন্ত বেলায় সবুজ পাহাড়কে সাক্ষী রেখে বলেছিল। এখনও তা ভোলে নি মালবিকা।

তারও অনেকদিন পরে আর এক জন্মদিনে মনোময় নিজের কথা তুলেছিল। মালবিকাকে আদর করে সে বলেছিল, "জন্মদিনে শুধু সম্রাট নিরোর কথা ভেবে নিজের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করছিলাম, মালবিকা। এবার আর একজন শক্তিমানের সন্ধান পেয়েছি, তাঁরও জন্ম ওই ১৫ই ডিসেম্বর।"

মনোময়ের সঙ্গে ঘর-সংসার করতে-করতে মালবিকাও তখন সুরসিকা হয়ে উঠেছে। "এই সম্রাটও কি বেহালা বাজাতেন?"

মনোময় বলেছিল, "না ইনি সম্রাট নন। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মিনার তৈরি করেছিলেন অনায়াসে—প্যারিসের ইফেল টাওয়ার। মিশরের পিরামিডও যার কাছে শিশু—এক হাজার ন' ফুট উঁচু মিনারের স্থপতি ও স্রষ্টা আলেকজাণ্ডার ইফেল।"

তখন মালবিকা এর তাৎপর্য বোঝে নি। পরে মনোময় নিজেই একদিন বলেছিল, "এদের দু'জনের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই এমন নয়। একজন চেয়েছিলেন মহামান্য সম্রাট হতে, আর একজনের উচ্চাশা চেয়েছিল আকাশছোঁয়া সৌধের জন্ম দিতে—মহাশূন্যের আইনকানুন অমান্য করে এমন উপরে উঠতে যেখানে আগে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহসী হয় নি।"

দক্ষিণের বারান্দা বেয়ে একটা বেড়াল অন্য ফ্ল্যাট থেকে মালবিকার ফ্ল্যাটে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মনোময়ের টেলিফোন এতোক্ষণে বোধহয় শেষ হলো। "তা হলে যা কথা হলো তা যেন মনে থাকে," এই বলে প্রিয়দর্শিনীর ঊর্ধ্বাঙ্গকে স্বস্থানে বিশ্রামের সুযোগ দিলো মনোময়।

মালবিকার ইচ্ছে হলো একবার বলে, এতো দীর্ঘ সময় ধরে বলা এতো কথা কারও পক্ষে সমস্ত রাত ডিউটির শেষে মনে রাখা সম্ভব নয়।

সবাই এই পৃথিবীতে মনোময় মজুমদারের মতো মেধা নিয়ে জন্মায় নি। ওয়ার্কস ম্যানেজার মিস্টার প্রিয়ব্রত মল্লিকের বেচারা স্ত্রী নিশ্চয় ব্যাকুলভাবে স্বামীর বাড়ি ফিরবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু স্বামীকে কিছু বলবার সময়ই পেলো না মালবিকা। মনোময়ের আপিসের ডজনখানেক লোক যেন ওর সঙ্গে ফোনালাপের জন্য বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছে! আবার ফোন বাজছে।

"মজুমদার।" কী মিষ্টিভাবে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করলো মনোময়।

"আপনি অনেকদিন বাঁচবেন, মিস্টার বাসুদেবন। ফ্যাকটরির সঙ্গে কথা বলার পরেই ভাবছিলাম কয়েকটা পয়েন্ট আপনাকে জানিয়ে দিই—আপনি তো আজই ম্যাড্রাস যাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনুন মিস্টার বাসুদেবন, ওই স্পেশাল ভাল্‌ভটা যে করেই হোক ম্যাড্রাস থেকে জোগাড় করতে হবে আপনাকে। আপনি তো জানেন সেই বিখ্যাত ঘটনা—যেখানে সামান্য একটা আলপিনের জন্যে যুদ্ধেই হার হয়ে গেলো। একটা স্পেয়ার ভাল্‌ভের অভাবে কারখানার উৎপাদন তছনছ হয়ে যাবে, এ আমি সহ্য করবো না।"

"আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো আমার কথা?" মনোময় কেমন রাজকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছে। না শুনে কি বেচারা মিস্টার বাসুদেবনের কোনো উপায় আছে? মনে মনে মালবিকার দুঃখ হয় মিস্টার বাসুদেবনের ফ্যামিলির জন্যে।

মনোময়কে পর পর ক'দিন সংসারের একটা কাজ মনে করিয়ে দিয়েছে মালবিকা—কিন্তু প্রতিদিন ভুলে গিয়েছে সে। মনোময় বলেছে, "আজকাল ভীষণ ভুলো হয়ে যাচ্ছি মালবিকা—বয়স তো বাড়ছে।" অথচ সেই মনোময় অনায়াসে মিস্টার বাসুদেবনকে বলছে, "আমার হাতের গোড়ায় ফাইলটা নেই—কিন্তু আপনার পারচেজিং লিস্টের দ্বিতীয় অংশে আইটেম পঁয়ত্রিশ এবং পঞ্চান্ন দেখুন।"

"হ্যালো, হ্যালো, আমি লাইন ধরে থাকছি আপনি ভালভাবে লিস্ট দেখে যান।"

ব্যাতিব্যস্ত মিস্টার বাসুদেবন টেলিফোনের অপর প্রান্তে কীভাবে

কাগজের পাতা উল্টোচ্ছেন তা কল্পনা করতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না মালবিকার।

"হ্যালো, বাসুদেবন? পেয়েছেন তো? যা বললাম তার সঙ্গে ডেসক্রিপশন মিলছে তো?" কেমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছে মনোময়—কে বলবে, বাড়ির কোনো কাজের কথা এই লোকটার মনে থাকে না?

এই ব্যস্ততা আগামীকাল কিন্তু মালবিকা সহ্য করবে না। অন্তত একটা দিন তার ও মনোময়ের মধ্যে এই অফিস-টেলিফোনের দৌরাত্ম্য সহ্য করা হবে না।

"কী ভাবছো তুমি? ভাবতে ভাবতে হাসছো দেখছি।" মনোময়ের দৃষ্টি এবার তাহলে মালবিকার দিকেই পড়েছে। টেলিফোনটা সে এবার যথাস্থানে নামিয়ে রেখেছে।

"যা ভাবছি কালই বুঝতে পারবে তুমি। টেলিফোনের লাইনটা সকালে কেটে দেবো" মালবিকার উত্তরটার মধ্যে তেমন কোনো জ্বালা নেই।

"জন্মদিনেই তো বিশ্বের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, আবার ওইদিনেই যদি বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয় তা হলে মন্দ হয় না।" মনোময় এখন স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতার চেষ্টা করছে।

কালকের খাবারের মেনুটা স্বামীকে একটু শুনিয়ে রাখতে চায় মালবিকা। কিন্তু মনোময় ওকে ব্ল্যাংক চেক দিয়ে দিলো। "সুপ্রিম কোর্টের ডিসিশনের পর থার্ড ম্যাজিসট্রেটের কাছে কেউ যায়? তুমি তো সব ঠিক করে ফেলেছো।" মনোময়ের কথায় রসিকতা থাকলেও একটু ফাঁকি দেবার চেষ্টা রয়েছে।

একবার মালবিকার ইচ্ছে হলো মনোময়কে মনে করিয়ে দেয় আগামীকাল বিকেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু হঠাৎ অভিমান বাড়ছে—কিছু বলবে না মালবিকা, নিজে থেকে মনোময় স্বামীর দায়িত্ব পালন করে কিনা তা দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নিরিবিলিতে একটু যে ভাববে মালবিকা তার সুযোগ নেই। আবার

টেলিফোন বেজেছে এবং কথাবার্তা সেরে, টেলিফোনের সাজিটা হাতে নিয়ে মনোময় বাথরুমে প্রবেশ করেছে।

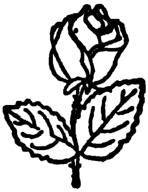
এই বাথরুমটাই মনোময়ের বিলাসিতা। তাই যথাসাধ্য সুন্দর করে স্নানাগার সাজিয়েছে মালবিকা। বাথরুমে বসে অফিসের কাজ করাটা নাকি এখন উঁচুমহলের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দু'একটা টেলিফোনের মধ্যে মনোময় টুক করে স্নান সেরে ফেলেছে। এসব ব্যাপারে ওর ক্ষিপ্রতা গিনেস বুক অফ রেকর্ডে স্থান পাবার যোগ্য।

টেলিফোনের লম্বা লাইন গুটোতে গুটোতে মনোময় আবার দক্ষিণের বারান্দায় ফিরে এসেছে। ওখানেই সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে নিলো মনোময়—সেই সঙ্গে লাল নীল সাদা কয়েকটা ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট গিলতে হলো। ঈশ্বরের দয়ায় মনোময়ের কোনো অসুখ নেই। ভাগ্যবানদের তেমন অসুখ হয় না বলেই আত্মরক্ষার জন্য ওষুধ কোম্পানিরা আজকাল রোগ নিরোধকের দিকে নজর দিয়েছেন। হেকিমী পদ্ধতিতে তৈরি রসুনের নির্যাস, আয়ুর্বেদীয় বনৌষধি যা লিভারকে সক্রিয় রাখে ও অ্যালোপ্যাথিক মালটিভিটামিনের রঙিন ক্যাপসুল যা নিঃশব্দে দুশ্চিন্তা রোধ করে—এমন অনেকগুলো শিশি এ-বাড়ির গৃহিণী ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাজিয়ে রেখেছে।

ব্রেকফাস্টের পর মনোময় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। ওই সময়েই সংসারের কাজের কথাগুলো সেরে নেওয়া যাবে।

"খাবার সময় কোনোরকম কাজের কথা তুলবি না," মালবিকার বাবা বলতেন। "কাজের কথা উঠলেই অজান্তে লালা ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়, তাতে হজম ভাল হয় না—লিভারের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে।" বাবা কোন কবিরাজী বই থেকে এ খবর সংগ্রহ করেছিলেন—মালবিকা এখনও তা মেনে চলে। বাবার মৃত্যুর পরে, তাঁর সমস্ত উপদেশ যথাসম্ভব মেনে চলবার চেষ্টা করে মালবিকা।



মনোময়কে আজ আটকানো যায় নি। ব্রেকফাস্টে বসেই মাঝে-মাঝে সে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। আচমকা একটা টেলিফোন আসতেই তিড়িং করে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে সে বললো, "আমি চললাম।"

অফিস শুরু হতে তো এখনও অনেক দেরি। কিন্তু মালবিকাকে মনোময় অনেকদিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, দশটা-পাঁচটা অথবা সাড়ে ন'টা সাড়ে-চারটে কাজ করে বিরাট এই দেশ চলছে না।

"আমার ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে বেরুবো ! তোমাকে অফিসে নামিয়ে গাড়িটা কিছুক্ষণ রাখবো।" মালবিকার এই ধরনের অনুরোধে কখনও না বলে না মনোময়।

"এখনই বেড়িয়ে পড়া যাক চলো।" বললো মনোময়। কিন্তু যেখানে যেতে চায় মালবিকা সেই ফিগার সেণ্টার এখনও খোলে নি।

"সকাল থেকে ওরা কাজ করে না কেন ?" জানতে চায় মনোময়।

মনোময়কে মালবিকার বলা উচিত, স্বামীরা অফিসে এবং ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে না-যাওয়া পর্যন্ত এই শহরের মহিলারা নিজেদের ফিগার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পায় না। ফিগার সেণ্টারের মিসেস শকুন্তলা চাওলা সেটা ভালভাবেই জানেন, তাই সাড়ে-দশটার আগে তিনি কাজ আরম্ভ করেন না।

মনোময় টুক করে অফিসে চলে গেলো, আর গাড়িটা ফিরে এলো চল্লিশ মিনিটের মধ্যে। ড্রাইভার জানিয়ে দিলো, আজ যতক্ষণ খুশি মেমসায়েব গাড়ি রাখতে পারেন।

অন্যদিন দুপুরে রান্নার হাঙ্গামা থাকে। মনোময়ের লাঞ্চটা বাড়ি থেকেই পাঠিয়ে দেয় মালবিকা—এমন রান্না যাতে তেল-ঘি বেশী নেই। ওর

কোলেস্টেরল সামান্য একটু উঁচু। মালবিকা তাই অফিসের লাঞ্চ বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু আজ মনোময়ের ওয়ার্কিং লাঞ্চ। এই ওয়ার্কিং লাঞ্চ বোম্বাইতে খুব চালু নয়। বোম্বাইয়ের ম্যানেজাররা এখানকার থেকে হাজার গুণ কাজের ; তবু তারা বিশ্রামের সময় কাজে বিশ্বাস করে না।

এই মনোময় এক সময় বোম্বাইতে বলতো, "আমাদের উদ্দেশ্যটা যেন গোলমাল না হয়ে যায়। আমরা কেন অফিসে এসেছি ?"

কালোয়া ক্যামিক্যালসের মিস্টার জুভেকার মাথা নিচু করে উত্তর দিয়েছিলেন, "কাজ করবার জন্যে।"

মনোময়ের সরস মন্তব্য, "এটা মনের কথা নয়! অপ্রিয় হলেও সত্যকে স্বীকার করা যাক—আমরা সবাই এখানে এসেছি পেটের জন্য। অতএব পেটই আমাদের হায়েস্ট প্রায়রিটি, মিস্টার জুভেকার। খাবার সময় কাজের কোনো প্রশ্নই ওঠে না!"

মিস্টার জুভেকার, মিস্টার নিগম, মিস্টার হাসান সবাই খুব আনন্দ পেতেন কোম্পানির এই তরুণ জেনারেল ম্যানেজারের কথায়। মনোময় বলতো, "আর একটা পয়েন্ট—প্রাচীন ভারতবর্ষে খাওয়াটা এতোই গুরুতর ব্যাপার বলে গণ্য হতো যে সে সময় কথা বলাও বারণ ছিল। সমস্ত সময় এবং মনঃসংযোগ প্রয়োজন এই খাওয়ার সাধনায়!"

অথচ কলকাতা আসার পর থেকে মনোময়ের মুখে ওয়ার্কিং লাঞ্চ কথাটা প্রায়ই শুনছে মালবিকা।

ফুড ফর ওয়ার্ক—খাদ্যের বদলে কাজ কথাটা প্রায়ই কাগজে বেরোয়—ফুড ফর থট কথাটাও কলেজে অনেকবার শুনেছে মালবিকা, কিন্তু ওয়ার্কিং লাঞ্চ ?

মনোময় বুঝিয়েছে, "কোনো উপায় থাকে না মালবিকা। ম্যানেজারদের সময় নিয়ে বড্ড টানাটানি। এতো বিভিন্ন জায়গায় আগে থেকে তাঁরা জড়িয়ে থাকেন যে ঠান্ডা মাথায় সকলে বসে কিছু আলোচনার একমাত্র সময় লাঞ্চের ওই এক ঘণ্টা। ওই সময় সবাই অফিসে ফিরে আসেন অথবা বাড়িতে চলে যান। চীফ এগজিকিউটিভ ওই সময়ের দশ মিনিট

নষ্ট করলে রাগ হয়, কারুর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশনও পাওয়া যায় না।"

তারই প্রতিষেধক হিসাবে কলকাতার টপ ম্যানেজমেণ্ট মহল বের করেছেন ওই ওষুধ! বড়কর্তার সেক্রেটারি সকালে টেলিফোনে ম্যানেজারকে জানিয়ে দেন ; আপনাকে ওয়ার্কিং লাঞ্চে নিমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যার অর্থ টিফিন টাইমে কর্তার ঘরে হাজিরা দিতে হবে—ওই সময়ের সব এনগেজমেণ্ট বাতিল।

মেজ, সেজ, ন', ফুল ও ছোটসাহেবরা এবং উঠতি ও পড়তি বিভাগীয় অধ্যক্ষরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে আর্জেণ্ট টেলিফোন কল বুক করে বসেন। "হ্যালো...হ্যালো...শোনো...দুপুরে দেখা হচ্ছে না...আজ ওয়ার্কিং লাঞ্চ।"

"এই ওয়ার্কিং লাঞ্চে কষ্ট আছে, ক্লান্তি আছে, খেয়েও তৃপ্তি নেই....। কিন্তু এতে মানসম্মান আছে—আপিসিক মর্যাদা বেশ বেড়ে যায়। তাই বাড়ির গিন্নি এবং অফিসের মানুষটি কেউ অসুখী হন না।"

যারা এতে যোগ দেবার সুযোগ পায় না তারা গোপনে বলে...ওটা আসলে লাঞ্চিং ওয়ার্ক...কাজের ছুতো করে কোম্পানির খরচে ভোজনবিলাস! কেউ বলে ওয়ার্কও নয় লাঞ্চও নয়—হাঁসজারু গোছের একটা জিনিস—কোনো কাজও হয় না, খাওয়াও হয় না।

মনোময় অবশ্য বলে, "ওয়ার্কিং লাঞ্চটা খুব কাজের মালবিকা। টেবিলের সামনে গোটাকয়েক স্যাণ্ডুউইচ এবং এক কাপ কফি এগিয়ে দিয়ে পুরো এক ঘণ্টার পরিপূর্ণ কাজ আদায় করা যায়। কেউ বেশী খায় না বলে, ম্যানেজারদের মস্তিষ্ক বেশ সজাগ থাকে।"

"আহা বেচারাদের খেতে দাও না কেন?" মালবিকা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

"আগে লম্বা মেনু রাখা হতো—শিক কাবাব, পরোটা, সন্দেশ সার্ভ করে ঠকেছি, মালবিকা। খাওয়াটাই বারো আনা সময় নিয়ে নেয়। হাতে তেল লাগে, রুমালে হাত মুছে স্বস্তি হয় না ইণ্ডিয়ানদের। এখন নো স্পেশাল সার্ভিং। টেবিলের দু'প্রান্তে দু'খানা প্লেটে স্যাণ্ডউইচগুলো সাজানো থাকে। খোদ কর্তার সামনে কেউ হুড়মুড় করে তুলতেও সাহস

পায় না। তাই কাজটা ভাল হয়।”

মালবিকার বলার কিছু নেই, অন্য গৃহিণীদের তুলনায় সে ভাগ্যবতী। সকালবেলায় অন্য গৃহিণীরা জানবার আগেই সে ওয়ার্কিং লাঞ্চের খবরটা পেয়ে যায়।

“মিটিং যখন করবেই তখন আগের দিন সবাইকে জানিয়ে দিলেই হয়, বাড়ির মেয়েদের দুশ্চিন্তা একটু কমে” মালবিকা পরামর্শ দিয়েছে।

“তুমি আসল ব্যাপারটাই বুঝতে পারো নি” মনোময়ের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে।

“আকস্মিকতা না থাকলে ওয়ার্কিং লাঞ্চের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। এক সপ্তাহ আগে ব্যাপারটা ঠিক করা থাকলেও শেষ দিনে দু-তিন ঘণ্টা আগে ওয়ার্কিং লাঞ্চের খবর ঘোষণা করতে হবে।”

মনোময়ের ড্রাইভার মালবিকার জন্যে এখন নিচে মেন গেটের কাছে অপেক্ষা করছে।

কলকাতার ড্রাইভারদের খুব পছন্দ মালবিকার। বম্বের অফিসড্রাইভারগুলো এক একটি নবাব। সায়েবের কাছে তারা খুব বিনয়ী এবং বিশ্বস্ত ; কিন্তু মেমসায়েবদের ডিউটি দিতে হলেই বেজায় মনোকষ্ট। ভাবে-ভঙ্গিতে তারা বুঝিয়ে দেয়—মেমসায়েবের ভুললে চলবে না যে গাড়ি এবং ড্রাইভার দুটোই অফিসের।

আরে বাবা, তোমাদের অফিস জেনেশুনেই গাড়িটা মেমসায়েবের কাছে পাঠিয়েছেন ; এর মধ্যে গর্হিত কিছু নেই। মেমসায়েবের মিষ্টি মুখ দেখে কোম্পানি এই সুবিধে দিচ্ছেন না। তাঁরা জানেন মেমসায়েবদের স্বেচ্ছাসেবা ছাড়া সায়েবদের কোম্পানিতে কাজ করতে হতো না। বিনা মাইনেতে মেমসায়েররা সারাক্ষণ বাড়িতে কোম্পানির হাজার হাঙ্গামা সামলাচ্ছেন।

কলকাতার অফিস ড্রাইভাররা অন্য রকম ! তন্ত্র সাধনার দেশ তো ! সায়েবদের কাছে যে যতোই খিটিমিটি করুক, মেমসায়েবদের কাছে প্রত্যেকটি ড্রাইভার ভয়ে জড়সড়। দুশো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে, মেমসায়েব অসন্তুষ্ট হলে কোনো সায়েবই ড্রাইভারকে রক্ষা করতে

পারবে না!

কলকাতায় ফিরে আসতে মনোময়কে উৎসাহ দেবার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এই একটা। না-হলে তো মনোময় ভাবছিল, বেশ তো জমিয়ে বসেছে বোম্বাইতে। মনোময় তখন বলতো, "যারা কাজ করতে চায় বোম্বাই তাদের কাছে মক্কার মতো। দক্ষ ম্যানেজারদের শহর ভারতবর্ষে একটাই আছে তার নাম বোম্বাই। ব্যবসা-বাণিজ্যে হোয়াট বোম্বাই ডাজ টু'ডে অবশিষ্ট ভারতবর্ষ আগামীকাল তা করে। তাই সমস্ত দেশকে বহু পিছনে ফেলে রেখে বোম্বাই এগিয়ে চলেছে। সেই বোম্বাইয়ে যে লোক কাজে নাম করেছে সে কোন দুঃখে অন্যত্র যাবে?"

কিন্তু তখন মালবিকার নিঃসঙ্গবোধ বাড়তে শুরু করেছে। ভোরবেলায় কালোয়ায় চলে যেতো মনোময়, আর মালবিকার কিছুই করার থাকতো না। দুপুরের দিকে অস্বস্তি বাড়তো, নিরুপায় হয়ে মালবিকা মাঝে-মাঝে মনোময়কে ফোন করে বসতো। টেলিফোন অপারেটর এবং সেক্রেটারির সতর্ক পাহারা পেরিয়ে টেলিফোনে মনোময়ের কাছে পৌঁছানো বেশ শক্ত কাজ। যদি বা পৌঁছানো গেলো, তখন হয়তো মনোময়ের সময় নেই। বাড়ির ফোন মানেই নাকি এমার্জেন্সি—"কী হলো? কিছু আর্জেণ্ট দরকার?"

বেশ অস্বস্তির মধ্যে ভয়ে-ভয়ে মালবিকাকে বলতে হতো, "কোনো দরকার নেই। এই এমনি তোমাকে ফোন করছি।"

মনোময় কথা শুনছে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছে না। অফিসের এই লোকটা যেন মালবিকার স্বামী নয়। কালোয়াতে সবাই যেন মেনে নিয়েছে এমার্জেন্সি ছাড়া স্বামীর অফিসে কোনো স্ত্রীর ফোন করা ঠিক নয়।

মালবিকা তখন হাঁপিয়ে উঠেছে। মনোময়কে সে বলতো, "বোম্বাই, দিল্লী, বাঙ্গালোরের যতো খুশি প্রশংসা করো তোমরা! কিন্তু জেনে রেখো, এদেশের প্রত্যেক বাঙালীর একটাই ঠিকানা আছে—তার নাম কলকতা। ইণ্ডিয়ার যে-বাঙালী কলকাতা দেখে নি, তারও শেষ পর্যন্ত একটাই আশ্রয়—কলকাতা।"

মনোময় চুপ করে শুনতো। কেউ কেউ মালবিকার সমালোচনা করতো ; "এসব ওয়ান্স-আপন-এ-টাইমের কথা, মিসেস মজুমদার। ভারতীয় সংবিধান পাশ হবার আগেকার মানসিকতা। শক হূণ পাঠান মোগলের মতো এখন বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবীর ধারা ভারতবর্ষের মানবসাগরে মিশে গিয়েছে। এখন আমাদের একটাই পরিচয়—উই দি পিপ্‌ল অফ ইন্ডিয়া।—এই সভারেন ডেমক্রেটিক ইন্ডিয়ান রিপাবলিক, দ্যাট ইজ ভারতের যে-কোনো অংশে সসম্মানে বসবাসের সংবিধান স্বীকৃত পবিত্র অধিকার আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে।"

মালবিকা বলেছিল, 'ওসব তো মিটিংকা-বাত, খবরের কাগজের কথা ! তোমরা কলকাতাকে ছোট কোরো না। কলকাতাই আমাদের নন্দন কানন, আমাদের বার্ধক্যের বারাণসী।"

মনোময় মৃদু হেসে মনে করিয়ে দিয়েছে, "একদিন তুমিই আমাকে কলকাতা থেকে বাইরে বিদ্যানগরে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিলে, কলকাতা পিছিয়ে যাচ্ছে—ওটা পড়াশোনার জায়গা নয়।"

মালবিকা হেসে উত্তর দিয়েছে,"বাবা বলেন, বিদ্যার্থী, চিকিৎসার্থী এবং তীর্থযাত্রীর কাছে স্বদেশ-বিদেশ নেই—যেখানে প্রয়োজন সেখানেই যাবে তারা নির্দ্বিধায়।"

তারপর বাবার অসুখ বাড়লো। বাবাকে বোম্বাইতে চলে আসতে বলেছিল মালবিকা। বাবা কিন্তু রাজী হলেন না। বাবা তখন একলা ঘরে বসে আপন মনে আবৃত্তি করতেন মাইকেল মধুসূদনের সেই বিখ্যাত লাইন—"প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এ দেহ আকাশ হতে।"

"না মাইয়া, আমি কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না," বাবা আদর করে লিখতেন মেয়েকে।

বাবার জন্যে ভীষণ মন কেমন করতো মালবিকার। কলকাতায় বাবাকে দেখবার কেউ নেই।

সেই সময়েই সুযোগটা এসে গেলো—মনোময়ের কলকাতায় চাকরির সম্ভাবনা।

মালবিকা বললে, "প্লিজ, তুমি সুযোগটা নাও, মনোময়। আমি বলছি, আমাদের ভাল হবে।"

কিন্তু সেসব তো অনেক কথা। কেমন করে এই কলকাতায় আসা হলো। কিন্তু যে জন্য এখানে আসা, যাঁর জন্যে মালবিকার এতো ব্যাকুলতা তিনি তো রইলেন না। কলকাতায় আসবার কয়েক সপ্তাহ পরেই মালবিকাকে কোনো কষ্ট না-দিয়ে হঠাৎ তিনি ভোরবেলায় চলে গেলেন।

বাবা যা চেয়েছিলেন তাই পেলেন। বিকল শরীর নিয়ে কারও গলগ্রহ না হবার প্রার্থনা জানাতেন তিনি। মালবিকা সারাজীবন বাবাকে কাছে পেয়েছে—মেয়ের প্রতি মায়ের কাজগুলোও মধ্যবয়সে নিঃশব্দে পালন করেছেন বিপত্নীক নরনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। মালবিকা ঠিক করেছিল, বার্ধক্যে বাবার সেবা করে নিজের দায়িত্ব কিছুটা পালন করবে। কিন্তু বাবা নিজের বোঝা কারও ওপরে চাপালেন না।

এই তো ক'মাস আগেও বাবা ছিলেন। এখন তিনি নেই। মনটা হু হু করে ওঠে। বাবা বলতেন, "আমার কোনো দুঃখ নেই। তোমার মা যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমার মেয়ে কারও থেকে কম নয়। স্বাধীন অথচ স্নেহময়ী মেয়ে চেয়েছিলাম আমি। বিয়ে সম্বন্ধে একটু দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু মেয়ে নিজেই তার চমৎকার সমাধান করেছে।"

মালবিকার মনে আছে, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বাবার খুব দুশ্চিন্তা ছিল। এই যে মনোময়ের সঙ্গে মেলামেশা—বাবা ভয় পেতেন, কিন্তু কখনও বারণ করতেন না। বাবা বলতেন, "নিজের বিবেক ছাড়া তোমার কোনো গার্জেন নেই, মালবিকা। অন্য অভিভাবকের দায়িত্ব তো আঠারো বছর হলেই আইনত শেষ হয়ে যায়। একমাত্র বিবেকই আমৃত্যু মানুষের জীবনে ধ্রুবতারার কাজ করে।"

মালবিকার মনে পড়ছে, মনোময়ের পরিচয় দেবার মতো তখন কিছুই ছিল না। বাগবাজারের সেই পুরানো বাড়িটায় বারো ঘর ভাড়াটের জন্যে একটা উঠোন। মায়ের মৃত্যুর পরে মনোময়ের পোস্টমাস্টার বাবা আবার

বিয়ে করেছিলেন। মাসীমার স্নেহে কোনোরকমে প্রতিপালিত হয়েছে সে। মনোময়ের কাছে নগদ পাবার মতো তখন কিছুই ছিল না।

টুং টাং—ফ্ল্যাটের বেলটা বাজছে। ড্রাইভার মধুসূদন মণ্ডল তো একটু আগেই রিপোর্ট করে গিয়েছে। এখন আবার কে এলো ? বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল মালবিকা, এই সময়ে কেউ বার বার বেল বাজালে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মেক-আপটা দ্রুত সেরে নিচ্ছে মালবিকা। কিন্তু বেলটা আবার অভদ্রভাবে বেজে উঠলো।

বেয়ারা বাজারে গিয়েছে। সুতরাং মালবিকাকেই দরজা খুলতে হলো। তার আগে কাঁচের ফুটো দিয়ে মালবিকা দেখে নিয়েছে দরজার সামনে একটি যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতার এখন যা অবস্থা ! কোনো ফ্ল্যাটেই গৃহ-বধূ আজ নিরাপদ নয়—কয়েকটা টাকা অথবা একগোছা চুড়ির জন্যে একটা মেয়েকে খুন করতে কলকাতার অপরাধীদের একটুও দ্বিধা নেই।

ঘন ঘন বেল টেপায় মালবিকার মেজাজ খারাপ হয়েই ছিল। দরজা খুলে সে দেখলো একটা পুরানো সিল্কের শাড়ি পরা সাতাশ-আঠাশ বছরের মেয়ে ডাঁসা শরীর নিয়ে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির চোখেমুখে বিরক্তির ছায়া।

"মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে দরকার আমার" নিজের কোনোরকম পরিচয় না-দিয়েই মেয়েটি মজুমদারের খবর করছে।

"মিস্টার মজুমদার অনেকক্ষণ বেরিয়ে গিয়েছেন" বেশ শান্তভাবে অথচ অনেকখানি দূরত্ব রেখে উত্তর দেয় মালবিকা।

"এতো সকালে বেরিয়ে যান উনি ?" সাতাশ বছরের অচেনা মেয়েটা যেন মিসেস মজুমদারকে বিশ্বাসই করছে না। মেয়েটি আবার মালবিকার দেহের দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। এই অসভ্যতা ভাল লাগছে না মালবিকার।

"আপনার কি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ?" মালবিকার নরম

কণ্ঠস্বর এবার বেশ কর্কশ হয়ে উঠলো।

মেয়েটা একেবারেই অপদার্থ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট কথার অর্থই জানে না। কী সব বাজে বকছে? বলছে, "অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারেই তো আলোচনা করতে চাই।"

"আপনি কি ওঁকে জানিয়েছিলেন যে আপনি আজ এখানে আসছেন?" ব্যাখ্যা করে মালবিকা। কেন এই মেয়েটার ওপর অকারণ বিরক্তি ধরছে ,মালবিকা নিজেই তা বুঝতে পারছে না।

"আমরা খুব গরীব।" কী অদ্ভুত কথাবার্তা মেয়েটার। আলোচনার কোনো ধারাবাহিকতা নেই। একজনের বাড়িতে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসেছো, আগে ক্ষমা চাও, বলো বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয়েছে। তা নয়—কেন মিস্টার মজুমদার এতো সকালেও বাড়ি নেই?

গরীব তো বলছো, কিন্তু পরেছো সিল্কের শাড়ি। গ্রাম, মফস্বল, শহরতলির মধ্যবিত্ত গর্ব এবং বস্তি কালচার মিশে অদ্ভুত এক ভাব সৃষ্টি হয়েছে মেয়েটার মুখে। বলছো গরীব, কিন্তু অপুষ্টির লক্ষণ নেই তো দেহের কোথাও।

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?" এবার একটু ভারী গলাতেই প্রশ্ন করে মালবিকা।

"অফিস থেকে।" মনোময়ের আফিসেই তাহলে কাজ করে মেয়েটা।

"অফিসের ব্যাপারেই ওঁর সঙ্গে আমার খুব দরকার, বুঝলেন।" মেয়েটা এবার ন্যাকা-ন্যাকা গলায় মালবিকার মন গলাতে চেষ্টা করে ব্যাপারটা আরও খারাপ করে দিলো।

"অফিসের কাজের জন্য বাড়িতে উনি দেখাশোনা পছন্দ করেন না।" মালবিকা আর বিরক্তি চাপতে পারছে না।

"কে পছন্দ করেন না!" বোকার মতো প্রশ্ন করছে সিল্কের শাড়ীপরা মেয়েটা।

"কে আবার? মিস্টার মজুমদার। ওঁর কড়া নির্দেশ আছে অফিসের লোকদের অফিসেই পাঠাতে।" মালবিকার বিরক্তি বেশ বেড়ে উঠেছে।

মেয়েটির কানে কি কিছুই ঢুকছে না? না হলে এই কথার পরে কেউ

বলে, "আমার ভীষণ দরকার, আমি আরেকদিন এসেছিলাম। সেদিন আপনি এবং মিস্টার মজুমদার কেউই বাড়িতে ছিলেন না।"

"হতে পারে। আপনাকে তো বললাম—আগে থেকে ঠিক করা না থাকলে ওঁর সঙ্গে দেখা হয় না।"

এবার দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলো মালবিকা। মেয়েটার মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দু-তিন মিনিট ড্রইংরুমের সোফায় বসে রইলো মালবিকা। মনোময়ের অফিসের মেয়েগুলোর কোনো মানসম্মান বোধ নেই—বম্বে অফিসের মেয়েগুলো সে-তুলনায় হাজার গুণ এগিয়ে।

ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে এলো মালবিকা। অটোমেটিক এক্সপ্রেস লিফ্‌টের বোতাম টিপে এগারো তলা থেকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে আসতে মাত্র কয়েক মুর্হূত সময় লাগলো।

ড্রাইভার মধুসূদন মণ্ডল মেমসায়েবকে সেলাম করে অফিসের গাড়ির দরজা খুলে দিলো। মালবিকা দেখলো গাওয়া-ঘি রঙের সিল্কের শাড়ি পরা মেয়েটা তখনও কী ভাবতে-ভাবতে মন্থর গতিতে এ-বাড়ির গেট পেরোচ্ছে।

মধুসূদন মণ্ডলও ঘাড় বেঁকিয়ে সিল্কের শাড়ি পরা মেয়েটাকে দেখে নিলো।

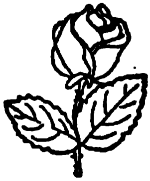
"চেনেন নাকি ?" পিছনের সীটে হেলান দিয়ে মালবিকা এবার প্রশ্ন করলো মধুসূদনকে।

সামনে দুটো কুকুর, একটা ছাগল এবং তিনটে উলঙ্গ শিশুকে পাশ কাটিয়ে গাড়ির গতি যথাসম্ভব বাড়াতে-বাড়াতে নিপুণ ড্রাইভার মধুসূদন বললো, "মনে হচ্ছে আমাদের অফিসেই কাজ করেন। মিসেস বিশাখা বিশ্বাস। কেউ বলে ডাইভোর্স করেছেন, কেউ বলে বিধবা। জামাকাপড় দেখে আজকাল তো কিছুই বোঝা যায় না। যেভাবে দিনকাল খারাপ হচ্ছে তাতে কিছুদিনের মধ্যেই বিধবারা লাল শাড়ি পরে সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে।"

মধুসূদন মনে মনে ভাবলো, এখন আর নামের কোনো নিয়মকানুন

নেই। আগে বড়লোক ছাড়া কেউ মেয়ের নাম বিশাখা রাখতে সাহস পেতো না। এখন নামের ব্যাপারে, গায়ের জোরে যার যা খুশি করছে। না হলে অতো নীচু পোস্টে যে মেয়ে টেম্পোরারি কাজ করে, তার নাম কী করে বিশাখা বিশ্বাস হয়?

মেয়েটা আবার আড়চোখে তাকালো মালবিকার দিকে। বোধ হয় আরও কিছু বলবার ইচ্ছে রয়েছে। কিন্তু মধুসূদন মণ্ডল গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মালবিকাকে বাঁচিয়ে দিলো।



মুডটাই খারাপ হয়ে গেলো মালবিকার। এই মেজাজ নিয়ে হ্যারিংটন স্ট্রীটের ফিগার সেণ্টারে যেতে হচ্ছে। অথচ ওখানকার মিসেস চাওলা প্রায়ই সাবধান করে দেন, "খারাপ মুড নিয়ে কখনও শরীরচর্চা করবেন না।" মুডের সঙ্গে সৌন্দর্যের নাকি গভীর অথচ গোপন যোগাযোগ আছে, যা মিসেস চাওলা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার করেছেন।

সৌন্দর্যের রহস্য নিয়ে কলকাতার মহিলারা তো বেশ কিছুদিন ধরেই দেহ এবং মাথা ঘামাচ্ছেন। এ সব নিয়ে মালবিকা কোনোদিন তেমন চিন্তা করে নি।

কিন্তু সেদিন নিউমার্কেটে শ্রাবন্তীর সঙ্গে দেখা হতেই সে বলে উঠলো, "কী হয়েছিস, তুই, মালবিকা! আগে যখন কলকাতার কলেজে পড়তিস তখন ছিলি বেতগাছের মতো ধারালো তন্বী। আমরা ভেবেছিলাম, তোর গায়ে কোনোদিন মাংস লাগবে না। বেতস বৃক্ষের মতোই চিরকাল ছিপছিপে থাকবি তুই।"

"ফর ইওর ইনফরমেশন বেতস বৃক্ষ নয়—তৃণ। যেমন বাঁশ।" সরস উত্তর দিয়েছিল মালবিকা বেশ জোরের সঙ্গে।

শ্রাবন্তী সিন্‌হা সে-কথা কানে না-তুলেই বললো, "তারপর সেবার যখন বোম্বেতে তোকে দেখলাম তখন চোখ জুড়িয়ে গেলো। দেখলাম, মনোময়কে নিজের মনের মতো তৈরি করে নিয়ে, নিজের জমিদারীটি গুছিয়ে, নিজের দেহে একটু পলিমাটি পড়তে দিয়েছিস তুই। এবং সেই সঙ্গে তোর দেহের ঔদ্ধত্যও ফুটে বেরুচ্ছিল। যে-বয়েসের যা, যে-সময়ের যা! বুঝলি তো? মডার্ন শিক্ষিতা জীবনসঙ্গিনীদের চেহারায় ষাট পার্সেন্ট নরম ভাবের সঙ্গে তিরিশ ভাগ অ্যারোগেন্স অর্থাৎ "ফোঁস" না মেশালে পুরুষরা সন্তুষ্ট হয় না।"

"বাকি দশ পার্সেন্ট তাহলে কী?" চোখ দুটো বড় বড় করে বান্ধবীকে মালবিকা প্রশ্ন করেছিল।

"কলাবতী মহিলাদের দেহে বাকি দশ ভাগ হলো স্যাটিশফ্যাকশন —বাংলায় যাকে বলে প্রশান্তি" শ্রাবন্তী উত্তর দিয়েছিল। "এক একটা চেহারা দেখবি, একেবারে যেন মরুভূমিতে তৈরি--এক ফোঁটা প্রশান্তি নেই!"

"শ্রাবন্তী, আমি ভেবেছিলাম তুই শুধু মনোবিজ্ঞান নিয়েই পড়াশোনা করেছিস। দেহবিজ্ঞানে এতো জ্ঞান কবে থেকে হলো তোর?" একটু ব্যঙ্গ করার সুযোগ নিয়েছিল মালবিকা।

"সাইকোলজি আমার পেশা, আর দেহবিজ্ঞান আমার নেশা, বুঝলি মালবিকা। শোন, কলকাতার এই স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় তোর দেহের ফোঁসটা কমে যাচ্ছে। এখন শতকরা পঁচিশ ভাগ ফোঁস আর পঁয়ষট্টি ভাগ স্নেহ!"

মনে মনে একটু দুশ্চিন্তা হয়েছিল মালবিকার। তবু পাল্‌টা আক্রমণ করে মালবিকা বলেছিল, "তুই ফোঁস রাখছিস কী করে? না খেয়ে?"

"নিষ্ঠুর কর্তা বিলেতে কনফারেন্সে নিয়ে গিয়ে নির্দয়ভাবে দু'সপ্তাহের জন্যে ওঁর জানাশোনা হেলথ্‌ ফার্মে পাঠিয়ে দিলেন।"

"সেটা আবার কী জিনিস?" মালবিকা হেল্‌থ ফার্মের নাম কখনও শোনে নি।

"আবাসিক সৌন্দর্য কেন্দ্র বলতে পারিস—স্বাস্থ্য-আশ্রম আর কি।

হোটেল বা হাসপাতালের মতো সারাক্ষণ ওইখানে থাকা, খাওয়া, শোওয়া এবং স্বাস্থ্যচর্চা করা!" বলেছিল শ্রাবন্তী।

বোম্বেতে নিশ্চয় স্বাস্থ্য-আশ্রম শুরু হয়েছে এতোদিনে। কলকাতা এসব ব্যাপারে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। গোটাকয়েক আধুনিকা পাঞ্জাবিনীর দয়ায় তবু এ-শহরে ফিগার সেলুন শুরু হয়েছে। শ্রাবন্তীর পাল্লায় পড়ে ওখানেই যাতায়াত আরম্ভ করেছে মালবিকা।

দেহ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবিনী ছাত্রী মালবিকার মনে প্রথম-প্রথম একটু দ্বিধা ছিল। এর পেছনে মেয়েদের হীনমন্যতার ছায়া রয়েছে কি?

কিন্তু মিসেস চাওলা এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন ওই সব সন্দেহ। "কাম অন, মিসেস মজুমদার! ঈশ্বর যাকে যা দিয়েছেন তা সযত্নে বিকশিত করার দায়িত্ব কি তার নয়? প্রাচীন ভারতবর্ষে সর্বত্যাগী সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের পত্নীরাও সৌন্দর্যচর্চা করতেন কেন? দেহ নিয়ে তাঁদের যথেষ্ট মাথাব্যথা ছিল।"

অতি বুদ্ধিমতী এই মিসেস চাওলা। গরম 'সান্' বাথ চালু করে দিয়ে মিসেস চাওলা তাঁর খরিদ্দারকে প্রশ্ন করেছেন, "আপনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়েছেন?"

"ও বই তো সন্ন্যাসী হবার আগে লোকে পড়ে!"

"হ্যাঁ। ও বইতেও লীলা সরস্বতীর গল্পটা পড়ে দেখবেন, মিসেস মজুমদার। অতবড় জ্ঞানী মহিলা, অমন রাজার মহিষী, অতোগুলি সুন্দর সন্তানের জননী। কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছাটি শেষ পর্যন্ত কী হলো?"

মালবিকার জন্যে টার্কিশ স্টিমের তাপ অল্প বাড়িয়ে মিসেস চাওলা বলেছিলেন, "সর্বগুণসম্পন্না এই রমণীর মনে একটি মাত্র কামনা, আমি কী উপায়ে চিরদিন যুবতী থেকে স্বামীর সঙ্গে চিরকাল সুখভোগ করতে পারবো?"

ট্রাফিকের অসংখ্য জট পেরিয়ে ড্রাইভার মধুসূদন মণ্ডল মেমসায়েবকে অবশেষে ফিগার সেন্টারে পৌঁছে দিলো। এখন গাড়ি নিয়ে একঘণ্টা সে মনের আনন্দে রাস্তায় পাক খাবে। ইচ্ছে করলে ধর্মতলা থেকে

যোধপুর পর্যন্ত প্রাইভেট ট্রিপ দিয়ে টু-পাইস কামাই করে নেবে সে।

আজ গাড়ি নিয়ে মধুসূদন শালীর বাড়িটা একটু ঘুরে আসবে। শ্যালিকা অনেকদিন যেতে অনুরোধ করেছে, কিন্তু বাস ট্রাম ঠেঙিয়ে সেই যাদবপুর নেতাজী কলোনিতে হাজির হতে ইচ্ছে করে না। আজ গাড়ি নিয়ে ধরা পড়লেও, কেউ কিছু করতে পারবে না মধুসূদনের। "একটু চা খেয়ে আসি", এই বলে মেমসায়েবের অনুমতি করিয়ে নিয়েছে সে। চা খেতে কতদূর যাওয়া যাবে তা তো মেমসায়েব বেঁধে দেন নি।

মিসেস চাওলা সুপ্রভাত জানালেন মালবিকাকে। বললেন, "হাফপ্যান্ট এবং গেঞ্জি পরে নিন—আজ এখানে বেশী ভিড় নেই।"

ইলেকট্রনিক ভাইব্রেটরে 'মাস্‌ল টোনিং' শুরু হলো মালবিকার। মিসেস চাওলা বললেন, "এই মেশিনটা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করেছি। এখানে এই যন্ত্র মেরামত করা খুব শক্ত তাই নিজেই চালাই, অন্য মেয়েদের হাতে দিই না।"

"শরীরে মাঝে মাঝে চিড়িক দেয়—দেহটা শিরশির করে ওঠে।" বডিটা সম্পূর্ণ মিসেস চাওলার হাতে ছেড়ে দিয়ে মালবিকা বলে ওঠে।

মিসেস চাওলা বললেন, "একটুও চিন্তা নেই—খুব লো ভোল্টেজ, কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।"

"কী জানি যন্ত্রপাতি দেখলেই আমার ভয় লাগে", বলে ওঠে মালবিকা।

সৌন্দর্যের সন্ধানে সমস্ত ওয়ার্লড ঘুরেছেন মিসেস চাওলা। তিনি বললেন, "মেয়েদের দেহ সম্বন্ধে আমেরিকান রেড-ইন্ডিয়ান পুরুষদের এই রকম প্রত্যাশা ছিল—দেহটা মাঝে মাঝে চিড়িক দেবে। এখন ঐ প্রত্যাশা বহু সুসভ্য পুরুষমানুষের মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। আপনি 'বুড়ি বিউটিফুল' বইটা পড়েছেন ?"

বইটা এখনও পড়া হয় নি। মনোময়ের সঙ্গে বইটা নিয়ে আলোচনা করেছে মালবিকা। মনোময় মুখে কিছু বলে নি, কিন্তু মালবিকার মনে হয়েছে বিজ্ঞান ও দর্শনের মোটা মোটা বই ছাড়া যে আগে কিছু চায় নি, হঠাৎ তাকে এই বইটায় আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখে সে একটু অবাক

হয়েছে।

মিসেস চাওলা জানালেন, "আজেবাজে দোকানে এ সব বই রাখে না। মিসেস কানোড়িয়া আমার কথায় সাত কপি আনিয়েছেন ওঁর প্রত্যেক বোন, ভাইঝি এবং জায়ের জন্যে। মেম্বারদের বারবার রিকোয়েস্টে আমিও স্টক করেছি খুব লিমিটেড নাম্বার অফ কপি—দরকার হলে আপনি একটা বই কিনতে পারেন, মিসেস মজুমদার।"

"দেখি। আমার হাজবেণ্ডকে আগেই বলেছি, যদি আবার ডুপ্লিকেট হয়ে যায়," মালবিকা এখনই বইটা নিতে চায় না। সে দেখতে চায় মনোময় খেয়াল করে বইটা আনে কিনা। বিশেষ করে প্রতি বছর নিজের জন্মদিনে মালবিকাকে একটা বই কিনে দেয় মনোময়।

মিসেস চাওলা ইলেকট্রনিক ভাইব্রেটরের কাজ সেরে, একটা স্থাবর সাইকেলে চড়িয়ে দিলেন মালবিকাকে। পায়ের পরিশ্রম হবে অথচ গাড়ি নড়বে না। "আমি খুব নরম করে দিচ্ছি—মনে হবে যেন এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সাইকেল চালাচ্ছেন আপনি। যেমনি এই লাল আলো জ্বলে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে পেডালিং বন্ধ করবেন। অনেক অঙ্ক কষে কারেক্ট ডোজ বের করতে হয়, মিসেস মজুমদার। মাত্রার অতিরিক্ত সাইকেল চালানো মানেই বুতে পারছেন?"

বুঝতে পারছে না মালবিকা। সে মিসেস চাওলার মুখের দিকে তাকালো।

"মেয়েদের দেহ দামী এবং ডেলিকেট গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর মতো, ছেলেখেলার জিনিস নয়, মিসেস মজুমদার। শক্ত পালোয়ানের চেহারা কোন মেয়ে চায়? সমস্ত সুখের আধার এই শরীর টেণ্ডার অথচ ধারালো রাখতে হবে।"

টেণ্ডার কথাটা শুনলেই চিকেনের কথা মনে পড়ে যায় মালবিকার। কিন্তু সে-কথা মিসেস চাওলাকে বললেই তিনি লাফিয়ে উঠবেন।

"দূর থেকে মনে হবে মোমের তৈরি—অথচ মোম নয়। নরম অথচ ফোম রবারের মতো রেজিলিয়েন্স," মিসেস চাওলা আদর্শ নারীদেহের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন আপন মনে।

মিসেস মজুমদারের শরীরের ওজন এবং বিভিন্ন অংশের মাপজোক নিতে- নিতে মিসেস চাওলা বললেন,"আপনি ঠিক সময়েই আমার কাছে এসেছেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছের মতো চারদিকে ঝুরি নামিয়ে বিউটি সেলুনে এলে তখন কিছু করার থাকে না।"

দু' একটা রহস্যময় শারীরিক কসরতের ফাঁকে-ফাঁকে মিসেস চাওলা ভরসা দিলেন, "আপনার কোনো চিন্তা নেই—দেখুন না ফিগারটা ক্রমশ কী রকম হয়ে যায়। তখন আপনিই হবেন আমার এই ফিগার সেন্টারের চলমান পাবলিসিটি।"

মালবিকা এবার শ্রান্ত শরীরের ঘাম আলতোভাবে নরম টার্কিশ টাওয়েলে মুছে নিলো।

মিসেস চাওলা মন্তব্য করলেন, "জার্মানিতে বলে, মেয়েদের শরীর হলো খুব দামী টাইমপিসের মতো। ফাস্ট হওয়াও চলবে না, স্লো থাকাও চলবে না—ঠিক থাকতে হবে সবসময়।"

এই সব কথাগুলোও বোধ হয় বিউটি চিকিৎসার অঙ্গ। নানা পরিশ্রমের মধ্যে মনটাকে অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা চলে এখানে।

"অন্যমনস্ক নয়—রি-ল্যা-ক্স-ড্ রাখা! মনে কোনো উত্তেজনা থাকবে না। মেয়েমানুষের দেহ হলো ফুলের মতো—ফুল যখন ফোটে তখন কোনো টেনশন থাকে?" জিজ্ঞেস করলেন মিসেস চাওলা।

এবার নিজের টেনশনের কথা শুরু করলেন মিসেস চাওলা। "ক্যালকাটা সিটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, মিসেস মজুমদার। কোনো মডার্ন বিষয়ে এখানে কারুর আগ্রহ নেই। আমার কাজিন ডেল্‌হিতে ফিগার ক্লিনিক খুলেছে—সারাক্ষণ খরিদ্দার বোঝাই। আর এখানে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিয়েও আমি বাড়িভাড়া এবং কর্মচারীদের মাইনে তুলতে পারছি না।"

"হবে, আস্তে আস্তে হবে," আশ্বাস দেয় মালবিকা।

মিসেস চাওলার দুঃখ "ক্যালকাটা বিউটিফুল হতে চায় না, মিসেস মজুমদার। প্যারিসে বলা হয়, যারা সুন্দর হতে চায় তারা বাঁচতেও চায় না।"

বেশ তেতে উঠেছেন মিসেস চাওলা। তিনি বলে চললেন, "কারুর কারুর ধারণা কলকাতার মেয়েরা স্বভাবসুন্দরী। একদম বাজে কথা—স্বভাবসুন্দরী বলে কোনো শব্দ এখানকার মেয়েদের অভিধানে নেই। কেউ-কেউ এখানে খোঁজখবর নিতে এসে বাজে কথা তোলে। সেক্সি সব প্রশ্ন করে।"

"কী রকম ?" জানতে চায় মালবিকা।

"মেয়েদের স্বাধীনতার সঙ্গে মেয়েদের সৌন্দর্যচর্চা নাকি অচল। একজন বললো, 'আমি হ্যাপিলি ম্যারেড। সুখে স্বামীর ঘর করছি, কার জন্যে আমি এই সব হাঙ্গামা পোয়াবো ?' বুঝুন, মিসেস মজুমদার। শিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলা, নিজের দেহ সম্বন্ধে এই রকম বিপজ্জনক কথা বলছে। আমি মুখের উপর বলে দিয়েছি, আপনি আমার সেন্টারের মেম্বার হন বা না হন, শুনে রাখুন, আপনি নিজের জন্যেই আপনার শরীরের সৌন্দর্যকে বিকশিত করবেন, এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির নাম টেনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই।"

মালবিকার ডান কাঁধে স্পেশাল হরমোন ক্রিম ঘষতে ঘষতে মিসেস চাওলা বললেন, "আপনি একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। আমি সিনিয়র কেমব্রিজ পেরোতে পারি নি। কিন্তু বলুন, আমি ঠিক বলছি কিনা ? সৌন্দর্য সাধনার পিছনে কোনো এমার্জেন্সি থাকে না। কোনো স্পেশাল পরিকল্পনারও প্রয়োজন নেই। আপনি কী বলেন ?"

"সুগঠিত সুন্দর শরীর মেয়েদের কিছুটা আত্মবিশ্বাস দেয় বোধ হয়," নিজের মনেই মালবিকা বলে উঠলো।

"স্যাটিসফ্যাকশন দেয়—ওইটাই বড় কথা। এই যে আপনি এসেছেন, আপনার কী আর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন ? আপনার কী কোনো স্পেশাল উদ্দেশ্য আছে ?" এই বলে একটা পোর্টেবল্ ইলেকট্রিক ড্রায়ারে মালবিকার চুলগুলো শুকনো করতে লাগলেন মিসেস শকুন্তলা চাওলা।

মিসেস চাওলার শেষ কথাগুলো ভাবিয়ে তুলেছে মালবিকাকে। হঠাৎ কেন এই ফিগার সেন্টারে আসা যাওয়া ? এমনি, নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এবং কিছুটা শ্রাবন্তী ও মণিদীপার কথাবার্তায় শরীরের সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব প্রস্ফুটিত করার আশায়।

কিন্তু যে-মালবিকা বি. এস-সি অনার্সের দরজা ফার্স্ট ক্লাশ সহ পেরিয়ে ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তে বিদ্যানগরী থেকে এম. এস-সি করেছে সে কি এখন হেরে যাচ্ছে ?

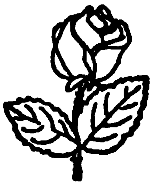
"না, হারবে কেন ?" আত্মপ্রত্যয়ের অভাব তো হচ্ছে না মালবিকার। কিন্তু মালবিকা শুনেছে, হেরে যাওয়ার পরেও অনেক সময় মানুষ বুঝতে চায় না যে সে হেরে গিয়েছে। ইতিহাসের এই নিয়ম।

শারীরিক কসরতের পর একটা অ্যালুমিনিয়াম গার্ডেন চেয়ারে কিছুক্ষণ নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার উপদেশ দেন ফিগার সেন্টারের বিদেশে ট্রেনিং পাওয়া কর্ত্রী। সেখানেই আধ শোয়া হয়ে রইলো মালবিকা।

"রি-ল্যা-ক-সে-শ-ন।" একটু টেনে টেনে বলেন মিসেস শকুন্তলা চাওলা।

"মনের মধ্যে ভারি কোনো ভাবনা রাখবেন না—দেহটা যেমন হাল্কা ফুরফুরে তেমনি ছোট ছোট ভাবনা হাল্কা মেঘের মতো মনের আকাশ দিয়ে ভেসে যাক। কিন্তু তার থেকে একটুও বেশী নয়। তবেই না ফুলের মতো ফুটে উঠবে শরীর। বড় বড় ডাক্তাররাও আজকাল দেহের ওপর মনের প্রভাব স্বীকার করছেন মিসেস মজুমদার।"

শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে মালবিকা মজুমদার এখন ফিগার সেন্টারে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকবেন। আমরা এই সুযোগে মনোময়ের খোঁজখবর করি।



এ বি সি ড্রাগসের সাঁইত্রিশ বছরের তরুণ চীফ এগজিকিউটিভ মনোময় মজুমদার এক মনে অফিস ঘরে বসে কাজ করে চলেছে।

জানালার বাইরে দিয়ে জরাজীর্ণ ভাগীরথীর শীর্ণ প্রবাহের দিকে একবার তাকিয়ে নিলো মনোময়। আপিস ঘরে বসে ইচ্ছেমতো নদী দেখবার সৌভাগ্য পৃথিবীতে ক'জনেরই বা হয়।

এ বি সি ড্রাগসের আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠাতারা অতদিন আগে নদীর ধারে অফিসবাড়ি তৈরি করে দূরদৃষ্টি ও সুরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন।

মনোময় সেই ছোটবেলা থেকেই আর্যভট্ট কেমিক্যালস্ অ্যান্ড ড্রাগসের নাম শুনে আসছে। মনোময়ের ছাত্রাবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি মধ্য গগনে—সমস্ত ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে তখন এ বি সি'র সাবান, টুথপেস্ট এবং ছোটখাট ওষুধপত্রের অভাবনীয় সমাদর।

এ বি সি ড্রাগসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক জগদীশ্বর আচার্যের সুবৃহৎ অথচ বিবর্ণ অয়েলপেন্টিং এখনও মনোময়ের ঘরে শোভা পাচ্ছে। ক্যানভাসের এক কোণে ছোট্ট স্বাক্ষরটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছে ছবিটা বিখ্যাত পোর্ট্রেট পেন্টার সুরেন দাসের অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তি। কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলায় এবং পরিচ্ছন্নতার অভাবে অধ্যাপক জগদীশ্বর আচার্য এখন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। বুকের কাছে ক্যানভাসটা একটু ছেঁড়া, কে যেন সর্বজনহিতৈষী অজাতশত্রু এই আবিষ্কারক অধ্যাপকের বুকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছে।

খোদ সেই ইংরেজ যুগে শাসককুলের বিন্দুমাত্র সাহায্য না-পেয়েও আর্যভট্ট কেমিক্যালস্ অ্যান্ড ড্রাগস্ দোর্দণ্ড কয়েকটি বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে বীরবিক্রমে লড়াই করে ব্যবসা-জগতে নিজের আসনটুকু প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। এ বি সি'র প্রথম যুগের কার্যকলাপ যেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আর একটি পরিচ্ছেদ। অবিশ্বাস্য কম দামে মাল ছেড়ে, স্বদেশী কোম্পানির ওষুধ সম্পর্কে সুপরিকল্পিতভাবে নানা মিথ্যা গুজব রটিয়ে বিদেশী কোম্পানিরা এ বি কেমিক্যালস্ অ্যান্ড ড্র্যাগসকে শৈশবেই শেষ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু অকৃতদার জগদীশ্বর আচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করবার পরেও গভীর রাত্রি পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে এমন সব উন্নতমানের জিনিস তৈরির পথ বের করলেন যা বিদেশী কোম্পানির

তন্দ্রাহরণের পক্ষে যথেষ্ট।

অধ্যাপক জগদীশ্বর আচার্য চেয়েছিলেন এ বি সি ড্রাগস্ এমনভাবে গড়ে উঠুক যাতে পরাধীন দরিদ্র জাতির স্বাজাত্য অভিমান তার ওপর প্রতিফলিত হয়।

মনোময় জানে, সেযুগে গুণে সেরা হলেও এ বি সি'র টয়লেট সোপ ছিল দামে কম। সেই কতদিন আগে অধ্যাপক আচার্য গায়েমাখা সাবানে মিষ্টি গন্ধ ছাড়াও ভারতীয় বনৌষধির নির্যাস মিশিয়েছিলেন। মনোময়ের মনে আছে, ছাত্র জীবনে বিলাতী কোম্পানির সৌন্দর্য সাবানের বদলে এই জিনিসই সে দিনের পর দিন ব্যবহার করেছে।

এ বি সি ড্রাগসের অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে মোহনবাগানের প্রথম আই এফ এ শিল্ড বিজয়ের তুলনা করা হতো এক সময়। রাজনীতির অঙ্গনে মহাত্মা গান্ধী যা করেছেন, খেলার মাঠে মোহনবাগান যা দিয়েছে, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, রাসায়নিক শিল্পে এ বি সি ড্রাগস তাই করেছে—উদ্ধত রাজশক্তির মাথা নত করিয়ে জনগণকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এসব তো অনেকদিন আগেকার কথা। এখন এ বি সি ড্রাগসের দুর্দিন। মনোময় কোথায় যেন পড়েছিল, বাঙালীরা ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বোঝে না। এ দেশের উর্বর পলিমাটিতে ব্যক্তি বিকশিত হয়; কিন্তু প্রতিষ্ঠান প্রাণবন্ত হয় না।

প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন এই জগদীশ্বর আচার্য—ব্যক্তিত্বে, আবিষ্কারে, ত্যাগে এবং ভালবাসায় অবশ্যই তাঁর কোনো তুলনা নেই; কিন্তু কী করে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হয় তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি।

এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে পদস্থ কর্মচারী এবং ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার প্রথম দিনেই মনোময় বলেছিল,"বোম্বাইয়ে নামকরা এক আমেরিকান ফার্মাসি কোম্পানিতে আমি ভাল চাকরিতেই ছিলাম।" দুবার আমাকে বিদেশে পোস্টিং দেবার কথাও উঠেছিল। সেই সময় আমার সঙ্গে বিখ্যাত শিল্পপতি মিস্টার অম্বালাল পারেখের পরিচয় হয়।

মিস্টার পারেখ আমাকে বললেন, মজুমদার, চালু গাড়িকে চলমান রাখার মধ্যে তেমন কোনো বাহাদুরী নেই। মানুষের প্রতিভার পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় না।

"তখন কালোয়া কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ফার্মাসিটিক্যালস্-এর দুর্দিন মিস্টার অম্বালাল পারেখ আমাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে বললেন। আমার ভাগ্য ভাল। আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, কালোয়া কেমিক্যালস্ কীভাবে কোনোরকম সরকারী সাহায্য না নিয়েই অতি অল্প সময়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কালোয়া কেমিক্যালস্ এখন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। গুজরাটে এবং হরিয়ানায় এঁদের নতুন ফ্যাকটরি তৈরি হয়েছে।"

"তারপর কোনো এক খেয়াল এবং কিছুটা জেদের বশে আমি বোম্বাই থেকে বেরিয়ে এই কলকাতায় ফিরে এসেছি। আমার চ্যালেঞ্জ এবারে অনেক কঠিন—আপনাদের অনেকে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজীবন জড়িত সেই এ বি কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ড্র্যাগস্‌কে রক্ষার চেষ্টা করা। আপনারা জানেন এর আগে যিনি এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি—প্রাণান্ত পরিশ্রম বলা চলে, কারণ এই ঘরেই তিন মাস আগে তিনি অকস্মাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং এখানে আর ফেরেন নি।"

"মিস্টার অনিলকুমার চট্টরাজ,আপনাদেরই পদস্থ সহকর্মী, ক'মাস প্রতিষ্ঠানের কাজ চালিয়েছেন। তারপর আমি এসেছি।"

"আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করি। বিচক্ষণ কর্মী হিসেবে আপনারা বলুন, ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের তফাত কী?"

সভায় তখন মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা চিরকাল কথা বলেই গিয়েছেন, কখনও অন্য পক্ষের উত্তর শুনতে চান নি। পুরানো অভ্যাসবশত কেউ তাই মুখ খুললেন না।

মনোময় বলেছিল,"আমি বিদেশী বহুজাতিক কর্পোরেশন থেকে শিখেছি—ব্যক্তির বার্ধক্য ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু প্রতিষ্ঠান জরা ও মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, অজয় অমর হবার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন।"

"চমৎকার বলেছেন, স্যর। কথাটা আমার মাথাতেই আসে নি। আমার ধারণা ছিল, ব্যক্তির স্বার্থ দেখার লোক আছে ; কিন্তু প্রতিষ্ঠান ইজ নো বডিজ বেবি। মা বাপ কেউ নেই এ বি কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ড্রাগসের।" কথাটা বলেছিল ইউনিয়নের তরুণ সেক্রেটারি ইন্দ্রনীল, তাকেও মিটিংয়ে নেমন্তন্ন করেছিল মনোময়।

মনোময় বলেছিল, "এই প্রতিষ্ঠানকে আমরা আবার প্রাণময় করে তুলবো। কলকাতার লোকেরা কোনো প্রতিষ্ঠানকে সসম্মানে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার কোনো প্রমাণ ভারতবর্ষকে এখনও পর্যন্ত দেওয়া যায় নি। এখানে কেবল তাই প্রয়াত মহাপুরুষদের স্মৃতি পুজা—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকী পালিত হয়, কিন্তু কোনো প্রাণময় বর্ধিষ্ণু স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের শততম জন্মতিথির খবর পাওয়া যায় না।"

"আপনারা যদি চান, তাহলে সকলে মিলে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়া যেতে পারে। আমি বোম্বাইয়ের বন্ধুদের সতর্ক করে দিয়েছি—আমাদের হেয় কোরো না। মনে রেখো আজ বাংলা যে প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয় আগামীকাল সমস্ত ভারতবর্ষও সে ব্যাপারে অসফল হতে পারে।"

সকাল থেকে মনোময় আজ অনেক কাজ করেছে। দু'একটা অপ্রিয় চিঠিও লিখে ফেলেছে। এ-কালের প্রতিষ্ঠানের লালন পালন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দায়িত্ব যাদের ওপর সেই প্রফেশনাল ম্যানেজারদের কর্মধারা বোধহয় সনাতন ভারতবর্ষের ভাবধারার বিপরীত। যে দুটি প্রধান উপদেশ স্থিতপ্রাজ্ঞরা দিয়েছেন তা হলো ; ন ব্রুয়াৎ সত্যাং অপ্রিয়ম্ এবং মা ফলেষু কদাচন।

আগামী সপ্তাহে ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনে আলোচনা সভায় মনোময় যে নিমন্ত্রণ পেয়েছে সেখানে এই বিষয়েই বলবে সে। তার প্রথম বক্তব্য ; কর্মে তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নয় মন্ত্রটি আধুনিক উৎপাদন আন্দোলনের মূলে কুঠারঘাত করেছে। ইনপুট আউটপুট রেসিও— কত কম দিয়ে কত বেশী উৎপাদন পাওয়া যায় ; এর নামই তো প্রোডাকটিভিটি।

যথাসময়ে অপ্রিয় ভাষণের দ্বিধা ও ব্যর্থতাই তো আজকের যুগের ম্যানেজারদের অধঃপতনের কারণ। আমরা ফলদায়ী ম্যানেজার চাই; প্রিয়ভাষী ম্যানেজার নয়। অপ্রিয় সত্যকথনের বিপদকে এড়ানো চলবে না—প্রফেশনাল হ্যাজার্ড বলে ধরে নিতে হবে। 'তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার। হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার'—পরনির্ভর এই মানসিকতাই পূর্বাঞ্চলের ম্যানেজারদের পঙ্গু করে তুলেছে।

অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার সংক্ষেপে এ-ও মিস্টার এ কে চট্টরাজ এই সময়ে ঘরে উঁকি মারলেন। চট্টরাজের অফিসিয়াল বয়স তিপান্ন পেরিয়েছে। আসল বয়স নিশ্চয় আরও বছর পাঁচেক বেশী। অনেকদিন এখানে আছেন। অনেক উত্থান পতন দেখেছেন।

"আসতে পারি, স্যর?" চট্টরাজের ভারি গলা শোনা গেলো।

"অবশ্যই পারেন। আমার দরজা সব সময় তো আপনাদের জন্যে খোলা আছে।" মনোময় মুখ তুলে তাকালো।

চট্টরাজের দিকে একটি সিগারেট এগিয়ে দেয় মনোময়। "এই নিন, স্মোক করুন। আর দয়া করে আমাকে স্যর বলবেন না, স্যরসরির ওপর বেশী জোর দিয়েই তো ইংরেজরা তৃতীয় শ্রেণীর পাওয়ার হয়ে গেলো। আর জিম, টম, ডিকি নাম ধরে জার্মানরা এবং আমেরিকানরা কোথায় এগিয়ে গেলো!"

"জাপানীরা কী করেন, মিস্টার মজুমদার? আপনি তো সমস্ত পৃথিবীর ম্যানেজমেন্ট আন্দোলনের খোঁজখবর রাখেন।" চট্টরাজের কথায় যেন একটু প্যাঁচ রয়েছে!

"ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট তুলেছেন, মিস্টার চট্টরাজ। জাপানী কায়দাটা আমাকেও জানতে হবে। তবে জাপানে কোম্পানির কর্তাকে কারখানার সমস্ত কর্মীর নাম জানতে হয়। তিন চার পুরুষ ধরে এক একটা পরিবার একই কোম্পানিতে কাজ করে যাচ্ছে—সম্পর্কটা তাই অনেকখানি পারিবারিক।"

"আপনি নিজে সিগারেট খান না অথচ অন্যকে অফার করেন," মিস্টার চট্টরাজ অনুযোগ করলেন।

"জাপানের একটা মজার গল্প বলি শুনুন। ওঁদের একজন নামকরা শিল্পপতি আমেরিকায় কারখানা করলেন। ভদ্রলোক তো তাজ্জব যখন শুনলেন, লোককে ছাঁটাই করবার ক্ষমতা আছে তাঁর। এ সুযোগ তাঁর নিজের দেশে নেই। এক বছর পরে ভদ্রলোক আরও তাজ্জব হলেন যখন তাঁর কারখানার ডেপুটি ম্যানেজার মোটা মাইনের লোভে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিতে যোগ দেবার জন্যে পদত্যাগ করলেন। এ রকম কাণ্ড জাপানে কখনও হয় না।"

"ছাঁটাইও নেই, পদত্যাগও নেই—তাহলে জাপানী পার্সোনেল অফিসারদের কাজ কী?" রসিকতা করলেন অনিলকুমার চট্টরাজ।

"মিস্টার চট্টরাজ, হাতে সময় থাকলে, ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং-এ আসবেন আগামী শুক্রবার। আমি বলছি, ধারাবাহিকতা ও আধুনিকতা সম্বন্ধে। মিস্টার রে প্রিজাইড করবেন। আপনার কী মতামত? আমি বলতে চাই, এদেশের সনাতন চিন্তায় ম্যানেজমেন্টের কোনো স্থান নেই। অমন যে অধর্মের গ্লানি, স্বয়ং ভগবান আশ্বাস দিচ্ছেন যতই অব্যবস্থা হোক তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকো—যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হবে এই দেশে তখন দুষ্কৃতকারীকে বিনাশ করতে এবং পরিত্রাণায় সাধুনাম আমি নিজেই হাজির হবো।"

"তার মানেটা কী দাঁড়ালো, স্যর?" অনিলকুমার চট্টরাজ অকপটে স্বীকার করলেন, "ধর্ম-অধর্ম কোনো ব্যাপারেই আমার পড়াশোনা নেই। আমি শুধু বাংলা খবরের কাগজের হেডিংগুলো পড়ি—আমার লাইফের সমস্ত শিক্ষা ওই দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম থেকে। এ-অফিসে অনেকেই আমাকে পণ্ডিত বলে মনে করেন।"

মনোময় হেসে বললো, "আমার বক্তব্য ; বিপদের সময় অন্য কেউ আকাশ থেকে নেমে আমাকে উদ্ধার করবে এই চিন্তা কলকারখানায় অফিসে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জেঁকে বসেছে। এখানকার মানুষ ভাবতে পারে না, বিপদে পড়লে নিজেকেই তার মোকাবিলা করতে হবে।"

মনের দুঃখে মিস্টার চট্টরাজ নিবেদন করলেন, "জানি না স্যর ! সর্ব

অবস্থায় আমাকে তো নোংরা কথা বলতে কেউ ছাড়ে না। বাবা-মা অত আশা করে নাম রেখেছিলেন অনিলকুমার, এখানে দাঁড়ালো এ কে চট্টরাজ। এখন পোস্টারে বলছে 'অতি খচ্চর চট্টরাজ'! 'এ ফর অতি, 'কে' ফর খচ্চর। ব্লাডপ্রেসারের রোগী আমার বাবা বেঁচে থাকলে, ওই নোংরা পোস্টার দেখে হার্ট ফেল করতেন।"

মনোময় অস্বস্তিবোধ করলো। লোকটাকে ভাল লাগে, আবার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়।

চট্টরাজ এবার নিজের কথায় এলেন। "কোম্পানির ম্যানেজাররা মাথায় উঠে বসেছেন, মিস্টার মজুমদার। অফিসে বসেই বিলিতী সব ম্যাগাজিন উল্টোচ্ছে। আপনি নাকি ওদের জ্ঞান বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। অফিসে বসে এসব ম্যাগাজিন উল্টোনোর স্বাধীনতা এখানে কোনোদিন ছিল না।"

মনোময় মৃদু হেসে শান্তভাবে উত্তর দিলো, "যারা নিজেদের কাজ ফেলে রাখেন না—তাঁরা যদি অফিসের সময়ে জ্ঞানার্জন করেন তাহলে আপত্তি কোথায়? আমি তো বলেই দিয়েছি, আপনারা হুকুমের চাকর হবেন না। চোখ কান খুলে রাখুন। কোথায় কী হচ্ছে খোঁজ করুন। নিজের কাজে মগজ খাটান। কে কতক্ষণ টেবিলে বসে মাথা গুঁজে ফাইল সাফ করেছেন তাই দিয়ে অফিসারদের বিচার হয় না; বিচার হয় এই প্রতিষ্ঠানকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে কে কতখানি সাহায্য করেছেন।"

ব্যাংকে আজ আবার মিটিং আছে। মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে বসে ফিনান্সের কাগজপত্রগুলো একটু ঝালিয়ে নিতে হবে—ব্যাংকের ম্যানেজারকে ধার দিতে অনুপ্রাণিত করবার মতো শক্ত কাজ পৃথিবীতে আর নেই।

কিন্তু মনোময় আত্মবিশ্বাস হারায় নি। ব্যাংকের ম্যানেজার যে এ বি সি ড্রাগস্‌কে আরও টাকা আগাম দেবেন তা এক রকম সুনিশ্চিত।

"সাকসেশ! সাফল্য কখনও তোমাকে এড়িয়ে যেতে পারে না......" ফিসফিস করে মনোময় নিজেকেই বললো।

এমন সময় মনে পড়লো আগামীকালের কথা। ১৫ই ডিসেম্বর। ওই দিনটার জন্য মালবিকা অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে। ওর

ধারণা, মনোময় জীবনে যা কিছু করেছে তার পিছনে রয়েছে মালবিকার দান, তাই জন্মদিনের পুতুলখেলায় ওর এতো আগ্রহ।

যে যা ভেবে আনন্দ পায় তাকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করাটা কোনো বুদ্ধিমান ম্যানেজমেন্টের নীতি নয়।

এই জন্মদিনে মালবিকা নতুন উৎসাহে মনোময়কে নিয়ে নিজের খেলা শুরু করবে—সে ভাবতে চায়—মালবিকা মুখার্জির বিনিয়োগ নিষ্ফল হয় নি। সমস্ত পৃথিবীর লোককে বোঝাবার উপায় থাকলে হয়তো সে বোঝাতো। কিন্তু একজনের পুতুল খেলার নেশায় অকারণ বিঘ্ন ঘটিয়ে কী লাভ? মনোময় তাই নিজের জন্মদিনে নিতান্ত গুডবয় হয়ে থাকে এবং উৎসবের নায়িকা মালবিকাকেই উপহার কিনে দেয়।

এবারে বই দিতে হবে একটা। কী যেন নাম? নোটবই বের করে নামটা আর একবার দেখে নিলো মনোময়। সেবার বোম্বাইতে মালবিকাকে ১৫ই ডিসেম্বর উপহার দিয়েছিল তিন খণ্ডের উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। সেই যে বই যার শুরুতেই রয়েছে কীসব জবড়জং মন্ত্র ঃ

ঈশা বাস্যমিদম সর্বং হৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
......তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।

“উত্তমরূপ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন করো—ধনের আকাঙ্খা করিও না, ধন আবার কাহার?” মালবিকা নিজেই উপনিষদের বাংলা ব্যাখ্যা মনোময়কে পড়ে শুনিয়েছিল।

এবার কিন্তু মালবিকার নজর বহুবর্ণ ইংরেজী বইতে ; ‘বডি বিউটিফুল’। এসব আমেরিকান বইতে অনেক ছবি থাকে—নারী দেহকে ঝকঝকে তকতকে করার সমস্ত নির্দেশ নিশ্চয় বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে ওই বইতে। দেহকে দেবী সম্মানে পুজা করার অষ্টপ্রহরী উৎসব এখন বিদেশে চলেছে। দেহই সব। এদেশেও সে হাওয়া আসছে। আসুক না—যতোই আসে ততোই এ বি কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ড্রাগসের প্রসাধনী বিভাগের পক্ষে ভাল।

বইটার নাম সেদিন কী এক প্রসঙ্গে উঠেছিল। মালবিকা ভাবতেও

পারবে না যে মনোময় এখনও সেটা মনে রেখেছে। স্বামীর জন্মদিনে এইটাই হবে মালবিকার পক্ষে মধুর বিস্ময়।

ব্যাংকের কাজকর্ম শেষ করেই মনোময় কিছুক্ষণের জন্যে বইয়ের দোকানে ঢুকেছিল। ইংরিজী বইতে যা লেখা রয়েছে তার থেকে অনেক বেশী দাম চাইছে ওরা।

লোকটা মিষ্টি মিষ্টি করে বলেছে, "আমাদের উপায় কী স্যর বলুন ? এসব বই দশখানা ইমপোর্ট করলে হাতে চারখানা এসে পৌঁছয়। জাহাজ, পোর্ট কমিশন, কাস্টমস্ কত লোকের যে নজর এই সব ছবির বইয়ের ওপর। বলবার কিছু উপায় নেই—হুট করে অশ্লীল বলে সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করবে।"

"মেয়েদের শরীর স্বাস্থ্য উন্নতির বই এটা", মনোময় গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দেয় বুক কাউন্টারের লোকটাকে।

"সে কথা কে শুনছে স্যর ? মেয়েদের বই হলেও তার সমস্ত রিডারই পুরুষ—অন্তত এই ক্যালকাটায়। মিসেসদের হাতে বই আদৌ পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। এই যে বই আপনাকে দিচ্ছি তারও একখানা পাতায় আবার কালি মাখানো। কিছু একটা ম্যাপট্যাপ ছিল—সেখানে নিশ্চয় ইণ্ডিয়া-চায়না বর্ডারের কোনো ভুল ভ্রান্তি ছিল, তাই কালি মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

বইয়ের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মনোময়, প্যাকেটটা আজ অবশ্যই বাড়ি যাচ্ছে না। ১৫ই ডিসেম্বর বিকেলে নিজের হাতে উপহারটা নিয়ে বাড়ি ঢোকা যাবে।

অফিসে বসে বসে বডি বিউটিফুলের কয়েকটা পাতা উল্টে নিলো মনোময়। ম্যাপ নয়—একখানা ছবির বিবস্ত্র অঙ্গেই কালিমা লেপন করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত না করে অশ্লীলতা ঢাকবার একমাত্র উপায় ছবিতে কালি ঢেলে দেওয়া।

ইংরিজী বইটার পাতায় পাতায় অজস্র ছবি—পশ্চিমী সভ্যতা দেহকে সত্যিই পূজার বেদীতে স্থাপন করেছে। মনোময় আপন মনে একের পর এক ছবি দেখে চলেছে। নারীর দেহসৌন্দর্যের মাপকাঠি দেশে দেশে যুগে

যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে। দেহবন্দনার নতুন মন্ত্র সন্ধানে ভক্তরা অস্থিরভাবে ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করছে। আজ যা পরম আদরের কাল তা বর্জিত হচ্ছে ; কাল যা হেয় আজ তা বন্দিত হচ্ছে। নিয়মিত দেহচর্চার কঠিন সাধনায় শরীরের কোনো অঙ্গ বিকশিত কোনো অঙ্গ শাসিত হচ্ছে। রমণী শরীরের জয়ধ্বনিতে সমস্ত পৃথিবী আজ মুখরিত।.

ক্রিং ক্রিং ! মনোময়ের টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

"মজুমদার স্পিকিং।"

ওদিক থেকে কোনো উত্তর ভেসে আসছে না। "হ্যালো", মনোময় ফোনটা ফ্লাশ করলো।

অস্বস্তিকর ঘ্যান ঘ্যান আওয়াজের পর দ্বিধাজড়িত নারীকণ্ঠ শোনা গেলো, "অপারেটর স্পিকিং স্যর।"

ইংরিজীর উচ্চারণে ভুল, কোনো চর্চা নেই—টিপিক্যাল বাঙালী মেয়ের ব্যাপার। মনোময় কতবার ভেবেছে, বাংলা-মিডিয়াম ইস্কুলে পড়া মধ্যবিত্ত মেয়েদের কর্মজীবনে কোনো মূল্য নেই। এরা কেন যে ইস্কুলে গিয়েছে, সেখানে বছরের পর বছর কী শিখেছে তা স্বয়ং ভগবান ছাড়া কেউ জানেন না। এই সব মেয়েদের না আছে ড্যাশ, না আছে পুশ। না আছে 'গো' না আছে গোঁ। এরা নির্জীব বাংলার আদর্শ বধূ হবার ট্রেনিং হয়তো পায়, কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষের বিরাট বিশাল কর্মযজ্ঞে এদের কোনো স্থান নেই।

অথচ এইসব মেয়েই এখন শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে বাড়ি ছেড়ে কর্মসন্ধানে বেরিয়েছে। এদেরই একজন নিশ্চয় এ বি সি ড্রাগসের টেলিফোন বোর্ডে বসে রয়েছে।

"আমি বিশাখা বিশ্বাস বলছি।" মেয়েটির কণ্ঠস্বর মিষ্ট, কিন্তু প্রাণবন্ত নয়।

বিশাখা বিশ্বাস কে ? কিছুই জানে না মনোময়। শুধু মিস্টার চট্টরাজের কাছে টেলিফোন বোর্ডের সমালোচনা করেছে মনোময়। এই বদলি-

অপারেটর যে কোনো কর্মের নয় তো মনোময় সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে মিস্টার চট্টরাজকে। টেলিফোনটা যে-কোন প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষ করে আধা অসুস্থ এ বি সি ড্রাগসের পক্ষে। টেলিফোনেই যদি কোম্পানিকে অকর্মণ্য, অসুস্থ মনে হয়, তাহলে কে এই কোম্পানির সঙ্গে লেনদেনে নামতে উৎসাহ বোধ করবে?

অনিলকুমার চট্টরাজ তখন চুপচাপ ছিলেন। মনোময় বলেছিল, "কলকাতা শহরে পয়সা দিলে টেলিফোন অপারেটার এখনও নিশ্চয় পাওয়া যায়, মিস্টার চট্টরাজ।"

সেক্ষেত্রে এই মেয়েটির কী অবস্থা হবে তা ইঙ্গিতে জানতে চেয়েছিলেন চট্টরাজ।

"আমাদের এই অপারেটরের প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস কী?" মনোময় প্রশ্ন করেছিল।

"লীভ ভেকান্সিতে কাজ করছে। এখনও ক্যাজুয়াল কর্মী।"

"তা হলে অসুবিধা কী?" নিজের মনোভাব নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছিল মনোময়। "মিস্টার চট্টরাজ, কোনো প্রতিষ্ঠানেই কাজের থেকে কর্মী বড় নয়। কাজ না হলে প্রতিষ্ঠান টিকবে না। আর প্রতিষ্ঠান না বাঁচলে কোনো কর্মীই এখানে থাকবে না।"

মনোময় অবশ্যই নিষ্ঠুর হতে চায় না, কিন্তু কাজের জায়গাটা করুণার জায়গা নয়—এটা মনে না রাখার জন্যেই, কলকাতার কলকারখানার আজ এই অবস্থা। এ বি সি ড্রাগস্-এর মতো আধা অথবা পুরো অসুস্থ কোম্পানি শহরে গিজ গিজ করছে। সাধে কী পৃথিবীর বৃহত্তম অসুস্থ-উদ্যোগ নগরী বলে কলকাতা মার্কামারা হয়ে উঠেছে।

"মিস্টার মজুমদার, আমি একটা স্লিপ পাঠিয়েছি," বিশাখা বিশ্বাস অফিসের কর্তাকে এইটুকু বলতেই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

"স্লিপটা এখনও আমি পাইনি, মিসেস বিশ্বাস," মজুমদার শান্ত অথচ নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলো।

"আপনি এখনই হয়তো পেয়ে যাবেন। একটু দেখবেন।" ওদিক থেকে করুণ আন্তরিক আবেদন।

"আচ্ছা দেখা যাবে।" এই বলে টেলিফোন সংযোগ তখনকার মতো বিচ্ছিন্ন করলো মনোময়।

রিসিভার নামিয়ে রাখবার পরে টেবিলের এক কোণে স্লিপটা নজরে পড়লো মনোময়ের। যখন বাইরে বেরিয়েছিল তখনই কেউ রেখে গিয়েছে, মনোময় লক্ষ্য করে নি।

ঝকঝকে মুক্তোর মতো হাতের লেখা। যার কণ্ঠস্বর এতো সুন্দর, হাতের লেখা এতো পরিষ্কার, তার টেলিফোনের কাজ কেন এতো শ্লথ।

বাংলাতেই লিখেছে বিশাখা বিশ্বাস—অথচ এ-অফিসে ইংরিজী ছাড়া লেখার কোনো রীতি নেই।

"আমি জানি আমার কাজে আপনি সন্তুষ্ট নন। কিন্তু একবার আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। আমি অত্যন্ত সামান্যা কর্মচারী,......

টেলিফোন ঘরটা কোথায়? এই অফিসটা এমন কিছু বড় নয়। সেকেলে বাড়ির একটা ফ্লোরে জন সত্তর লোকের বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার সকলকেই মনোময় চেনে বলে ধারণা ছিল। কিন্তু এই বিশাখা বিশ্বাসের মুখটা তো স্মরণ করতে পারছে না মনোময়। অথচ সমস্ত অফিসটাই তো সে বেশ কয়েকবার ঘুরে দেখেছে।

মনোময় যখন প্রথম এই এ বি সি ড্রাগসে যোগ দিয়েছিল তখন অফিসের কোণে কোণে বহু বছরের ধুলো, ময়লা, এবং ঝুল জমা হয়েছিল। মনোময় নির্দেশ দিয়েছিল তিন দিনের মধ্যে এই অফিস পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর করে তুলতে হবে।

অনিচ্ছুক মিস্টার চট্টরাজ খরচ আর ওভারটাইমের প্রশ্ন তুলেছিলেন। মনোময় সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল,"যারা পরিষ্কার থাকতে জানে না, প্রসাধনীর ব্যবসায়ে তাদের থাকবার অধিকার নেই, মিস্টার চট্টরাজ।"

ইউনিয়নের ভয়ও দেখিয়েছিলেন অমায়িক মিস্টার চট্টরাজ।

মনোময় তখন মুখের ওপর উত্তর দিয়েছিলেন, "সে সব আমি বুঝবো। এই অফিসের কদর্য চেহারাটা বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে পাল্টাবোই।

ঘরের কোণে এবং থামের ধারে রাখা ওই সব বীভৎস বালির পিকদানি দূর করুন—অফিসটা থুথু ফেলবার জায়গা নয়। মিস্টার চট্টরাজ, মনে রাখবেন পরিচ্ছন্ন থাকবার জন্য বিদেশী মুদ্রা বা ব্যাংকের অনুমতি প্রয়োজন হয় না।"

পরের দিন পরিচ্ছন্নতা-অভিযানে অফিসের প্রত্যেকটি টয়লেটে প্রবেশ করেছে মনোময়। এই প্রচেষ্টায় অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল কর্মীদের কাছ থেকে।

মনোময় বলেছিল, "আমি প্রত্যেকটি টেবিল ঘুরে-ঘুরে দেখবো—অফিসটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে রাখার দায় কেবল ঝাড়ুদার জীবনরামের নয়। এটা আমাদের যৌথ দায়িত্ব।"

ইউনিয়নের সেক্রেটারি ইন্দ্রনীল একবার মনোময়ের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল।

"আপনি পিওনদের প্রতিদিন দাড়ি কামাতে, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে এবং বাথরুম স্লিপার পরে অফিসে না আসতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ বলেছি, ইন্দ্রনীলবাবু। ভিজে টয়লেটে রবার স্লিপার মোটেই নিরাপদ নয়। পুরুষদের প্রতিদিন দাড়ি কামানো দাঁত মাজার মতোই প্রয়োজনীয়। আমাদের কোম্পানি দাড়ি কামানোর ব্লেডের ডিস্ট্রিবিউটিং এজেন্সী নেবার চেষ্টা করছে। খরচ একপয়সা না বাড়িয়েও কোম্পানির কিছু লাভ বাড়তে পারে। এজেন্সিটা এলে সবাই বাজার থেকে কিছু কমদামে ব্লেড সংগ্রহ করতে পারবেন।"

মনোময়ের নিষ্ঠা দেখে ইউনিয়নের ইন্দ্রনীল মনে মনে খুশী হয়েছিল। সে বলেছে, "দাড়ি কামানোর সঙ্গে অফিসের বিক্রি বাড়ার কী সংযোগ রয়েছে জানি না, তবে আপনি যখন চাইছেন তখন আমরা সহযোগিতা করবো। বোম্বাইতে আপনি অনেক কিছু দেখে এসেছেন। আমরা এখনই আপনার বিরুদ্ধে যাবো না।"

মনোময় বলেছে, "ইন্দ্রনীলবাবু, এই অফিসেই আমরা জীবনের সব চেয়ে বেশী সময় কাটাই। এখানে আমরা অবশ্যই যতোটা সুন্দরভাবে পারি থাকবো। এই পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব আমরা সকলে ভাগ করে নেবো,

এক-একদিন এক-একজন হবেন ম্যানেজার বিউটিফিকেশন।"

ইউনিয়ন প্রতিনিধি হেসে ফেলেছে। মনোময় বলেছে, "পরিচ্ছন্নতা একটা প্রতীক—এ বি সি কীভাবে চলছে তা এই অফিসে পা দিলেই কিংবা ফোন করলেই জানা যাবে।"

মনোময়ের ইচ্ছা আছে, আর্থিক পরিস্থিতির একটু উন্নতি হলেই অফিসটা আরও সুন্দর করে সাজাবে। বিগত শতকের ফার্নিচার নিয়ে এই শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বিশাখা বিশ্বাসের চিরকুটটা হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল। কাগজটা ইনওয়ার্ড ট্রে-র তলায় চাপা দিয়ে রাখলো মনোময়। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রুমটা এখনও দেখা হয় নি। ওদিকে যাবার কথা খেয়াল হয় নি মনোময়ের।

বিশাখা বিশ্বাসের জানা উচিত, একজন নিতান্ত টেমপোরারি ক্যাজুয়েল কর্মীর পক্ষে অফিসের চীফ এগজিকিউটিভের সাক্ষাৎ চাওয়া উচিত নয়। বিশাখা বিশ্বাস এবং মনোময় মজুমদারের মধ্যে অন্তত দু'ডজন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মী রয়েছেন এই এ বি সি ড্রাগসে।

চিরকুটটা অফিসের অধস্তন কোনো কর্মচারীকেই পাঠিয়ে দেওয়া উচিত মনোময়ের। কোম্পানির টেলিফোন অপারেটরের অন্তত অফিসের নিয়মকানুন জানা উচিত।

কিন্তু......চিরকুটের তলার দিকে একটা লাইনের ওপর হঠাৎ মনোময়ের নজর পড়ে গেলো। লাইনটা কয়েকবার সে পড়লো।

ঘর থেকে বেরিয়ে ডিরেকটরদের টয়লেট যাবার পথে একজন ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সের মহিলা কেমন বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালো মনোময়ের দিকে। পরনে বিবর্ণ সিল্কের শাড়ি। এই কি বিশাখা বিশ্বাস?

মেয়েটি তাকিয়েছে মনোময়ের দিকে। কিন্তু অফিসের চীফ একজিকিউটিভের দিকে কে না তাকায়? তবে মনোময় এমনভাবে হেঁটে চলে এসেছে যে বিশাখার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় নি। উঁচু পদের অফিসারদের এইভাবেই হাঁটার নিয়ম। অফিস ভর্তি লোকের মধ্যে তিনি হেঁটে চলেছেন অথচ মনে হবে তিনি কাউকেই দেখলেন না।

বিশাখা বিশ্বাসের চিরকুটটা ফেরৎ পাঠানো হলো না। একটু মায়া লাগছে মনোময়ের। সম্পূর্ণ অফিসী নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করলে বেচারী হয়তো মনোকষ্ট পাবে।

সুন্দরী, সুগঠিতা, স্বাস্থ্যবতী বিশাখা বিশ্বাস ততক্ষণ এক্সচেঞ্জ রুমে ফিরে গিয়েছে। তার আশা, মিস্টার মজুমদার এখনই তাকে ডেকে পাঠাবেন।

অফিসের কোনো মহলেই এই নতুন মেয়েটির তেমন সমাদর নেই। সাজগোজে স্টাইলের খুব চেষ্টা আছে, কিন্তু মানায় না।

কে যে এই বিশাখা বিশ্বাসকে টেলিফোন বোর্ডে বসালো ! জুনিয়র লেভেলে কোনো লোকই লাইন চেয়ে পায় না। অথচ বিশাখা বিশ্বাস নিজে খটর-খটর্ করে একের পর এক প্রাইভেট কল ডায়াল করে চলেছে। সেই সব ম্যারাথন ফোনালাপে এতো সময় লেগে যায় যে চুনোপুঁটিরা দশ মিনিট লাইন ধরে থেকেও বিশাখার উত্তর পায় না। বলবারও কিছু উপায় নেই—সঙ্গে সঙ্গে কোনো কায়দায় বোর্ড বিকল করে, ভুল ইংরিজীতে বিশাখা জানাবে ডায়লটোন আসছে না।

মনোময় মজুমদার এদিকে একমনে এ-বি কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ড্রাগসের কাজ করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানকে আবার অতীত গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেই মনোময়। ব্যাপারটা শক্ত হলেও যে অসম্ভব নয় তা মনোময় প্রমাণ করে দেবে হাতেকলমে।

ম্যানেজমেণ্টের জগতেও তিন রকম চরিত্র আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মতো কেউ গড়ে, কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে, আর কেউ ভেঙেচুরে শেষ করে। ইদানীং আর একদল ডাক্তার বেরিয়েছেন—যাঁরা প্রায়-মৃত প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। মৃতসঞ্জীবনী সুধার দোকানদার এরা।

ডেভিড ইউসটন বলে এক কানাডিয়ান ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মনোময়ের। ইউসটনের নেশা অসুস্থ মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে তোলা। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে সুখের চাকরি ইস্তফা দিয়ে

ডেভিড ইউসটন এক বছর নাইজিরিয়া, এক বছর ব্রাজিল, আর এক বছর ইংলন্ডে ঘুরে বেড়ায়। ইন্ডিয়ার এক অসুস্থ বৃহৎ কোম্পানির চিকিৎসার জন্যে ডেভিড দু'বছরের জন্যে এ-দেশে এসেছিল। কোম্পানি যখন লোকসানের বোঝা কাটিয়ে লাভের মুখ দেখলো, তখন সবার অনুরোধ সত্ত্বেও ডেভিড ইউসটন চলে গেলো সিঙ্গাপুরে। ডেভিডকে জিজ্ঞাসা করেছিল মনোময়, কেন সে এমন পথ বেছে নিয়েছে?

চিরকুমার ডেভিড বলেছিল, "এমার্জেন্সি এবং চ্যালেঞ্জ না থাকলে আমার ভাল লাগে না, মিস্টার মজুমদার। ডুবন্ত প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরবার জন্যে অপরিচিত দেশে অপরিচিত সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে আমি 'কিক' পাই। এটা এক ধরনের নেশা বলতে পারো! তারপর যখন কোম্পানি আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন আমার আর সেখানে ভাল লাগে না; অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আমাকে আবার অজানা ঠিকানার দিকে ঠেলে দেয়।"

কথাগুলো মনোময়ের খুব ভাল লেগেছিল। মনোময় নিজেকে কিছুটা ডেভিড ইউসটনের ছাঁচে তৈরি করতে চায়। যখন অন্য সব ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে তখন অসহায় কোম্পানিকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে সত্যিই ভাল লাগে। কালোয়া কেমিক্যালসের ক্ষেত্রে মনোময়ের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এবার এ-বি-সি ড্রাগসের ক্ষেত্রে কী হয় কে জানে?

মনোময় মুখ তুলে চাইলো। অধ্যাপক জগদীশ্বর আচার্যের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানা অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন মনোময়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কে বলে প্রতিষ্ঠানের আত্মা নেই? ব্যক্তির মতো, প্রত্যেক কোম্পানিরও সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অনুভূতি থাকে, খালি চোখে তা ধরা পড়ে না এই যা।

মনোময়ের দৃষ্টি আবার টেবিলের ওপর রাখা ইংরিজী বইটার দিকে পড়লো। বডি বিউটিফুলের মাত্র কয়েকটা পাতাই দেখা হয়েছে। বইটার প্রচ্ছদে বসে থাকা স্বল্পবাস সুন্দরীটি ভ্রূধনু ভঙ্গ করে যেন মনোময়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

বইটায় বেশ মাদকতা আছে। আরও কয়েকটা পাতা মন দিয়ে পড়ে

ফেললো মনোময়। শব্দের সঙ্গে চিত্রগুলির সুনিপুণ ব্যবহার আরও আকর্ষণ বাড়িয়েছে। মালবিকাকে উপহার দেবার আগে সবটা পড়ে ফেলতে হবে। ওর সঙ্গে কিছু রসিকতার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনও অফিসের ফাইলগুলো মনোময়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। 'আগামীকাল তোমার দিকে আবার নজর দেবো,' মৃদু হেসে প্রচ্ছদের সুন্দরীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মনোময় আবার অফিসের কাজে মন দিলো।

কাজকর্ম সেরে অফিস থেকে বেরুবার সময় বড় হলঘরের একটা থামের ধারে মনোময়ের নজর হঠাৎ আটকে গেলো। একটি মেয়ে এখনও অফিসে একলা বসে রয়েছে। মনোময়কে দেখে মেয়েটি এবার এগিয়ে আসছে। এতোক্ষণ সে শুকনো মুখ করে বসেছিল, এবার হাসি ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বিশাখা বিশ্বাস নাকি? মনোময়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো।

বনলতা সেন মার্কা ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে রয়েছে বিশাখা বিশ্বাসের মুখে, চোখে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে এই প্রদোষে পঁয়ত্রিশ বছরের মনোময়কে সে যেন জিজ্ঞেস করতে চাইছে, এতোদিন কোথায় ছিলেন?

এতোদিন নয়, এতোক্ষণ। "আমি বিশাখা বিশ্বাস। আমি অপেক্ষা করছিলাম।" বিশাখা বিশ্বাস এবার দ্রুত পদক্ষেপে মনোময়ের পথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। মনোময়ের মনে পড়ছে, চিরকুটটা পেলে সে বিশাখাকে জানাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

"মিস্টার মজুমদার, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমি যে আপনার একটু সময় চাই।"

বেশ লজ্জা পাচ্ছে মনোময়। খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে। মনোময়ের বলবার দোষেই বিশাখা বিশ্বাস অনেক আশা নিয়ে এতোক্ষণ অফিসে চুপচাপ বসে আছে।

কিন্তু আজ যে একটুও সময় নেই। এখনই ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের

জরুরী মিটিং রয়েছে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান মিস্টার নানপোরিয়াও ওই মিটিংয়ে থাকবেন—সুযোগ পেলেই অন্য কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে এ-বি-সি সম্পর্কে দু' একটা আলোচনা সেরে নিতে হবে। এ-মাসে তিরিশ লক্ষ টাকা জোগাড় করতেই হবে মনোময়কে। টাকার অভাবে ব্লেডের নতুন ব্যবসা হাতছাড়া করা চলবে না।

হাল্কা স্যামসনাইট অ্যাটাচি কেস হাতে অফিসের করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে মনোময়। একসময় জীবনানন্দ দাশ মুখস্থ ছিল তার। নাটোরের বনলতা সেনের মূর্তিটা কতদিন সে কল্পনায় আনবার চেষ্টা করেছে। ছাপানো বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে, হাজার হাজার বছরের পথ পেরিয়ে সে যে হঠাৎ এই সন্ধ্যায় অফিসপাড়ায় মনোময়ের সামনে এমনভাবে দেখা দেবে তা কল্পনা করা যায় নি।

বনলতা সেন নয়—বিশাখা বিশ্বাস। বিশাখা বিশ্বাসও যেন মনোময়ের গতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে আসছে অফিসপাড়ার প্রশস্ত রাজপথের দিকে।

এক মুহূর্তের জন্যে পিছনে তাকালো মনোময়। ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। বিশাখা বিশ্বাসকে স্নিগ্ধভাবে সে বললো, "আই অ্যাম স্যরি, আজ আমার সময় নেই।"

"আসছে কাল ?" বিশাখা বিশ্বাসের কণ্ঠে কাতরতা।

মনোময় আর কঠিন হতে পারলো না। "আগামীকাল সকালে ? সারাদিন আমি মিটিংয়ে ব্যস্ত।"

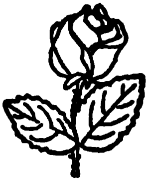
"বিকেলে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করবোই।" আরও কাতর হয়ে উঠেছে বিশাখা বিশ্বাসের স্বর।

বনলতা সেনের দিকে তাকিয়ে নিরুপায় মনোময় নরম গলায় বললো, "দেখি—লেট মি সী।"

একটা ছোট্ট লেডিজ ছাতা বগলে, নরম রেশমী কাপড়ে মোড়া একালের বনলতা সেন আধা-অন্ধকার রাজপথ ধরে ক্লান্ত পদক্ষেপে *এগিয়ে চলেছে।*

মধুসূদন মণ্ডল পরিবাহিত মনোময় মজুমদারের শেল হোয়াইট

অ্যামবাসাডর গাড়িখানা বিশাখা বিশ্বাসকে পেরিয়ে সামনের ত্রিমুখী শকটারণ্যের দিকে ছুটে চললো। শেক্সপীয়র সরণীর ম্যানেজমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন এখনও অনেক দূর।



আজ ১৫ই ডিসেম্বর।

সকাল থেকে মালবিকা অনেক কাজ সেরে ফেলেছে। বেডরুমটা পরিষ্কার করেছে, আলমারিতে সাজানো কিউরিওগুলো ঝাড়া হয়েছে, টেবিলের ফুলদানীতে নিজেই ফুল সাজিয়েছে মালবিকা। তারপর আজকের রান্না। স্পেশাল রান্না তো বটেই।

মনোময়ের একটি ফেভারিট ডিশ আছে। লোককে লজ্জায় সেটা বলা চলে না। মালবিকা শুনছে, সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনেও ডিশটা মাস্ট—'ধোঁকা'।

মণিদীপা ফোনে বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী রাঁধছিস?"

মালবিকা চটপট ইংরিজীতে উত্তর দিয়েছিল, "ব্লাফ।"

"ওমা। তার মানে?" মণিদীপার উদ্বেগ চাপা থাকে নি।

"সারাবছর মনোময় তো আমাকে ব্লাফ দিয়ে কাটায়, তাই বছরের একটা দিন আমি ওকে সুদ সমেত ব্লাফ ফিরিয়ে দিই।"

"কী সব বলছিস, মালবিকা! তোদের সাইকোলজিটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।"

"ধোঁকা! ডাল দিয়ে তৈরি ধোঁকা পেলে মনোময় আর কিছুই চায় না।"

"আমাদেরও দিস, কিন্তু নামটা পাল্টে ভাই—ডালের বড়া-টড়া কিছু বলিস।" মণিদীপার মুড এবার হাল্কা হয়ে গিয়েছে!

১৫ই ডিসেম্বরের রহস্যটা কোনো সূত্রে মণিদীপা জেনে নিয়েছে। সে

বললো, "এখন আবার লেটেস্ট ফ্যাশন হয়েছে, রোমাণ্টিক প্রেমিক-প্রেমিকার মতো গুপ্তনামে স্টেটসম্যান পার্সোনাল কলমে বিজ্ঞাপন দেওয়া। 'এম ডার্লিং, আমি এখনও তোমাকে আগেকার মতোই ভালবাসি।' কিন্তু সকালে কাগজ খুলে তেমন কিছু দেখলাম না। তা সকাল থেকে কী কী করলি?"

"কী আর করবো? বুড়ি হয়ে যাবার সময় তো এগিয়ে আসছে," প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলো মালবিকা।

মণিদীপাকে যা বলা হলো না—প্রতিবছর একটা দুষ্টুমি করে মালবিকা। রাত বারোটা বাজবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে সে, তারপর মনোময়কে জাগিয়ে হ্যাপি বার্থডে জানায়—চুমুতে চুমুতে গাল ভরিয়ে দেয়।

এবারও যথাসময়ে ঘুম থেকে উঠেছিল মালবিকা। কিন্তু মনোময় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঠোঁটে আলতো চুমু দিতেও ওর ঘুম ভাঙলো না। বরং ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুলো। একটু যে রাগ হচ্ছিল না এমন নয়। কিন্তু মনে হলো বেচারা ভীষণ ক্লান্ত। তাছাড়া ১৫ ডিসেম্বর তো রাগ দেখানোর দিন নয়।

বিকেল পাঁচটার পরেই স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিয়েছে মালবিকা। একখানা ময়ূরকণ্ঠী রঙের টাঙ্গাইল শাড়ি পরেছে। এই রঙটাই মনোময়ের খুব প্রিয়। বাবাও খুব ভালবাসতেন এই তাঁতের শাড়ি।

মালবিকা মাঝে-মাঝে ফোনে অফিসে তাড়া লাগায় মনোময়কে—সন্ধ্যায় কোনো সামাজিক অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকলে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আজকের দিনে ইচ্ছে করেই ফোন করলো না মালবিকা। ঘ্যানঘেনে ন্যাগিং ওয়াইফের ভাবমূর্তি গড়ে ওঠার দিন নয় আজ। যেমনটি চলা উচিত আজ অন্তত সেইভাবে চলুক।

শ্রাবন্তী ফোন করেছিল। সেও সন্দেহ করছে, আজকের নিমন্ত্রণটা এমনি নয়—নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলো সে। কিন্তু মনোময়ের ইচ্ছানুযায়ী খবরটা চেপে গেলো মালবিকা।

অনেক ছোট ছোট স্মৃতি দক্ষিণের বারান্দায় বসে এই পড়ন্ত বেলায় মালবিকার মনে পড়ছে। মনোময়ের এতোক্ষণে অফিস থেকে চলে আসা উচিত ছিল।

বাবার কথা মনে পড়ছে মালবিকার। অনেক আশা নিয়ে বাবার সঙ্গে আরও একটু বেশী সময় কাটাবার জন্যে মালবিকা কলকাতায় চলে এলো। মালবিকার উৎসাহ না থাকলে মনোময় কলকাতায় ফেরার ব্যাপারে এতোটা গুরুত্ব দিতো না। অথচ যাঁর জন্যে আসা তিনিই রইলেন না!

মেয়ে এবং জামাইয়ের সমস্ত ব্যাপারে গর্ব করার এবং ছেলেমানুষের মতো আনন্দিত হবার ক্ষমতা পৃথিবীতে একমাত্র বাবারই ছিল।

সেবার কে যেন এই ১৫ই ডিসেম্বরে জানতে চেয়েছিল, "মনোময়কে কী দিচ্ছিস মালবিকা?"

বাবা সামনেই বসেছিলেন। কী রকম আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলেছিলেন, "আজ যে-মনোময়কে দেখছো তোমরা সে তো খুকুরই তৈরি। ও নিজেই খুকুর উপহার টু দ্য ওয়ার্লড। ইয়ংগেস্ট ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অফ বম্বে ম্যানেজমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন, ইয়ংগেস্ট ভিজিটিং প্রফেসর, বাজাজ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট।"

মালবিকার মনে পড়ছে, নিতান্ত খেয়ালের বশে সে যখন কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র পড়তে চলে গেলো তখন বাবা চিন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলেন নি। "মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়ায় আমি বিশ্বাস করি" বন্ধুকে বলতেন বাবা। "ওর মধ্যে বিবেক রয়েছে; ও কেন এমন কিছু করবে যাতে আমরা ছোট হয়ে যাবো?"

বাবা গর্বের সঙ্গে বলতেন, "আমার মেয়ে সুদর্শনা, বুদ্ধিমতী, বিদূষী। আমার মেয়ে দীর্ঘাঙ্গিনী, মাথা উঁচু করে হাঁটে, ব্যক্তিত্বময়ী। আমার মেয়ে পরিশ্রমী, মেধাবিনী এবং পরীক্ষায় ভাল ফল করে। আমার মেয়ের গায়ের রং দুধে-আলতা নয়—ডানাকাটা পরীও নয় সে। সেটা ভালই হয়েছে—তা হলে সব সময় কাঁচের শো-কেসে চাবি দিয়ে রাখতে হতো। ডল পুতুলদের যুগ চলে গিয়েছে—এখন মালবিকার মতো মেয়েদের

সময়।"

মালবিকার তুলনায় বাগবাজারের সেই অন্ধকার কানাগলির মনোময় মজুমদার তখন কী? দেখতে মোটেই স্মার্ট নয়, আত্মবিশ্বাস তেমন নেই, উচ্চাশার আগুনও জ্বলছে না তার বুকে। তার চোখ দুটি ছিল গভীর দীঘির জলের মতো। ব্যবহারে ছিল শালীনতা। ভারী সুন্দর মুক্তোর মতো হাতের লেখা। নিজের সায়েন্স বিষয় ছাড়াও বাংলা এবং ইংরিজীটা ভালো জানতো। আর ছিল জ্ঞানার্জনের নেশা—যেখানে যা বই পেতো সব পড়ে ফেলতো মনোময়।

মালবিকাই ওর মধ্যে কাজের ছন্দ ও শৃঙ্খলা এনেছিল। কলকাতা থেকে দূরে বিদ্যানগর ক্যামপাসে এম. এ-সি পড়ার সময় মালবিকা ওকে বলেছিল, "আগডুম-বাগডুম পড়ে কোনো লাভ নেই, মনোময়। ছাত্রদের পড়াশুনায় একটা লক্ষ্য থাকা চাই।"

"বিদ্যার্থীকেও ব্যবসাদার হবার পরামর্শ দিচ্ছো মালবিকা?" একটু আপত্তি করেছিল মনোময়।

"পরীক্ষায় পাশের নম্বর দিয়ে যখন এদেশে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ হয় তখন কী করবে মনোময়?" মালবিকার চিন্তায় কোনো ধোঁয়াটে ভাব দেখা যায় নি।

মনোময়ের মধ্যে তখনও উচ্চাশা ছিল না। কোনোরকমে পরীক্ষায় পাশ করে একটা সাধারণ চাকরিতে ঢুকে পড়তে পারলেই সন্তুষ্ট হয়ে যেতে মনোময়।

কিন্তু মালবিকার উর্বর মস্তিষ্কে তখন অন্য চিন্তা। ক্যামপাসের নির্জন পথ ধরে মনোময়ের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে মালবিকা বলতো, "এই যারা চাকরিতে, কলকারখানায়, গবেষণায়, অধ্যাপনায় বড় হচ্ছে, নাম করছে, সমুদ্রের ধারে উঁচু-উঁচু বাড়িগুলোতে যারা স্বপ্নলোক সাজিয়ে বসে আছে তারা কীসে তোমার থেকে সেরা মনোময়?"

বাগবাজারের কানাগলির ছাদফুটো ঘরটার বাইরে তখনও ভাবতে পারছে না মনোময়। "চাওয়ার তো একটা সীমা আছে, মালবিকা।"

"প্রত্যাশার কোনো রেশনিং নেই। আমার বাবা বলেন, শাস্ত্রে

লিখেছে, যে যা চায় তাই পায়। চাওয়ার বাইরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

"কোথায় বলেছে একথা?" মনোময় কৌতূহল প্রকাশ করেছে।

"কেন? বাংলা ভাল জানি না বলে এতোই বোকা ভেবেছো? যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে। বাবা এবার আমাকে লিখেছেন, দেবী সরস্বতী বলছেন, 'আমি স্বয়ং কাহারও জন্য কিছুই করি না। জীবগণ নিজেরাই নিজ নিজ ঈপ্সিত কর্ম সম্পন্ন করে।"

"বাবার চিঠিগুলো যত্ন করে রেখে দাও," রসিকতা করেছিল মনোময়। রাখলে ভালই করতো মালবিকা। আর একখানা লেটারস ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার হয়ে যেতো। সনাতন ভারতবর্ষের কত জ্ঞানের কথা কত কষ্টে সংগ্রহ করে কত সহজভাবে লিখে বাবা প্রবাসিনী মেয়েকে পাঠাতেন।

মনোময় সেবার পড়াশোনায় একটু ঢিলেমি দিয়েছিল। বলেছিল, "ভাল লাগে না। বছরের পর বছর এই পরীক্ষার বলদ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘানি টানতে ইচ্ছে করে না।"

পরীক্ষার এই বন্ধন মালবিকারও যে ভাল লাগছিল তা নয়। কিন্তু মনোময় সম্পর্কে মালবিকার যে অনেক আশা। সেইদিন বিকেলেই এভারেস্ট হোস্টেলে টেলিফোন করেছিল মালবিকা।

মনোময় ভেবেছিল, বিশেষ কোনো কথা আছে—কিংবা কোনো প্রোগ্রামের কথাবার্তা পাকাপাকি হবে। কিন্তু মালবিকা বললো, "শোনো বাবার পুরনো চিঠিতে সুন্দর একটা লাইন পেলাম। ফ্রম যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ; 'অভ্যাস ব্যতীত কাহারও কোনো কর্ম সম্পন্ন হয় না'।" এরপর অবশ্য একটু মজা হয়েছিল!

মালবিকা নিজেই ভাল বুঝতে না পেরে মনোময়কে প্রশ্ন করেছিল, "হোয়াট ইজ 'ব্যতীত'? বাবা যা সব শক্ত শক্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন।"

মনোময় ব্যাখ্যা করেছিল, "বিনা অভ্যাসে কিছু হয় না, এটাই বহুকাল আগে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চাঁচাছোলা সংস্কৃতে বলে গিয়েছেন।"

তারপর মালবিকা ক'দিন ওকে 'ব্যতীত' বলে ডেকেছে—মনোময় তাতেই ধন্য হয়ে গিয়েছে। তখন সে যে মালবিকারই মুখ চেয়ে থাকে।

শীতের এই আসন্ন সন্ধ্যায় মালবিকার মনে হলো, তখন যে প্রধান ভূমিকায় মালবিকা নিজেই। মনোময় তখন নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, নিতে চায়ও না। মালবিকাই জোর করে বলেছিল, "তোমাকে একটা পথ খুঁজে নিতে হবে এবং সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে নিজের লক্ষ্যের দিকে।"

এই লক্ষ্যটা কী তাও মনোময় স্পষ্ট জানতো না ; মালবিকাই তার হয়ে সব স্থির করে দিতো। এমন কি পরীক্ষা-সমুদ্র পেরনোর উপায়ও মালবিকাই আবিষ্কার করেছে।

মনোময় ভাল ছাত্র, তার অধ্যাবসায় আছে—কিন্তু তাই সব নয়। মালবিকা বলেছে, "অধ্যাপকদের সঙ্গে মেলামেশা করো। ওঁদের প্রিয় হও, মনোময়। শুধু পড়ার জোরে পরীক্ষায় ভাল ফল নাও হতে পারে।"

তখনকার মনোময় বান্ধবীকে কোনো প্রশ্ন করতো না। সেই বন্ধুহীন প্রবাসে, বিদ্যানগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মালবিকা যা বলতো তাই সরল বিশ্বাসে মেনে নিতো মনোময়।

মালবিকার পক্ষেও সে এক নতুন ধরনের এক্সপেরিমেণ্ট। জীবনকে জানে না মনোময়, কিন্তু মানুষটার উপাদান ভাল—ওকে নষ্ট হতে দেবে না মালবিকা। নিজের মতো করে তিলে তিলে মনোময়কে গড়ে তুলতে সে বদ্ধপরিকর।

কৃতজ্ঞ মনোময় মাঝে মাঝে বলতো, "আমার জন্যে অহেতুক তুমি কষ্ট করো। দারুণ শীতে বাঁচবার জন্যে তোমার বাবা তোমাকে কোট কেনবার টাকা পাঠালেন ; আর তুমি সেই টাকার অর্ধেক খরচ করে আমার জন্যে সোয়েটার কিনে আনলে।"

"আপত্তি থাকলে হিসেব রেখে দাও—প্রাইজের টাকা থেকে শোধ করে দিও !" মালবিকা তৎক্ষণাৎ মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছে।

"স্কলারশিপ সে তো তোমারই চেষ্টায়। প্রাইজ যদি আসে তাতেও আমার কোনো ক্রেডিট থাকবে না," মনোময় তখন কেমন অকপটে

কথা বলতো।

"ক্রেডিট ডিসক্রেডিটের হিসেব পরে করা যাবে—এখন এই দরকারি নোটগুলো রাখো। প্রফেসর সাক্সেনা এবং প্রফেসর হিঙ্গোরাণীর কাছ থেকে অনেক কষ্টে আদায় করে এনেছি।"

"ওঁরা দুজন কাঠের মতো শুকনো লোক—কেউ কাছে এগোতে সাহস করে না।"

"দেখলাম, তুমি ওঁদের কাছ ঘেঁষবে না—তাই আমাকেই মাঠে নামতে হলো।" মালবিকা হাসতে হাসতে বলেছে।

মনোময় সেদিন বিস্ময়ে হতবাক। কেউ যে এমনভাবে অন্য কারুর জন্য এতো ভাবতে পারে এতো কষ্ট স্বীকার করতে পারে তা ভাবতে ওর চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

তারপরেও অনেক কিছু অপেক্ষা করছিল। মনোময় এম. এস-সি পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। মালবিকা নিজে একটু পেছিয়েছে। কিন্তু তার জন্যে মালবিকার কোনো দুঃখ নেই। "যার ভাল করা উচিত, যে আমার থেকে অনেক ভাল ছাত্র সে-ই ভাল করেছে।"

এর পরও অবাক কাণ্ড। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে এবার কোনো একটা চাকরির খোঁজে কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ভাবছিল মনোময়। মালবিকার বাবা চাইছিলেন, বিদ্যানগর ক্যাম্পাসেই তাঁর মেয়ে এম. এস-সি'র পরে কিছু গবেষণা করুক। "নিজের মেয়ের নামের পাশে একটা ডক্টরেট থাকলে বেশ ভাল লাগে," বাবা মিষ্টি করে লিখেছিলেন।

কিন্তু মালবিকা এসব কিছুই করলো না—ডক্টর হিঙ্গোরাণীকে ধরে বিদ্যানগর ক্যাম্পাসের মডেল ইস্কুলে শিক্ষিকার চাকরি নিলো, আর মনোময়কে বললো, "আমি কিছু শুনতে চাই না, তুমি এখান থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নিয়ে নাও।"

নির্বাক পাথরের মতো বসে ছিল মনোময়। মালবিকা বলেছিল, "আমি ভেবে দেখেছি, মনোময়। শুধু সায়েন্স পড়ে এ যুগে তেমন লাভ হবে না। একটা ম্যানেজমেন্টের ছাপ থাকলে অনেক কাজে আসবে।"

সেদিনও মনোময়ের চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। "আমার জন্যে

তোমার ভবিষ্যৎ কেন নষ্ট হবে মালবিকা? তোমার বাবার কাছে মুখ দেখাবে কী করে?"

"বাবাকে বুঝিয়ে আমি লিখে দিয়েছি। কিছুদিন এখানকার ইস্কুলে পড়ানোর লোভ আমি ছাড়তে পারছি না বাবা।"

মনোময়কে তখনও চুপচাপ থাকতে দেখে মালবিকা বলেছে, "মাত্র দু'বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

"ওখানে যে স্কলারশিপ পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই মালবিকা।"

"কিন্তু তাই বলে লক্ষ্যের দিকে এগোনো বন্ধ থাকতে পারে?"

হোস্টেলে মালবিকার বান্ধবী ছিল হায়দরাবাদের মেয়ে সুচন্দ্রা ব্যানার্জি। সুচন্দ্রাও ভয় দেখিয়েছিল, "কী সব ছেলেমানুষী করছিস? আমেরিকান ক্যাম্পাসে এই রকম হয়, বান্ধবীর রোজগারে বন্ধু পড়ছে—কিন্তু তা বলে এখানে না?"

মালবিকা বলেছে, "বিলেত আমেরিকা ইন্ডিয়া কিছুই জানি না আমি, সুচন্দ্রা। চোখের সামনে সুযোগের অভাবে একটা ব্রাইট ছেলেকে নষ্ট হতে দেবো না আমি।"

"তুই তো দেখছি তিলে-তিলে ওকে নিজের স্বপ্নের মতো গড়ে নিচ্ছিস।" রসিকতা করেছিল সুচন্দ্রা!

"গড়ে নিতে এখনও অনেক বাকি—আমি চাই মনোময় এগিয়ে যাক। আমার ওপর নির্ভর করে, বাড়ির আপত্তি না শুনে সে কলকাতা ছেড়ে এখানে চলে এসেছিল।"

সুচন্দ্রার টিপ্পনী, 'মনোময়ই হচ্ছে তোর থীসিস পেপার! একদিন হয়তো তুই ওই সাবজেক্টেই অনারেরি ডক্টরেট পেয়ে যাবি!"

"থীসিসটিকে আগে রেডি করি, তোরা সব পরীক্ষা করে দেখ,—তারপর তো কনভোকেশন।"

এই 'কনভোকেশন' কথাটাই সুচন্দ্রা ব্যবহার করেছিল ওদের বিয়ের গ্রীটিংস টেলিগ্রামে। সুচন্দ্রা তখন জার্মানির ম্যাক্সপ্ল্যাংক ইনস্টিটিউটে গবেষণা করছে। কনভোকেশন কথাটার মানে বুঝতে পারে নি মনোময়। মালবিকা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, "সব জিনিস বুঝে লাভ নেই। সুচন্দ্রা

আমার সঙ্গে একটু রসিকতা করেছে।"

ম্যানেজমেন্ট কোর্সের ওই মাসগুলি সত্যিই কষ্টে কেটেছে। হোস্টেল ছেড়ে দূরে একটা ঘর ভাড়া করে থাকতে হয়েছে মালবিকাকে। অতি অল্প টাকায় দিন চালাতে হয়েছে, না হলে মনোময়ের পড়াশোনার খরচটা ওঠে না।

এখন কিছু বলার নেই। কয়েক বছর আগে মনোময় তাকে পঁচিশ হাজার টাকার কী এক আর্থিক উপহার দিয়েছিল..বিবাহিত মহিলার সম্পত্তি আইন অনুযায়ী।

মালবিকা সে-কথাটা বাবাকে বলেছিল। বাবা শুনে বলেছিলেন, "ভাল কথা। আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু মনোময়কে মনে করিয়ে দিও, বিবাহিত মহিলার সবচেয়ে মূল্যবান প্রপার্টির নাম স্বামী!"

"খুকু তুই সত্যি আমাকে অবাক করে দিলি। ওই লাজুক নার্ভাস, শ্যামলা মনোময়কে দেখে আমি কোনোদিন ভাবিনি সে এমনভাবে তৈরি হবে। স্বীকার করছি, তুই আমার থেকে ভাল কাঠ চিনিস, মালবিকা।"

ঘরের দেওয়ালে এখন অনেকগুলো ছবি টাঙানো আছে। আমেরিকান ফার্মাসি কোম্পানির টেবিলে বসে কাজ করছে তরুণ মনোময়! 'বছরের সেরা অফিসার' মানপত্র পাচ্ছে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটরের কাছে। বম্বে ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা করছে মনোময়। কালোয়া কেমিক্যালসের মিস্টার অম্বালাল পারেখ অভিনন্দন জানাচ্ছেন মনোময়কে। মনোময়ের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে একটি মারাঠী মহিলা কর্মী। কালোয়া কেমিক্যালসের নতুন কারখানার দ্বারোদ্‌ঘাটন করছে মনোময়।

মিস্টার অম্বালাল পারেখ জোর করেছিলেন, শুভ কাজটা মনোময়কেই করতে হবে।

এই যে সব ছবি, আজ জন্মদিনে তা বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। আর চাপা উত্তেজনার আনন্দ অনুভব করছে মালবিকা। জামাইয়ের কৃতিত্বে বাবা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'খুকু, এসব তোর কৃতিত্ব। কোনো ছবিতে তুই নেই ঠিক; কিন্তু প্রত্যেকটি ছবিতে আমি

তোকে দেখতে পাচ্ছি।”

ওই যে কলকাতা কলেজের বি. এস-সি ক্লাশ থেকে বিদ্যানগর ক্যাম্পাস, তারপর ম্যানেজমেন্টে সোনার মেডেল, এবং বোম্বাইতে আমেরিকান ফার্মাসির অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার—এ-পর্যন্ত মালবিকা ছিল দাত্রীর ভূমিকায়। তারপর এক শুভসন্ধ্যায় পানপাতায় চোখ আড়াল করে পিঁড়িতে চড়ে ছাঁদনাতলায় টোপরপরা মনোময়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে মালবিকা।

বোম্বাইতে কাজ শুরুর পরেই মনোময়ের আরোহণ শুরু হয়েছে। পিছন দিকে তাকাবার সময় সে আর পায় নি। মনোময় এখন কেবল এগিয়েই চলেছে।

মনোময়ের কর্মজীবন ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—মালবিকা সে তুলনায় বোধহয় নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। সারা পৃথিবীর কত খবর রাখে মনোময়—কে বলবে এই মানুষটাই আগে জানতো না কোথায় বিদ্যানগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফর্ম পাওয়া যায় ; কীভাবে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে হয়।

এই যে মালবিকা ছোট হয়ে আসছে এবং মনোময় বড় হয়ে উঠছে, এ এক অদ্ভুত মানসিক অভিজ্ঞতা। যে একদিন তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে ধন্য হয়ে যেতো, এখন তুমিই তার পথ চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করো। যে একদিন তোমার উপদেশের জন্য মুখ চেয়ে থাকতো সে এখন তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। পৃথিবীর কত লোক তার গুণমুগ্ধ, কত লোক তার উপদেশ নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে। কত বিমুগ্ধ শ্রোতা তার বক্তৃতার প্রশংসা করে। আর তুমি ? তুমি এখন বি. এস-সি অনার্সে ফার্স্টক্লাশ পাওয়া, এম. এস-সিতে সহপাঠিনী মালবিকা মুখার্জি নও—তুমি নিতান্তই একজন মিসেস মজুমদার, যে বিশ্বের, বিজ্ঞানের, বিজনেসের কিছুই বোঝে না।

শ্রাবন্তী এসে গিয়েছে। সে বলছে, "উঃ, কতদিন পরে তোদের দুজনকে একসঙ্গে দেখবো বলে ছুটে এলাম। মনোময়টা তখন বেশ বোকাসোকা ছিল—সেদিন টিভিতে দেখে ওকে চিনতেই পারি না। তোর হাতযশ আছে মালবিকা,—মনোময়কে যেভাবে গড়ে পিঠে নিয়েছিস !"

মিটমিট করে হাসলো মালবিকা। শ্রাবন্তী বলছে, "লেডিজ স্টাডিগ্রুপের মিসেস কানোরিয়াকে আমি বলবো, তোকে একদিন বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করতে—স্বামীপালন পদ্ধতি, হাউ টু মেক এ হাজবেন্ড ! জলা জমি নিয়ে, মাটি দিয়ে ভরাট করে, পাঁচিল তুলে, ভিত কেটে, নিজের পছন্দ মতো প্রাসাদ করা—আমাদের মধ্যে একমাত্র তুই পারলি !"

চুপ করে বসে আছে মালবিকা। শ্রাবন্তী বলে, "মনোময়ের উচিত তোকে সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দু'বেলা পুজো করা !"

"পুজো তো দূরের কথা, নাগাল পাওয়াই ভার হয়ে উঠেছে। এই দেখ না, এখনও এলো না।" মালবিকার এবার চিন্তা আরম্ভ হয়েছে।

"পুরুষরা স্বভাবতই নেমকহারাম ! এই দেখ না, আমার কর্তাটি পাঁচদিন ইউরোপ থেকে কোনো চিঠি পোস্ট করে নি—অথচ আমি যখন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে জাপানে গিয়েছিলাম তখন প্রতিদিন স্বামীকে একটা করে চিঠি লিখেছি।" শ্রাবন্তী হাসতে-হাসতে পতিনিন্দা শুরু করছে।

মনোময়কে কেউ নেমকহারাম বলছে এটা খচ করে লেগে গেলো। মালবিকা নিজেই কারণ দেখালো, "কাজ। লোকটাকে কাজের নেশায় পেয়েছে, শ্রাবন্তী।"

"তোর মন তো এখনও সরল। আমি ভাই ওসব বিশ্বাস করি না। কাজটা একটা ছুতো—আসলে বহু কিছুকে একসঙ্গে ভালবাসার প্রবৃত্তি

পুরুষমানুষের আছে।"

না, আজ কিছুতেই টেলিফোন করবে না মালবিকা। সে দেখতে চায়, অন্তত একটা দিন কাজ এবং কেরিয়ার ফেলে মনোময় বাড়ি ফিরে আসে কিনা পুরানো দিনের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

মিসেস ভৌমিকও এসে গেলেন। ওঁরও একই প্রবলেম—কী একটা জরুরী কাজে স্বামীদেবতা হঠাৎ আজ কোথায় ফ্লাই করে চলে গিয়েছেন। "অফিস থেকে বাড়িতে পর্যন্ত আসেন নি উনি—লোক পাঠিয়ে গৃহত্যাগের ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছেন।"

"গৃহত্যাগের ব্যাগ ?"

"হ্যাঁ, গৃহত্যাগের পর পথে যেসব জিনিস প্রয়োজন হতে পারে সেসব বোঝাই একটা ব্যাগ সব সময় রেডি হয়ে থাকে।" জানালেন মিসেস ভৌমিক।

মণিদীপা এবং ওঁর স্বামী দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরীও হাজির হয়েছে। মণিদীপা ঘরে ঢুকেই বললো, "কী চমৎকার গাড়ি তোর, মালবিকা। দূর থেকে আলোর গয়নাপরা এগারোতলা বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল, আহা, যেন গগনে গন্ধর্বলোক।"

"কোথায় মনোময় ?" হৈ-হৈ করে ওঠে মণিদীপা। "আসুক সে, তারপর একচোট হবে। আমি তো সোজাসুজি বলে বসবো, অমন আনস্মার্ট বোকাসোকা গোবেচারা কালো ঘোড়াই যে শেষ পর্যন্ত মালবিকা-ট্রফি জিতে নেবে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। কীরে ? আমি কিছু বাড়িয়ে বলছি ?"

"আমি নিজেই তা ভাবতে পারি নি," পরিস্থিতি হাল্কা করবার জন্যে মালবিকা মুখ খুললো।

মণিদীপা বললো, "তুই যা স্পর্শ করিস তাই সোনা হয়ে যায়—দে তোর হাতটা একটু টিপে নিই। মনোময়ের এখন যা নাম-ডাক। কথায় কথায় বিজনেস এক্সপ্রেসে ছবি, রেডিওতে রেকর্ডিং, টেলিভিশনে আলোচনা।"

"বিজনেসের পাণ্ডিত্যের দিকটা ও পছন্দ করে। বিজনেস ফিলজফি

নিয়ে একটা বইও লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে যাচ্ছে—এখন একদম সময় পাচ্ছে না বেচারা"। মালবিকা সরল মনে স্বামীকে সার্টিফিকেট দিলো।

আনন্দে ঝলমল মণিদীপা বললো, "উঃ, কী ডেনজারাস মহিলা তুই! বাগবাজারের মনুকে তুই সায়েন্সের তপোবনে নিয়ে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বানালি, তারপর তাকে বিজনেস ম্যানেজমেণ্টে ঢুকিয়ে বম্বের মিস্টার মজুমদার করে তুললি। এখন আবার স্বামীকে লেখক দার্শনিক মহাত্মা মনোময় বানাবার মতলব আঁটছিস। সত্যি তুলনা নেই তোর। তুই যা চাইবি তাই যে হবে সে-সম্বন্ধে আমাদের মনে একটুও সন্দেহ নেই।"

আজ সকালে স্যুট পরে চোখে চশমা লাগিয়ে মনোময় যখন ব্যাগ হাতে লিফটের জন্যে এগারোতলার ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে ছিল তখন সত্যিই মনে হচ্ছিল লোকটা পারে না এমন কাজ নেই, ওর অপার আত্মবিশ্বাস। মনোময় যে-পক্ষ অবলম্বন করবে বিজয়লক্ষ্মী সেদিকেই অবস্থান করবে, ও যা স্পর্শ করবে তাই সোনা হবে, ওর কোনো কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে না, মনোময় যা আশা করবে তাই পাবে। সম্মানিত হবার জন্য, বিজয়ী হবার জন্যই 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' মালবিকা ওকে তিলে তিলে তৈরি করেছে। মনোময় হয়তো মালবিকার কাছে এখন চাওয়া মাত্রই ধরা দেয় না, কিন্তু তাও তো বিজয়ীর লক্ষণ।

কিন্তু একটু অভিমানও আসছে মালবিকার। এতগুলো অতিথিকে নিয়ে স্ত্রী একলা বসে আছে, অথচ যাঁর জন্যে এঁদের উপস্থিতি তিনি এখনও বাড়ি ফিরলেন না।

না, কিছুতেই আজ স্বামীকে ফোন করবে না মালবিকা। ভাগ্যে মালবিকা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। না-হলে আসল খবরটা এখানে এলে এ-বাড়ির মুড এতোক্ষণে অন্যরকম হয়ে যেতো।

মণিদীপার স্বামী দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী ফৌজদারী আদালতের অ্যাডভোকেট।

"আচ্ছা তোরাই বল, আজকাল উকিলকে কেউ বিয়ে করে?" রসিকতা করলো মণিদীপা। "কিন্তু আমার কপাল—এই লোকের সঙ্গেই প্রেমে পড়লাম। সবাই সাবধান করে দিলো, খেতে পাবে না। ভাবলাম,

খেতে না পাই, সকাল দশটা পর্যন্ত এবং বিকেল চারটে থেকে মাঝ-রাত পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে গল্প করার চান্স পাবো। টাকাটাই তো দাম্পত্য-জীবনের সব নয়। হাজার হোক আমিও ল' পাশ, আমার একটা মাস্টারিও আছে। কিন্তু হা কপাল!"

"কেন? কী হলো? তোর কপালে তো কোনো ফুটো দেখছি না," সরস উত্তর দেয় মালবিকা।

"সব ফুটো কি খালি চোখে দেখা যায়? বিয়ের পরে কত নতুন বালতিতে ফুটো ধরা পড়ে। আমার স্বামী হঠাৎ মন দিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করলেন। উকিল তো! কথা বেচে খায়। বলে, প্র্যাকটিসটা জমলো তোমার কপালে। গালাগালি না প্রশংসা জানি না—একজন সাধু গঙ্গার ধারে আমাকে একবার বলেছিল, তোমার ভাগ্যে স্বামী সান্নিধ্য নেই।"

"দেবপ্রসাদবাবু তো দেখছি খুব শান্ত ভদ্রলোক—মুখ বুজে তোর কথা সহ্য করে যাচ্ছেন" বান্ধবীর স্বামীর পক্ষ নেবার চেষ্টা করলো মালবিকা।

"উকিল যে! ফী না পেলে মুখ খুলবেই না। তবে আজ আমি কড়া হাতে নোটিশ দিয়েছি। থাকুক তোমার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ভুলে যাও তোমার জামিন, পিটিশন, ক্রশ এগজামিনেশন, কনফারেন্স এবং মিস্টার বলাই রায়ের সঙ্গে কনসাল্‌টেশন। আজ যদি..."

"জামিন হয় না এমন সময়ে গৃহিণীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি বিকেল সাড়ে চারটেয়," সবিনয়ে স্বীকার করলেন সহাস্য দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

খুশী হয়ে মণিদীপা বললো, "মনোময় আজ খুবই বকুনি খাবে। যত বড়ই সে হয়ে থাক, আমরা যারা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি তারা মনোময় হাইকোর্টের জজ হলেও আজ তাকে কেয়ার করতাম না।" স্বামীকে মণিদীপা বললো, "তুমি তো মনোময়কে দেখো নি এখনো। বোকা-সোকা ঐ ছোকরাই যে মালবিকাকে পকেটস্থ করবে তা কে জানতো!"

সবাইকে একটু অবাক করে দেবপ্রসাদবাবু বললেন, "অবশ্যই ওঁকে দেখেছি। দুটো মামলায় পুরো দেড়ঘণ্টা ধরে মিস্টার মজুমদারকে জেরা করেছি!"

মণিদীপা আঁতকে ওঠার ভাণ করলো। "এ্যাঁ! এ-কথা তুমি তো আগে বলো নি। যাঁকে তুমি তালে পেয়ে কাঠগড়ায় তুলে কড়া কড়া কথা শুনিয়েছো তাঁর বাড়িতেই এসেছো নেমতন্ন খেতে!"

"একজন লরি কন্‌ট্রাক্টরের নামে উনি চুরি এবং টাকা ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে কেস করে দিয়েছেন। খুব জাঁদরেল লোক বলে কোম্পানিতে মিস্টার মজুমদারের নাম হয়েছে।"

"সে কি? ওকে কোর্টে যেতে হয়েছিল? মনোময় তো বাড়িতে কিছু বলে নি," অ্যাডভোকেট দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথায় উদ্বেগ প্রকাশ করলো মালবিকা।

"এই ওদের স্বভাব!" ইন্ধন জোগালো মণিদীপা। "অফিসে আদালতে কী ঘটছে বাড়িতে এসে তার কোনো রিপোর্ট দেবে না!"

দেবপ্রসাদ মৃদু হেসে জানালেন, "মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে কথার লড়াই অনেকক্ষণ চলেছিল।"

"তার মানে তুমি শত্রুপক্ষ?" মণিদীপার প্রশ্ন।

"সে মামলা তো শেষ হয়েছে। সুতরাং এখন পক্ষপাতের প্রশ্নই নেই আর।" দেবপ্রসাদ আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলেন।

অতিথিদের অনেকের তাড়াতাড়ি আছে, ডিনার আর দেরি করা চলে না। রাগে ফুঁসছে মালবিকা। বাড়ি ফিরতে অন্যদিনের থেকেও আজ বেশী দেরি করবে নাকি মনোময়?

শ্রাবন্তী বললো, "দ্যাখ, কলকাতায় আছে কিনা। আমাদের প্রতিবেশী এক রাজনৈতিক নেতা কিছুদিন আগে চটি পরে থলি হাতে সকালে মাছ কিনতে বেরিয়ে আর ফেরেন না। বাড়ির সকলের সে কী দুশ্চিন্তা! তারপর জানা গেলো ভদ্রলোক পার্টির কাজে ওই অবস্থায় বম্বে চলে গিয়েছেন।"

চারজনের খাবার দিয়ে দিলো মালবিকা। ভদ্রতার খাতিরে শুধু মণিদীপা বললো, "আমরা একটু অপেক্ষা করে যাই। খাবার নিয়ে চুপচাপ বসে থাকায় আমি স্পেশালিস্ট হয়ে গেছি। এক-একদিন তো

সবে ডিনার খেতে বসেছে, তখন ওকে থানায় টেনে নিয়ে গেল।"

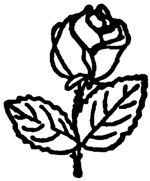
"যেতে দিস কেন ? মালবিকা এখন মণিদীপার দুঃখ খানিকটা বুঝছে।

"মানুষের কত বিপদ আসে। থানায়, আদালতে, জেলখানায় মানুষ কীরকম অসহায় হয়ে পড়ে তা যদি দেখতেন," বলে ওঠেন আটত্রিশ বছরের দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

"নিশ্চয় নিজের দোষের ফল ভোগ করে। ভাল লোকেরা তো আর থানায় যাচ্ছে না।" মালবিকা এবং মণিদীপা একসঙ্গে বলে ওঠে।

দেবপ্রসাদ বললেন, "কত নিরপরাধ মানুষ এই পৃথিবীতে আইনের শাস্তিভোগ করছে তার কি হিসেব আছে ?"

"তোমরা তো একথা বলবেই ! না-হলে তো উকিল জাতটারই কোনো প্রয়োজন থাকে না।" মণিদীপা নিজের স্বামীকে কোণঠাসার চেষ্টা করে।



বন্ধুদের চারজন বিদায় নিয়েছে। মণিদীপা ও দেবপ্রসাদকেও খাবার দেওয়ার কথা ভাবছিল মালবিকা। এমন সময় বেডরুমের টেলিফোন বেজে উঠলো।

রাগে ফুঁসছে মালবিকা। একবার ইচ্ছে হচ্ছে টেলিফোনটা ধরবেই না। কিন্তু হাজার হোক আজ ১৫ই ডিসেম্বর ! নিশ্চয় মনোময় কোনো ছুতো তুলবে। বলবে, ভীষণ জরুরী কাজে রিষড়ায় ছুটতে হয়েছিল। এ-বি-সি ড্রাগস-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক জগদীশ্বর আচার্যও সারাজীবনে অতোবার রিষড়ায় যান নি, যা মনোময় এই ক'মাসে গিয়েছে।

"হ্যালো, হ্যালো।"

না, মনোময়ের গলা নয়। অচেনা এক পুরুষকণ্ঠ মিসেস মজুমদারকে চাইছে।

"হ্যালো, মিসেস মজুমদার, আপনি শুনেছেন ?"

"কী শুনেছি ?" মালবিকা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"আপনার স্বামী, আপনার স্বামীর কীর্তি। হ্যালো এখনো শোনেন নি ?...তাহলে শুনবেন থানা থেকে।"

মালবিকার শরীরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার আগেই লোকটা লাইন ছেড়ে দিলো।

বেডরুম থেকে যে-মানুষটা বেরিয়ে এলো সে যেন মালবিকা নয়। মণিদীপা প্রশ্ন করলো, "কী হলো তোর ? মুখ চোখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো কেন ?"

মালবিকা কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। টেলিফোনে যা শুনেছে তা ওদের দু'জনের কাছে চেপে রাখতে পারলো না।

"দূর ! হয়তো ফলস্ কল। কিছু কিছু মিথ্যেবাদী পুরুষমানুষ আজকাল টেলিফোনে যা দুষ্টুমি করছে ! যাকে যা খুশি তাই বলছে।" মণিদীপা ভরসা দিচ্ছে বান্ধবীকে।

"কিন্তু...থানাটানা কীসব বললো।" মালবিকার গলা কেঁপে উঠলো।

দেবপ্রসাদ জানতে চাইলেন, "কোন থানা ?"

"তা তো কিছু বলে নি।"

"চিন্তা করবেন না, আমি তো রয়েছি," দেবপ্রসাদের কথাগুলো ভরসা দিচ্ছে মালবিকাকে।

সামনেই অতিথিরা বসে আছেন, তবু টেবিলে মাথা রেখে অজানা আশঙ্কায় এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে রইলো মালবিকা।

"হ্যাঁগো, তুমি একটু খোঁজখবর করো না, চুপ করে বসে আছো কেন ?" কাতরভাবে অনুরোধ করলো মণিদীপা।

"অ্যাক্সিডেন্টের কথা কিছু বলে নি তো ?" জানতে চাইলেন দেবপ্রসাদ।

"এদেশের থানা কাছারির সবটাই তো অ্যাক্সিডেন্ট।" মণিদীপা এবার বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

"আমি অত্যন্ত লজ্জিত, মিস্টার রায়চৌধুরী। এমন বিপদে কখনও পড়ি নি। নেমন্তন্ন করে বাড়িতে ডেকে এনে আপনাদের কি হাঙ্গামায়..."

কথা শেষ করতে পারলো না মালবিকা। ওর গলায় কান্না এসে যাচ্ছে।

"মিস্টার মজুমদারের অফিসের নম্বরটা দিন।" নম্বরটা নিয়ে মালবিকার বেডরুমে চলে গেলেন দেবপ্রসাদ।

অনেকক্ষণ ফোন বাজার পরে অফিসের কোনো সুইপার রিসিভারটা তুললো। অফিসে কি একটা গোলমাল ছিল বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তার বেশী কিছুই বলতে পারলো না লোকটা।

"চিন্তা করবেন না। কলকাতায় ক'টা আর থানা আছে? নিশ্চয় মিস্টার মজুমদারকে কারও সম্বন্ধে থানায় অভিযোগ করতে যেতে হয়েছে।" মালবিকাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন দেবপ্রসাদ।

পকেট থেকে ডায়েরি বের করে ফেললেন দেবপ্রসাদ। ওখানে সমস্ত থানার নম্বরগুলো লেখা আছে। একটা দুটো জায়গায় ফোনের পরেই খবর পাওয়া গেলো।

"হ্যালো, মিস্টার কর্মকার, আমি দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী অ্যাডভোকেট কথা বলছি, মিস্টার শিকদার কোথায়?"

"উনি আজ খুব ব্যস্ত স্যার।"

"আমি খোঁজ করছিলাম, ওয়ান মিস্টার মনোময় মজুমদার..."

"আর বলতে হবে না, বুঝে গিয়েছি। ওই ব্যাপারেই তো শিকদার সায়েব হিমসিম খাচ্ছেন। মেয়েমানুষঘটিত মামলা।"

"অ্যাঁ। কী বলছেন, মিস্টার কর্মকার?" দেবপ্রসাদ নিজের বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না।

"যা বলছি, ঠিকই বলছি স্যার! কোট প্যান্ট টাই পরে ইমপিরিয়াল স্টাইলে অফিসে আসে বলে মেয়েমানুষের প্রতি দুর্বলতা থাকতে পারে না?...মেয়েমানুষটিই তো এখন বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলছে।" কর্মকার প্রাণ খুলে হাসছে।

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার পরে দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী মালবিকার বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর নিজের স্ত্রীকে আড়ালে ডাকলেন। "মনোময় কোনো পথ দুর্ঘটনায় পড়ে নি। কিন্তু ব্যাপারটা বড় এমব্যারাসিং। মেয়ে সংক্রান্ত কিছু ব্যাপার। মিসেস মজুমদারকে এই

অবস্থায় কতটা কী বলা উচিত তা বুঝতে পারছি না।"

কানে আঙুল দিলো মণিদীপা। "ছি ছি, কী বলছো তুমি? কোনো একটা মেয়ে এখনও থানায় বসে আছে, বিশাখা বিশ্বাস না কি নাম! না, ভালভাবে না জেনে, এসব কথা আমাদের মুখ দিয়ে বেরুনো ঠিক নয়। তুমি বরং একবার থানা থেকে ঘুরেই এসো।" মণিদীপা স্বামীকে অনুরোধ করলো।

মণিদীপা দেখলো, মালবিকা এখনও তার মর্যাদাবোধ হারায় নি। সে বলছে, "কী বিপদেই ফেললাম আপনাদের।"

"ও একবার বরং থানাটা ঘুরে খোঁজখবর করে আসুক।" মণিদীপা এই সময়ে বান্ধবীকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে না।

"আপনি কিছু খেয়ে যান," দেবপ্রসাদকে অনুরোধ করলো, মালবিকা।

"খাওয়া তো একদিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না," বললো দেবপ্রসাদ।

মালবিকা জানতে চাইছে, সেও দেবপ্রসাদের সঙ্গে থানায় যাবে কি না।

বেচারা! এখনও কেমন ইনোসেন্ট রয়েছে। জানে না কীসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে মনোময়। খুব দুঃখ হচ্ছে মণিদীপার। বান্ধবীকে সে বললো, "যার যা কাজ তাই করতে দে। আমাদের হাতের গোড়ায় ফোন তো রইলো।"

মালবিকা তখনও ভাবছিল পুলিসের হাঙ্গামাটা অফিসের অন্য কাউকে নিয়ে। বোধহয় অফিসের কাজেই মনোময়কে থানায় যেতে হয়েছে। মণিদীপা অনেকটা বুঝেও চুপ করে আছে। তার স্বামী কত লোকের জন্য থানায় যাতায়াত করেন, কখনও তার চিন্তা হয় না। আজ এই প্রথম ভীষণ ভাবনা হচ্ছে মণিদীপার। আনন্দ করতে এসে সত্যি বেশ হাঙ্গামায় পড়া গেলো।

ফোন আসছে না। সময় যেন কাটতে চাইছে না। মুখ গুম করে বসে আছে মালবিকা।

মণিদীপা নিজেই এ-বাড়ির গৃহিণীর ভূমিকা নিয়েছে। বান্ধবীকে বলছে, "কিছু খেয়ে নে মালবিকা। উকিলের ব্যাপার—ওরা কত দেরি করবে কিছুই ঠিক নেই।"

মালবিকার খেতে ইচ্ছে করছে না। দুশ্চিন্তা থাকলে খাবার ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া বেচারা মনোময় জন্মদিনের ডিনার একলা খাবে তা কেমন করে হয়?

আবও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে বাইরে থেকে আবার ফোন এলো।

"মিসেস মজুমদার, আমি দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী কথা বলছি। থানায় আমি কথাবার্তা চালাচ্ছি। মিস্টার মজুমদারের সঙ্গেও দেখা করেছি আমি। শুনুন, মিসেস মজুমদার, অভিযোগটা আপনার স্বামীর বিরুদ্ধেই।"

একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এলো মালবিকার মুখ দিয়ে। "আজ ওর জন্মদিন। আজ ওকে ফিরে আসতে বলুন—কাল সকালে আবার যা হয় করবে।"

"মিসেস মজুমদার, ফিরে আসাটা মিস্টার মজুমদারের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে না। সেটা থানার ব্যাপার।"

"ওরা নিশ্চয় জানে না, মনোময় হেঁজিপেঁজি লোক নয়—সে একজন সিনিয়র একজিকিউটিভ। সরকারের আই-ডি-বি-আই এবং জি-আই-সি ওকে এ-বি-সি ড্রাগস্-এর কর্মকর্তা করে বোম্বে থেকে পাঠিয়েছেন। মালবিকা এবার একজন শিক্ষিতা সহধর্মিণীর মতো চটপট কথা বলছে।

"পুলিস সব জানে—অফিস থেকেই মিস্টার মজুমদারকে এখানে নিয়ে এসেছে ওরা। ওই বড় পদে থাকাটাই বোধহয় ওঁর বিরুদ্ধে গিয়েছে।" দেবপ্রসাদ যতখানি পারেন নরমভাবে মালবিকাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

"কেন? কেন?" এবার পুলিসের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে মালবিকার।

শান্তভাবে দেবপ্রসাদ বললেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে এ-দেশে প্রায়ই তা হয়,

মিসেস মজুমদার। কেউ যদি জীবনে সফল হন, কাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহলে তাঁর কতকগুলো বাড়তি বিপদও এসে যায়। স্বজাতির সাফল্য বাঙালীদের মধ্যে অকারণ হিংসার উদ্রেক করে।"

এরপর দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী টেলিফোনে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।

"মণিদীপা? শোনো। এখানকার পরিস্থিতি একটু ঘোরালো মনে হচ্ছে। মিস্টার মজুমদার...তুমি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলো। ওরা এখন কি অভিযোগ আনবে মনস্থির করে নি।...তুমি দেখো মিসেস মজুমদার যেন এখনই খুব বিচলিত হয়ে না পড়েন।"

মালবিকা বললো, "মণিদীপা, আমি বরং থানায় চলে যাই। জীবনে আমি কোনোদিন থানার ভিতরে ঢুকিনি।"

মালবিকার হাতটা ধরলো মণিদীপা। "তোকে এখন একটু শক্ত হতে হবে মালবিকা। তুই থানায় গেলে ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে যেতে পারে।"

"কেন? মনোময় আর আমি তো ষড়যন্ত্র পাকিয়ে লোক খুন করি নি", মালবিকা ক্রমশ তার স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা হারিয়ে ফেলছে। ওর মুখে চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠছে।

বান্ধবীর গায়ে হাত রাখলো মণিদীপা। "ব্যাপারটা যে এমন হতে পারে তা আমি ভাবতেই পারছি না। তুই আমার দোষ নিস না, মালবিকা। উনি বলছিলেন, তোর পক্ষে খুব কষ্টকর একটা হাঙ্গামায় মনোময় জড়িয়ে পড়েছে..."

"কী হলো? বল্ না। চুপ করে আছিস কেন?" মালবিকার অন্ধকার মুখে দারুণ উদ্বেগের ছায়া।

"মনোময় জড়িয়ে পড়েছে মেয়েমানুষ সংক্রান্ত ব্যাপারে—মেয়েটা বোধহয় এখনও থানায় বড়বাবুর সামনে বসে আছে," ভীষণ কষ্ট হলো বলতে মণিদীপার।

একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো মালবিকার মুখ দিয়ে। তারপর কপালটা দু'হাতে টিপে মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে চেয়ারে

পাথরের মতো বসে রইলো।

কারুর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে মনোময়? কোনো মেয়ের সর্বনাশ করছে মনোময়? আরও কত প্রশ্ন মালবিকার মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু মুখ ফুটে মণিদীপাকে জিজ্ঞেস করতে শালীনতায় বাধছে মালবিকার।

ওর গায়ে হাত বুলিয়ে মণিদীপা বললো, "থানার এস-আই মিস্টার শিকদার নিজে এখন ওকে কী সব জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। মেয়েটা...সাতাশ-আটাশ বছরের মেয়ে...ব্লাউজের বোতাম-টোতাম খোলা অবস্থায়..."

"কী হলো? থামলি কেন?" মালবিকার স্বর এবার কঠিন হয়ে আসছে। প্রথম উদ্বেগের ধাক্কা সে বোধহয় কাটিয়ে উঠেছে।

"মেয়েটা নাকি ভীষণ কাঁদছে।" একটু থামলো মণিদীপা। মেয়েদের কান্নাকাটির রিপোর্ট শুনলেই আমার ভীষণ চিন্তা হয়। আমি ওঁর কাছে শুনেছি, মেয়েদের কান্না আজকাল থানায় ভীষণ সহানুভূতি পায়।"

"মনোময় এখন কী করছে?" প্রশ্নটা বুকের মধ্যে আর চেপে রাখতে পারলো না মালবিকা। "ওঁর কোমরে দড়ি পরিয়েছে?"

উনি বললেন, "মনোময় একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। ফরচুনেটলি ও খুব ভেঙে পড়ে নি।"

"না আমি ভাবতে পারছি না...এ কী হলো আমার?" কান্না চেপে রাখতে পারলো না মালবিকা। গত পনেরো বছরে তিল তিল করে গড়া স্বপ্নসৌধ এক মুহূর্তে ধুলিসাৎ হতে চলেছে।

দেবপ্রসাদ তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন, "পুলিস আদৌ গ্রেপ্তার করবে কি না; করলেও ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারায়, কোন সাবসেকশনে করবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।"

"আইন তো একটাই," মণিদীপা প্রশ্ন করেছিল।

"লাউগাছের মতো একই আইনের অনেক শাখা-প্রশাখা থাকে। মেয়েদের ইজ্জত, মেয়েদের দৈহিক নিরাপত্তার জন্যে ফৌজদারী আইনে অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। কেউ রেপের চার্জে পড়লে যাবজ্জীবন জেল হতে পারে।" শুনে শিউরে উঠেছিল মণিদীপা।

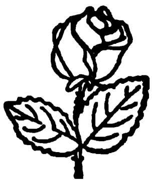
মালবিকা আবার মুখ তুলছে। "তুই কি বললি ? মেয়েটার ব্লাউজটা খোলা ? না ছেঁড়া ?"

"আমি গুলিয়ে ফেলছি, মালবিকা। হুড়মুড় করে ও কী যেন বললো। আমি তো আইনের তেমন কিছু জানি না। তবে যতটুকু কানে যায়, তাতে খোলা এবং ছেঁড়ার মধ্যে অনেক তফাত হতে পারে।"

মুখটা জ্বালা করছে মালবিকার। "আমার মনে হচ্ছে কে যেন আমার মুখে অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়েছে। আমার কপালটা জ্বলে গেলো, মণিদীপা !" টেবিলের ওপর কপাল ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো মালবিকা।

না, এই অবস্থায় জামিনের কথা, মামলার কথা তোলা মণিদীপার পক্ষে উচিত হবে না। মনো হলো মেয়েটি মনোময়ের অফিসেরই কোনো কর্মী। কিন্তু সে সব খুঁটিনাটি কথা তুলে মালবিকার দুশ্চিন্তার বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী। ভাগ্যক্রমে দেবপ্রসাদ ওখানে গিয়েছে, যা করবার নিশ্চয় সে করবে।

কারুরই খাওয়া হলো না। নাম কা ওয়াস্তে মণিদীপা একটা মাছ ভাজা তুলে নিলো। মালবিকাকেও কিছু মুখে দিতে অনুরোধ করেছিল মণিদীপা। কিন্তু মালবিকা পারে নি ; এখন খেলে হয়তো বমি হয়ে যাবে।



রাত গভীর হওয়ার আগেই মণিদীপা বিদায় নিয়েছে। এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এ-বাড়িতে একলা চুপচাপ জেগে বসে আছে মালবিকা।

মনোময় তো মাঝে মাঝে ট্যুরে যায়, একলা থাকার অভ্যাস যে মালবিকার নেই এমন নয়—কিন্তু আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

একটা জ্বলুনি মালবিকার দেহের নানা প্রান্তে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেবপ্রসাদের কাছে আরও কিছু খবরাখবর একটু আগে

টেলিফোনে পাওয়া গিয়েছে।

আই পি সি—ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ১৮৬০ সালের পাঁচ নম্বর আইন—খবরের কাগজে দেখে থাকবেন বোধহয়, ওরা লেখে ভারতীয় দণ্ডবিধি। ৫১১টা ধারা আছে ওই আইনের" দেবপ্রসাদ দু'এক কথায় মালবিকাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

দেবপ্রসাদ বলেছেন, "মিসেস মজুমদার, ব্যাপারটা এখনও পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না, ওরা যেভাবে মামলা সাজাচ্ছে।" ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৫৪, ৫০৬, আরও কতকগুলো নম্বর হুড়মুড় করে কানের মধ্যে ঢুকেছিল যার কোনো অর্থ মালবিকা ধরতে পারে নি।

"ওরা মানে কারা?" জানতে চেয়েছিল মালবিকা।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করেছিলেন দেবপ্রসাদ। সাধারণ মক্কেল হলে সব কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়; কিন্তু আত্মীয় বা বন্ধু যখন মামলায় জড়িয়ে পড়েন তখন উকিলের অসুবিধা খুব বেড়ে যায়। স্ত্রীর বান্ধবীকে এই পরিস্থিতিতে থানা-পুলিসের অপ্রিয় কথা কতটুকু বলা চলে?

তবু দেবপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "বুঝতেই পারছেন, মিসেস মজুমদার। অফিসের একটি মেয়ে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।"

"অফিসের মেয়ে!" অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো মালবিকা।

"আজ রাত্রে সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হবে বলে মনে হয় না, মিসেস মজুমদার। ইতিমধ্যে থানায় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।"

রাত আরও বেড়েছে। এগারতলায় ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে বসে মালবিকা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তারাগুলো আজ যেন মালবিকার অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। খাওয়া-দাওয়া হয় নি। টেবিলটা একেবারে অগোছালো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

একসঙ্গে অনেকগুলো থানার লক-আপ মালবিকার চোখের সামনে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ভেসে উঠছে।

সিনেমাতে থানা এবং পুলিসের দৃশ্য কয়েকবার দেখেছে মালবিকা। মালবিকা শুনেছে, থানায় ওরা মারধোর করে। ভেবেছিল একবার এ-

বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে দেবপ্রসাদবাবুকে, কিন্তু সাহস হল না। মনোময়কে কেউ মারছে...না, ভাবতে পারছে না মালবিকা।

ঘড়ির কাঁটা যখন রাত দুটোর ঘর পেরিয়ে গিয়েছে তখন ফ্ল্যাটের বাইরের বৈদ্যুতিক বেলটা বেজে উঠলো। অন্য যে-কোনো সময় হলে ধড়মড়িয়ে ছুটে যেতো মালবিকা। কিন্তু আওয়াজ শুনেও দেহটা এখন আর নড়তে চাইছে না।

দরজার ফুটো দিয়ে মনোময়ের মুখটা দেখে নিয়েছে মালবিকা। তারপর কোনোরকমে সে গোডরেজ লকটা খুললো। এই ক'ঘণ্টায় মনোময়ের মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছে। যে-মনোময় গটগট করে সায়েবী কায়দায় এই দরজা দিয়ে সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল সে এখন পায়ে হেঁটে এগোতে পারছে না।

কী প্রত্যাশা করছে মনোময়? সে কী আশা করছে, মালবিকা কাঁদ-কাঁদ হয়ে জিজ্ঞেস করবে, কী হয়েছে বলো? বলবে, "তুমি যে আজ বাড়ি ফিরে এসেছো তার জন্য ঠাকুরের পুজো দেবো!"

মালবিকা কোনো কথা না-বলে রুদ্ধরোষে বেডরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; আর মনোময় ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অসহায়ভাবে পিছন পিছন ছুটে আসছে।

যে-মনোময় অ্যাটাচি কেস হাতে আজ ভোরবেলায় বাড়ি থেকে টগবগিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবাড়ির একচ্ছত্র অধীশ্বর সেই লোকটি এতো রাত্রে ফিরে আসে নি। ফিরে এসেছে নারীঘটিত মামলার এক কদর্য আসামী!

শেষ পর্যন্ত কীসের চার্জ হলো? বলাৎকার, না শ্লীলতাহানি? দেবপ্রসাদবাবুর বলে যাওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির নম্বরগুলো ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৫৪, ৫০৬ মালবিকার মনের মধ্যে নিওন আলোর বিজ্ঞাপনের মতো জ্বলে উঠতে লাগলো।

মনোময় সোজা বেডরুমের বাথরুমে চলে গিয়েছে। মুখে চোখে জল না-দিয়ে সে আর থাকতে পারছে না।

শাওয়ারে জল পড়বার শব্দ শুনতে পাচ্ছে মালবিকা। আর বেডরুমে বসে অসহ্য রাগে, অপমানে ও অভিমানে মালবিকার মুখ ও কান তপ্ত হয়ে উঠছে।

একবার ইচ্ছে হচ্ছে এই রাত্রেই এই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায় সে! বাবা থাকলে নিশ্চয় মালবিকা এতোক্ষণে সেখানে চলে যেতো। এখনও যেতে পারে, কিন্তু বাড়িটারও চাবি তার হাতে নেই।

মালবিকা এবার বিছানার দিকে তাকালো। দু'খানা সিংগল্ খাট যে জোড়া লাগিয়ে এখানে রয়েছে তা এতোদিন মনেই ছিল না। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেলো মালবিকার। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সে খাটদুটোকে আলাদা করবার জন্যে।

দুটো খাটের মধ্যে আড়াই ফুটের ব্যবধান রচিত হয়ে গেলো কয়েক মুহূর্তে। গোলমাল বাধালো কেবল ওই ডবলসাইজ রঙিন চাদরখানা। আলমারি থেকে একটা সাদা সিংগল বেডশিট বের করে দেওয়ালের দিকে খাটে দ্রুত তা পেতে ফেললো মালবিকা। আর ডবল শিটখানা বেঢপ আকারে কোনোক্রমে অন্য খাটে জড়ানো রইলো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে মনোময় দেখলো দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে পাথরের মতো বসে রয়েছে মালবিকা।

কী করে কেমন করে কীভাবে কথা শুরু করা যায় তা ভেবেই পাচ্ছে না মনোময়।

"ওরা আজকের মতো আমাকে ছেড়ে দিলো।" এ যেন অন্য কোনো মনোময় কথা বলছে।

ও-দিক থেকে কোনো উত্তর নেই। মালবিকার কানে কথাগুলো ঢুকলো কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

"দেবপ্রসাদবাবু খুবই সাহায্য করেছেন। উনি না-থাকলে আজ হয়তো ফেরাই হতো না।"

মনোময় যেন দেওয়ালের সঙ্গেই কথা বলছে—অন্য দিক থেকে কোনো উত্তর নেই।

মনোময় বলছে, "দেবপ্রসাদবাবু থানার লোকদের বললেন, এই

লোকটার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা আপনারা ভুলে যাবেন না। এ বি কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ড্রাগসের চীফ এগজিকিউটিভ—যে কোম্পানি এখন গর্ভমেন্টই চালাচ্ছেন একরকম।"

এখনও কোনো উত্তর নেই। ঘরে অন্য কোনো প্রাণী আছে বলে মনে হচ্ছে না।

মনোময় যেন এক থানা থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর এক থানায় সন্দেহজনক আসামী হিসেবে হাজির হয়েছে। এখানেও অনেকক্ষণ ধরে অশালীন জিজ্ঞাসাবাদ ও অকথ্য নির্যাতন চলবে।

"থানা পুলিসের যা ব্যাপার। কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে ওখানে আধঘণ্টা কাটানো শক্ত।" মনোময় সহজভাবেই বললো। কিন্তু অপরদিকের নীরবতা তাকে ব্যঙ্গ করছে। যেন বলছে, নিরপরাধ ভদ্রলোকদের কেউ থানায় টেনে নিয়ে যায় না।

আজ সকালেও এই সংসারে মনোময়ই ছিল সব—সবার ওপরে ছিল তার মানসম্মান। আর এই কয়েক ঘণ্টায় সব কিছু তছনছ হয়ে সে হঠাৎ ছোট হয়ে গিয়েছে।

উত্তর আসছে না। তবু বিরক্তি প্রকাশ না-করে, অভিমানের কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে মনোময় বলে চলেছে, "দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী খুব ভাল উকিল। উনি পুলিস অফিসার মিস্টার শিকদারকে সোজাসুজি বললেন, 'মডেস্টী আউটরেজ' করেছে বলে চিৎকার করলেই শালীনতাহানি প্রমাণিত হয় না, মিস্টার শিকদার। আপনি তো অনেকদিন থানায় কাজ করেছেন, অভিজ্ঞতাও অনেক। আপনি জানেন শ্লীলতাহানির অভিযোগের পিছনে অনেক রকম ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। আপনি কি হিন্দুস্থান প্রেসাস মেটালস্-এর মিস্টার চতুর্বেদীর কেসটা ভুলে গেলেন? ওখানেও তো অফিসের মক্ষিরাণী সুজাতা সাহা ব্লাউজ ছেঁড়া অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন, লিখিত কমপ্লেন করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদালতে কী হলো?"

মনোময় একতরফা বলে চললো, "চমৎকার কথাবার্তা বলেছেন, মিস্টার রায়চৌধুরী। থানায় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী

করবো। সেই সময় মিস্টার রায়চৌধুরী হৈ-হৈ করে উপস্থিত হলেন। আমার সঙ্গে দেখা করে নিচু গলায় বললেন, তুমিই ওঁকে পাঠিয়েছো।”

এরপর যদি সামান্য একটু সাড়া আসতো মালবিকার দিক থেকে তা হলে মনোময় হয়তো তার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতো, বলতো, “চরম সংকটের সময় তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছো—তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।”

কিন্তু কোনো উত্তর নেই। মনোময় এখন বলতে চায়, কেবল এই রাত্রির জন্যে মিস্টার রায়চৌধুরীর চেষ্টায় সে থানা থেকে চলে এসেছে। সকাল আটটায় আবার যেতে হবে তাকে, তখনই হয়তো থানার লোকেরা অভিযোগ সম্বন্ধে মনস্থির করবে।

“মিস্টার রায়চৌধুরী সোজাসুজি বলেছেন, মিস্টার শিকদার,আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে আপনার কোনো কেস নেই।”

মনোময় অসহায়ভাবে একটু একটু করে অন্য এক আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ওদিক থেকে অবশেষে উত্তর এলো। চাপা আর্তনাদ মেশানো মালবিকার কণ্ঠস্বর বিজন শয়নমন্দিরে নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করলো। “কেন ওরা তোমাকে থানায় নিয়ে গেলো ?”

মনোময় বুঝলো, তার সহধর্মিণী মালবিকা এই গভীর রাত্রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কী উত্তর দেবে মনোময় ? বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, ম্যানেজমেণ্ট বিশেষজ্ঞ মনোময় মজুমদার একটা সামান্য প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

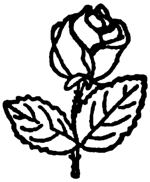
কয়েকটা বিশ্বাসযোগ্য শব্দের জন্য মনোময় তার মস্তিষ্কের গভীরে অসহায়ভাবে হাতড়ে মরছে ; আর মালবিকার ওই প্রশ্নটা যেন বেরোবার পথ খুঁজে না পেয়ে, রুদ্ধ দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে দ্বিগুণ শব্দে মনোময়কে বারবার আক্রমণ করছে, “কেন ওরা তোমাকে থানায় নিয়ে গেলো ?” “কেন ওরা তোমাকে থানায় নিয়ে গেলো ?”

প্রশ্নটা প্রবল ঝড়ের আকার ধারণ করে মনোময়কে বিপর্যস্ত করবার

জন্যে মত্ত পশুর মতো তেড়ে আসছে।

অসহায় এবং বিপর্যস্ত মনোময় আত্মসমর্পণের জন্য এবার হয়তো মালবিকার খুব কাছে সরে যেতো।

কিন্তু পরিচিত বেডের একপ্রান্ত থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে অন্য প্রান্তের মালবিকার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে মনোময় হঠাৎ বুঝতে পারল এই শয়নমন্দিরের নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। ঘরের খাটখানা চৌচির হয়ে দু'খানা হয়ে গিয়েছে—দু'টুকরো খাটের মধ্যে এখন দূরত্ব অনেক, অন্য খাটের অপরপ্রান্তে বসে-থাকা মালবিকা এতো কাছে থেকেও অনেক দূরে সরে গিয়েছে। নদীর এপারে দাঁড়িয়ে মনোময় ওপারের মালবিকাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।



মালবিকার বাবা বলতেন, কুসংবাদ দ্রুত ধায়। কথাটার অর্থ তখন বুঝতে পারে নি মালবিকা, এবার হাতে হাতে প্রমাণ পাচ্ছে। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই সকালে মনোময় থানায় বেড়িয়ে গিয়েছে। ভোরবেলায় মনোময়ের বহুদিনের অভ্যাসের কথা স্মরণ করেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে মালবিকা অনেক আগে বিছানা ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়ে বসেছিল।

প্রতি বছর নিজের জন্মদিনে স্ত্রীকে সামান্য কিছু উপহার দিয়েছে মনোময়। এবার সে ভুলে গেছে, ভেবেছিল মালবিকা। তাছাড়া যে খবর নিয়ে সে এ-বাড়িতে গভীর রাতে ফিরে এসেছে তাতে উপহারের কথাই ওঠে না।

কিন্তু আজ সকালে থানায় যাবার সময় মনোময় বললো, "তোমার জন্যে একখানা বই কিনেছিলাম। আনা হলো না। পুলিসের লোকেরা

আমার অফিস সার্চ করে সে-খানা নিয়ে গেলো।"

কোন বই, কেন নিয়ে গেলো, এসব প্রশ্ন তুললো না মালবিকা। *অন্য সময় হলে মনোময়ের দম্ভে লেগে যেতো—কিন্তু এখন সে গভীর* শান্ত হয়ে গিয়েছে। বেশ নরমভাবেই সে বললো, "তুমি যে বইটার কথা বলেছিলে—'বডি বিউটিফুল'-এর লেটেস্ট সংস্করণ। দুশো পঁচাত্তর টাকা দাম।"

এসব কথা স্পর্শ করছে না মালবিকাকে। মানসম্মানহীন পুরুষের প্রতি মালবিকার কোনো দুর্বলতা নেই।

'বডি বিউটিফুল, বডি বিউটিফুল—কেমন করে দেহসৌন্দর্য রক্ষা করতে হয় তার বই—কথাটা এই ভোরবেলায় মালবিকাকে ব্যঙ্গ করছে। ফিস ফিস করে মনে করিয়ে দিচ্ছে, অন্য এক মেয়ের শালীনতাহানির অভিযোগে আপনার স্বামীকেই থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মালবিকার মনে পড়ছে, আজও ফিগার সেণ্টারে যাবার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে কী লাভ?

মিসেস চাওলাকে ফোন করে দিলো মালবিকা।

মিসেস চাওলা সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "শরীরেরও মান-অভিমান আছে, মিসেস মজুমদার। কখনও আদর, কখনও অবহেলায় দেহের ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়, পরে শত চেষ্টা করলেও ভাল ফল পাওয়া যায় না।"

"আজ আমার মুড নেই, মিসেস চাওলা" এর বেশী এখনই কাউকে কিছু জানাতে চায় না মালবিকা।

মিসেস চাওলা দরাজ গলায় বললেন, "মিসেস মজুমদার, আপনি ভাগ্যবতী মহিলা—আপনার শরীরের ফ্রেমটি এখনও চমৎকার। একটু চেষ্টাতেই এমন এক সুশাসিত দেহের অধিশ্বরী হবেন আপনি যে প্রত্যেকটি মেয়ে আপনাকে হিংসে করবে। অ্যাণ্ড..."

"থামলেন কেন, বলুন" মালবিকা টেলিফোনে কথা বলে একটু শান্তি চায়।

"যদি কিছু মনে না করেন মিসেস মজুমদার, বিবাহিত মহিলারা এই কলকাতা শহরে বেশ কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। এখানে পুরুষদের নানা প্রলোভন। ফিগার সম্বন্ধে যারা উদাসীন নয় একমাত্র তারাই স্বামীদের সম্পূর্ণ ভালবাসা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে।"

"আমার মন ভাল নয়, মিসেস চাওলা" এ বার অসহায়ভাবে স্বীকার করে মালবিকা।

"কাম অন, মিসেস মজুমদার। আপনি অতি বিনয়ী মহিলা ; শিক্ষার দম্ভ, শরীরের দম্ভ, স্বামীর দম্ভ কিছুই নেই আপনার। আপনি কোন দুঃখে অসুখী হতে যাবেন ? এই যে ফিগার কোর্সটা আপনি নিচ্ছেন, এর শেষে আপনি হবেন আপনার স্বামীর মহামূল্যবান সম্পদ—মোস্ট প্রাইসলেস পজেসন। আপনি এখনই চলে আসুন, আপনার মনও আমি ভাল করে দেবো।" মিসেস চাওলার কথাবার্তায় বোঝা যায় তাঁর আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।

টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে মালবিকা। মিসেস চাওলা বুঝতে পারছেন না, কী ভীষণ খারাপ সময় এসেছে মালবিকার।

মিসেস চাওলার অবশ্য এক কথা, যে বিপদই আসুক, মেয়েদের উচিত শরীরটা সব সময় শো-রুম কন্ডিশনে রাখা।

এই 'শো-রুম কন্ডিশন' কথাটায় ফিগার সেন্টারের কয়েকজন মধ্যবয়সিনী মহিলা হাসাহাসি করেছিলেন, "আমরা কেউ ডল-পুতুল হয়ে আবার শোরুমে দাঁড়াতে যাচ্ছি না" তাঁরা বলেছিলেন মিসেস চাওলাকে।

মিসেস শকুন্তলা চাওলা দমবার পাত্রী নন। বলেছিলেন, "দাঁড়াতে হবে এমন কোনো দিব্যি নেই ; কিন্তু আপনারা কেন ডল-পুতুলের মতো ফিগারের মালিক হবেন না ? ফ্রান্সে বলে, নারী হচ্ছে নিখুঁত সনেটের মতো—শরীরের কোথাও সামান্য ছন্দপতন থাকলেই কবিতার সর্বনাশ হয়ে যায়।"

মালবিকা একবার ভাবছে, জীবনটা স্বাভাবিকভাবেই চালানো উচিত। আবার মনে হচ্ছে, জীবন তো আর স্বাভাবিক নেই। অঘটনের মেঘটা ক্রমে-ক্রমে তার অসহায় অস্তিত্বের কতটা গ্রাস করে নেবে কে জানে ?

এদিকে এ-বি কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ড্রাগসের সদর দপ্তরে সকাল থেকেই প্রবল উত্তেজনা।

টেলিফোন বোর্ডে লোক নেই। বিশাখা বিশ্বাস এখনও কাজে আসে নি। বিশাখা বিশ্বাসের যে কামাই করার অভ্যাস নেই এমন নয়। কিন্তু আজ যে বিশাখা বিশ্বাস না আসতে পারে তা অফিসের সর্বশ্রেণীর কর্মচারী বুঝতে পারছে।

সেলস্ ম্যানেজার নবারুণ ব্যানার্জি তাঁর ডাইরেক্ট লাইনে বাড়িতে ডায়াল করলেন। "হ্যালো, তনিমা, অফিসে তাজ্জব ব্যাপার। তুমি নিশ্চয় অন্য সূত্র থেকে খবর পাবে, তাই ভাবলুম আমিই প্রথমে জানিয়ে দিই।"

"তোমাদের কর্তার কীর্তির খবর আমি পেয়ে গিয়েছি।"

"এ্যাঁ ? এর মধ্যেই ?"

"অবশ্যই ! ভেবেছো কী ? ভাবছো তোমাদের ওপর আমরা নজর রাখি না ? শোনো, অফিসের মেয়েকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের মজুমদার রেপ করেছেন !"

"আঃ তনিমা ! নবারুণ বাধা দেন।

"ওই হলো। অসহায় মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেছেন। তার নাম যাই হোক—মেয়েদের কাছে রেপ।"

"শোনো তনিমা, ম্যাক্সিমাম বলা চলে অ্যাটেম্পড্ রেপ—রেপের চেষ্টা।"

"উঃ, তুমি আর ওকালতি কোরো না কোম্পানির কর্তার হয়ে ! রেপ আর রেপের চেষ্টার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই মেয়েদের কাছে। আহা

রে! কোন মেয়েটি গো?"

"বিশাখা বিশ্বাস। তুমি দেখো নি, তবে গলা শুনেছো, আমাদের ক্যাজুয়াল টেলিফোন অপারেটর।"

"ওমা! তোমাদের অপারেটর? গলাটা খুব সেক্সী।"

"আঃ! তনিমা!"

"তোমাদের ওই সাহেবকে থানা হাজতে নিয়ে গিয়ে চাবকাতে বলো! খুব তো বড় বড় কথা বলতেন—দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, চুরি বন্ধ করতে হবে, উৎপাদন এবং বিক্রি বাড়াতে হবে। প্রত্যেককে আদর্শ স্থাপন করতে হবে—এখন নিজে তো খুব চমৎকার আদর্শ স্থাপন করলেন।"

নবারুণ ব্যানার্জি টেলিফোন নামিয়ে দিচ্ছিলেন, এমন সময় গৃহিণী হ্যালো হ্যালো করে উঠলেন। 'হ্যালো, শোনো। মিসেস মালবিকা মজুমদারের সঙ্গে আমাদের মহিলা সমিতির একটা মিটিং ছিল। ওটা আমরা ক্যানসেল করছি!"

"কেন? কেন?" নবারুণ ব্যানার্জি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

"একজন রেপিস্টের ওয়াইফের সঙ্গে আমরা মেয়েদের ওয়েলফেয়ার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।"

"শোনো তনিমা। 'ক্যানসেল' কথাটা খুব খারাপ। তোমরা শুধু বলো আজ হচ্ছে না—অনিবার্য কারণবশত।"

"ফর আনঅ্যাভয়ডেবল রিজনস্?" ফোঁস করে উঠলো তনিমা।

"হ্যাঁ। চমৎকার ইংরিজী প্যাঁচ যা বাংলায় প্রায় এসে গিয়েছে—অনিবার্য কারণবশত।"

আর একখানা ডাইরেক্ট লাইনে ফিনান্স ম্যানেজার অমূল্য বসাক ফোন পেলেন তাঁর স্ত্রী শতরূপা বসাকের কাছ থেকে।

"হ্যালো, তুমি তো বেশ লোক! এখনও ব্যাপারটা চেপে বসে আছো।"

"হ্যালো তুমি কিসের কথা বলছো, রূপা?"

আর অভিনয় কোরো না। তোমাদের পুরুষজাতের ক্ষুরে নমস্কার। সমস্ত কলকাতায় ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে। আমি অনেক ফোন পেয়েছি। ব্যাপারটা কী হয়েছে বলো তো ? খবর চেপে রাখলে ভাল হবে না কিন্তু।"

"তুমি কী শুনেছো ? বলো না একটু রূপা," কাতর অনুরোধ করেন মিস্টার বসাক।

"উঃ, ধন্যি তোমরা পুরুষমানুষরা। শুনলাম তোমাদের মিস্টার মজুমদার অফিসের একটি মেয়েকে নিয়ে অফিস-টাইমে হোটেলে গিয়েছিলেন, ঘর বুক করেছিলেন। তারপর কিছু গোলমাল হয়েছে—এখন মেয়েটা রেপের চার্জ এনেছে।"

"রূপা, তোমরা ভীষণ বাড়িয়ে বলো। কাল যখন অফিস ছেড়েছি, তখনও কিছুই জানতাম না। আজ এখানে এসে শুনেছি, অফিস-টাইমের পর অফিসেই কী একটা গোলমাল হয়েছিল !"

"কী একটা নয় মশাই। পুরো একটা ! মিসেস ব্যানার্জি বলছিলেন, ব্লাউজ খোলা অবস্থায় অলমোস্ট উলঙ্গ মেয়েটি কেবল শায়া পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।"

"একদম বাজে কথা, রূপা ! সেরকম খবর আমরা শুনি নি। ওরকম হলে, পুলিস তখনই আসামীকে হাজতে নিয়ে যেতো। তা তো হয় নি, শুনছি রাত্রে মিস্টার মজুমদার বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন ! আজ সকালে আবার থানায় রিপোর্ট করেছেন।"

"পুলিসের কথা আর বোলো না। অতবড়ো অফিসার—কত জানাশোনা আছে সরকারের হাই লেভেলে। বড় বড় কর্তারা মধুকুঞ্জ বসালে এদেশে কেউ কিছু বলে না।"

"হ্যালো, এবার রাখি ?" স্ত্রীর অনুমতি চাইলেন মিস্টার অমূল্য বসাক।

"হ্যালো, এতো তড়িঘড়ি কেন ? আজ তো আর মজুমদারের শাসন নেই। শোনো, ওই মেয়েটা, বিশাখা বিশ্বাস, নাকি খুবই স্টাইলিস্ট, স্বাস্থ্যবতী এবং সুন্দরী।"

"আমার তো মনে হয় না রূপা।"

"আবার মিথ্যে কথা!" মিষ্টি বকুনি লাগালেন মিসেস বসাক। "এখন তো বলবেই, নিজের বিয়ে-করা বউ ছাড়া আর কোনো সুন্দরীই জীবনে দেখো নি তুমি!"

"আমি ভদ্রমহিলাকে মাত্র দু'বার দেখেছি। একটা সুন্দর ফ্রেমের চশমা পরেছিলেন এই যা।"

"হ্যালো, ওকে নাকি, তোমাদের মজুমদারই অফিসে চাকরি দিয়ে এনেছিলেন?" এবার জেরা শুরু করেছেন মিসেস বসাক।

"একদম বাজে কথা। মিস্টার সেনশর্মার আমল থেকেই ভদ্রমহিলা এখানে মাঝে-মাঝে কাজ করছেন।"

"এতো কথা জানলে কী করে তুমি? ওই বিশাখা বিশ্বাসের সঙ্গে তুমিও কি..."

"হ্যালো, হ্যালো...শোনো রূপা, আজ সকালেই আমি বিশাখা বিশ্বাসের ফাইলটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আনিয়ে পড়ে নিয়েছি।"

"তোমার এতো আগ্রহ কেন?" এবার বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছেন মিসেস বসাক।

"রূপা, শুধু শুধু তুমি রাগ করছো। এই ফাইল পুলিস চাইতে পারে—এই ফাইলের কাগজপত্র হঠাৎ উধাও হতে পারে। তাই আমি ওটা প্রথম সুযোগেই নিজের সেফামিরাতে পুরে রেখেছি।"

"তুমি ঠিক জানো, মিস্টার মজুমদার, ওই মেয়েমানুষটাকে আমদানী করেন নি?"

"জাস্ট এ মিনিট। এই তো দেখছি প্রথম অ্যাপ্লিকেশন—বিশাখার হাতের লেখাটি ভাল, তবে বানান ভুলে বোঝাই। যখন আমাদের অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করেছে তখন মজুমদার কলকাতায় আসেন নি। লেখাপড়া রেড-আপ-টু বি-এ।"

"তার মানে তো বি-এ পাশ করে নি।"

"ঠিক ধরেছো, রূপা। বয়স এখন সাতাশ—এই ক'মাস আগেকার কথা। হাইট ঃ পাঁচ ফুট চার।"

"ওমা। তোমরা কি মেয়েদের শরীরের মাপজোকও লিখে রাখো?"

"আমরা কিছুই চাই না রূপা, কিন্তু কেউ যদি চাকরির আবেদনপত্রে বাড়তি খবর দেয় আমরা কী করতে পারি।"

"বাজে কথা বোলো না। লোককে বলতে লজ্জা করছে যে তুমি এমন আফিসে কাজ করো যেখানে বড়কর্তা অফিসে বসে-বসে মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে..."

"শোনো রূপা, বিশাখার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন আমাদের এ-ও মিস্টার অনিলকুমার চট্টরাজ। জোর সুপারিশ করেছিলেন তিনি। তখনকার বড় সায়েব মিস্টার সেনশর্মা তার ওপরেই লিভ ভেকান্সিতে নিতে অর্ডার দিয়েছেন।"

"তুমি আমাকে এখনও মিথ্যে বলছো। সবাই জানে, মিস্টার মজুমদারই ওকে পছন্দ করে এনেছেন।"

"যা সত্যি নয়, তা আমি কী করে সত্যি বলি?"

"মিথ্যেকে সত্যি করাই তো এদেশের অ্যাকাউনটেন্টদের কাজ—ভাবছো আমি জানি না?" রসিকতা করলেন মিসেস বসাক। মিসেস বসাক আজ কিছুতেই ফোন ছাড়বেন না। "হ্যাঁগো, মেয়েটি কি মিসেস মজুমদারের তুলনায় খুবই মুচমুচে এবং সুন্দরী?"

"আঃ রূপা, আমি এখন অফিসে বসে কাজ করছি।"

"কত সব কাজ করো তা তো বোঝা গিয়েছে। সত্যি কথা বলো না, প্লিজ।" আদরিণী মিসেস বসাক কিছুতেই স্বামীকে ছাড়বেন না।

"আমার এই ফাইলে বিশাখা বিশ্বাসের ছবি আছে। কিন্তু ওই সব তুলনা আমার আসে না, রূপা।"

"ছবিটা নিয়ে আসবে আজ? আমাদের লেডিজ ক্লাবের মেম্বাররা দেখতে খুব অ্যাংসাস।"

"অ্যাংসাস নয়, রূপা। কথাটার মানে উদ্বিগ্ন। তোমরা ইনকুইজিটিভ—কৌতূহলী। কিন্তু মনে রেখো ওটা অফিস ফাইল। ওই ফাইল নিয়ে কতদূর জল গড়াবে তার ঠিক নেই। কারণ ফাইলটার শেষ কাগজখানা মিস্টার মজুমদার লিখেছিলেন নিজের হাতে। এ-ও মিস্টার

চট্টরাজকে নোট দিচ্ছেন, আমাদের টেলিফোন ম্যানেজমেণ্ট খুব খারাপ। বর্তমানে টেলিফোন অপারেটর আসলে টেলিফোন অপ্রেসর- অনেক অভিযোগ কানে আসছে। তারপর রয়েছে চট্টরাজের সই—সি-ই অর্থাৎ চীফ এগজিকিউটিভের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মজুমদার জানতে চেয়েছেন, ওখানে নতুন অপারেটরকে সুযোগ না দেবার যুক্তি কোথায় ?"

"ওমা !" মিসেস বসাক এখন সন্ধানী রিপোর্টারের মতো টেলিফোনে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর !"

"সব কথা তোমাদের জানা উচিত নয়, রূপা। এসব অফিসের গোপন কথা—জানো তো• অফিসে ঢুকবার সময় আমাকে লিখে দিতে হয়েছে, অফিসের সমস্ত গোপনীয়তা রক্ষা করবো।"

মিসেস বসাকও তৈরি হয়ে ছিলেন। "বউয়ের কাছেও কিছু লুকোবে না বলে খালি পেটে অগ্নিসাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলে।"

মিস্টার বসাক অবশেষে বললেন, "দিন কয়েক পরেই ফাইলটা আবার তাঁর কাছে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন মিস্টার মজুমদার।"

"উঃ। এ যে নাটকের মতো হচ্ছে ! ভয় দেখিয়ে ঐ বিশাখা বিশ্বাসের আত্মসমর্পণের চেষ্টা চলছিল বোধ হয়।"

"প্লিজ, রূপা, এখন লাইনটা ছেড়ে দাও। আজ টেলিফোন বোর্ড কাজ করছে না।"

"শোনো, মিসেস মজুমদারের সঙ্গে আমাদের লেডিজ ক্লাবের কফি মিটিং ছিল। আমরা কেউ ওর সঙ্গে মিট করতে রাজী নই। সবাই বলছে, অ্যাজ সেক্রেটারি অফ লেডিজ ক্লাব আমাকেই ফোন করতে।"

"তুমি আবার এসবে জড়িয়ে পড়বে কেন রূপা ? তোমাদের প্রেসিডেন্ট মিসেস চট্টরাজই এসব করুক না কেন ?"

"এখনই টেলিফোন আসবে মিসেস চট্টরাজের কাজ থেকে। যা হয় একটা কিছু বলো" মিসেস বসাকের কণ্ঠে ব্যস্ততার সুর।

"জয় মা বলে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দুটো ডিজিট ডায়াল করে রাখো। কারও বাপের সাধ্য নেই ফোনে তোমার নাগাল পায়। কফি

টাইম কেটে যাবার পরে ফোন আবার রিসিভারে রেখে দেবে। ইতিমধ্যে আমি মিস্টার চট্টরাজকে বলে দেবো, তুমি বহু চেষ্টা করেও মিসেস চট্টরাজকে পাও নি। তাই আমাকে খবর পাঠিয়েছো।"

এ-বি কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ড্রাগসের সর্বস্তরে আজ চাপা উত্তেজনা। পুরুষদের টয়লেটে অনেকক্ষণ ধরে বারগেনেব্‌ল স্টাফের মধ্যে প্রবল আলোচনা চলেছে।

এই বারগেনেব্‌ল কথাটায় অনেক তরুণ কর্মীর আপত্তি—আমরা কি আলু-পটল না গোরু-ভেড়া যে 'দরদস্তুর' মার্কা পাচ্ছি? অনেকদিন থেকে কথাটা চলে আসছে, সুতরাং উপায় নেই। এই অফিসে যা অনেকদিন ধরে চলে আসছে তার গায়ে কেউ হাত লাগাবে না।

মিস্টার মজুমদার এই আইন ভাঙতে শুরু করেছিলেন। ইউনিয়নের বাসুদেব নন্দীকে বলেছিলেন, "অনেকদিন ধরে জিনিসপত্রের অপচয় হয়ে আসছে; কিন্তু এখন তা সহ্য করা হবে না। তেমনি আপনারা অনেকে একই কাজ বহুদিন করে আসছেন; একঘেয়েমী ধরে গিয়েছে; আমি ডিউটির অদলবদল চাই, প্রত্যেকের কিছু পদোন্নতি হোক তাও আমার কাম্য।"

কাজে এসে অফিসের কর্মীরা দেখেছে আজ টেলিফোন বোর্ড বন্ধ। বিশাখা বিশ্বাস অফিসে আসে নি। চীফ এগজিকিউটিভ মনোময় মজুমদারও বেপাত্তা—অন্যদিন অফিস শুরু হবার এক ঘণ্টা আগেই তিনি কাজ শুরু করে দেন, অফিস ছাড়েনও সবার পর। আগে যখন ওভারটাইম ছিল তখন অনেকেই রাত্রে কাজ করতো, কিন্তু এখন ওভারটাইম একদম বন্ধ।

নগেনবাবু রসিকতা করে বলেন, "হাতের নোয়া যার বেচতে হবে তার আবার গোট পরার শখ। মাসের মাইনে যেখানে বন্ধ হবার দাখিল, সেখানে আবার ওভারটাইম!"

নগেনবাবু আজ চুপি চুপি তাঁর সহকর্মীদের বললেন, "ব্যাপারটা রহস্যাবৃত! পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত সব নর্মাল ছিল, আমি নিজে

অফিসে বসে ছিলাম। অফিস তখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে। টেলিফোনের বিশাখা বিশ্বাসকে তাই দেখলাম একবার। জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ি যাবেন না ? তা, বিশাখা এমনভাবে হাসলো, ভাবলাম এখান থেকে কোথাও যাবে-টাবে।"

"তারপর ?" সবাই ঝুঁকে পড়েছেন নগেনবাবুর দিকে।

"তারপর যা শুনছি, গদাধর সুইপার বিশাখা বিশ্বাসকে মিস্টার মজুমদারের ঘরে ঢুকতে দেখেছে।"

"কতক্ষণ ছিল বিশাখা ঐ ঘরে ?" সবার প্রশ্ন।

"ওরে বাবা আমি কী আর স্টপ ওয়াচ নিয়ে বড়সাহেবের ঘরের সামনে বসে ছিলাম ? অবশ্যি এমন কাণ্ড ঘটবে জানলে তাই করতাম।" নগেনবাবুর উত্তরে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে উৎসুক শ্রোতারা।

"বিশাখা বিশ্বাসকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বড়সাহেব ?"

"ডেকে পাঠানো হয়েছিল, না নিজে থেকেই সে ও ঘরে গিয়েছিল তাও তো রহস্যাবৃত ! এসব প্রশ্ন তুলেই তো কাউন্সেল মদনদাস ব্যানার্জি এবং হরিসাধন গুপ্ত হাজার হাজার টাকা রোজগার করবেন। মৃদুলা মুখার্জির মার্ডার কেসটা দেখলি না ? মার্ডার অথবা সুইসাইড হয়ে পুড়িয়ে ফেলতে লাগলো কয়েক ঘণ্টা ; আর তার মামলা বিচার করতে লেগেছে বছরের পর বছর। মৃদুলা মার্ডারের পরেই দেখবি বিশাখা বলাৎকার মামলা। যদি অতো সিরিয়াস অভিযোগ নাও টেঁকে, অন্তত 'বিশাখা বেইজ্জতি' মামলাটা খবরের কাগজের মালিকদের খুব সুখ দেবে।"

"কাগজে যা বেরোবে সে তো পড়বোই, কিন্তু ভিতরের খবরটা কী ?" সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে।

"বিটুইন সন্ধ্যা ছ'টা এবং ছ'টা পনেরো বড় সায়েবের ঘরে কিছু একটা ঘটে যায়।"

নগেনবাবু গতকালের ঘটনা স্মরণের চেষ্টা করলেন।

"শালা ঘর তো নয়, যেন ইন্দ্রপুরী। একদিকে টেবিল চেয়ার, অন্যদিকে নিচু গদি, যা মনের সুখে বিছানা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়।"

"কাজের জায়গায় আবার নরম গদি কেন ?" আর একজনের মন্তব্য।

নগেনবাবু বললেন, "অযথা সমালোচনা কোরো না ভায়া। এসব তো মিস্টার মজুমদার করেন নি—মিস্টার সেনশর্মার সময় দু'লাখ টাকা খরচ করে বড়কর্তার ঘর নতুনভাবে তৈরি করলেন ইনটারন্যাল ডেকরেটর মিসেস খামবাটা। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। সেই মিসেস খামবাটাই তো ছ'মাস পরে মিসেস সেনশর্মা হলেন। তারও ছ'মাস পরে ব্যাংক এবং পাওনাদারদের এক খোঁচায় মিস্টার সেনশর্মা রাস্তায় গিয়ে বসলেন ; এবং কোম্পানিকে বাঁচাতে আরও ছ'মাস পরে বম্বে থেকে এলেন মিস্টার মজুমদার।"

"কালকের ব্যাপারটা কী হলো ? বলো না ভাই," কেউ কেউ অধীর হয়ে উঠছে।

"যা শুনেছি, হুড়মুড় করে সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বিশাখা বিশ্বাস। কেউ বলছে, তখনও ওর জামাটামা বেসামাল। কেউ বলছে, বিশাখা তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছে—বাঁচাও ! আবার কেউ বলছে, ওই ব্লাউজ খোলা অবস্থায় বিশাখা সোজা ঢুকে গিয়েছিল মিস্টার চট্টরাজের ঘরে।"

"মিস্টার চট্টরাজ তখনও অফিসে ছিলেন ?"

"ছিলেন নিশ্চয়। না-হলে বিশাখা বিশ্বাস ওই ঘরে ছুটে যাবে কেন ?"

"মিস্টার চট্টরাজ যে তখনও অফিসে আছেন তা ভদ্রমহিলা জানলেন কী করে ?"

"তুই যে কাউন্সেল মদনদাস ব্যানার্জির মতো জেরা শুরু করলি ! যা কানে যাচ্ছে শুনে যা। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। ঘটনার একটু পরেই অফিসে পুলিস এসেছিল। এসব ব্যাপারে পুলিস আজকাল খুব কড়া। আগেকার দিন আর নেই যে অসহায় মেয়েদের নিয়ে দুষ্টু লোকরা ছিনিমিনি খেলবে আর গরমেণ্টের পুলিস তাদের আস্কারা দেবে।"

নগেনবাবু ফিসফিস করে বললেন, "শুনছি, পুলিস প্রথমে একটু দোনামনা করছিল—হাজার হোক নামকরা কোম্পানির চীফ এগজিকিউটিভ। একজন উটকো মেয়ের মুখের কথায় হুট করে কাউকে থানায় টেনে নিয়ে

যাওয়া।..."

"একজন মেয়ের মুখের কথা ছাড়া বলাৎকারের কেসে কী আর পাওয়া যেতে পারে ভাই? কেউ তো সাক্ষীসাবুদ এবং অটোমেটিক ক্যামেরা নিয়ে বেইজ্জত হতে যায় না।" এক ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন।

"যায়। সেসব গরমেণ্টের টপ স্পাই কেসে হয়। নামকরা বিদেশীদের টোপ ফেলে ব্ল্যাকমেল করবার জন্যে সব গরমেণ্টই ওই সব চেষ্টা করে।"

নগেনবাবু বললেন, "সি-আই-এ, কে-জি-বি'র কথা রাখো। শোনো আমাদের ঘরের কথা। পুলিস হয়তো তখনকার মতো চলে যেতো, কিন্তু..."

"কিন্তু...কী?" সকলেরই আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে।

"সায়েবের টেবিলে অশ্লীল ছবির বই পাওয়া গিয়েছে। মেয়েদের উলঙ্গ শরীরের নানা ধরনের ভঙ্গিমা। সেই দেখেই আরও সার্চ হয়েছে ড্রয়ার।"

"মেয়েমানুষের কেসে অফিসের ড্রয়ার সার্চ কেন?" একজন জিজ্ঞেস করে।

"সে তোদের বুঝে দরকার নেই—নোংরা জিনিসের অনেক প্রমাণ পুলিস এসেই খপ করে ধরে ফেলে। তার জন্যে সার্চ হতে পারে।"

অশ্লীল বইয়ের কথা শুনে ইউনিয়নের সেক্রেটারি ইন্দ্রনীলের মনটা একটু দমে গেলো। মিস্টার মনোময় মজুমদারই এই প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছিলেন। ভদ্রলোকের বিদ্যা বুদ্ধি সাহস তিনটেই ছিল। আর কর্মীদের দুঃখের কথাও বুঝতেন।

ভদ্রলোক তো বলতেনই, 'কর্মীদের সুখ-দুঃখ না দেখলে, বাঁচবার মতো মাইনে না দিলে, কোনো প্রতিষ্ঠান বাঁচতে পারে না। এই দুটো বাঁচার মধ্যে যে একটা সংযোগ আছে তা আমি বিশ্বাস করি, ইন্দ্রনীলবাবু।"

মনোময় মজুমদার গতকালও বলেছেন, "যা আমি বিশ্বাস করি না, তা হলো পরজীবী প্যারাসাইটে। যারা কাজ না করে মাইনে নেয়, ওভারটাইমের তাল খোঁজে, যারা কোম্পানির জন্যে মাল কিনে ঘুষ নেয়,

যারা চুরি করে কোম্পানির খরচ বাড়িয়ে নিজের পকেট মোটা করে তাদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। এদের দূর না করলে কোম্পানি বাঁচবে না এবং এই কাজে আমি আপনার ইউনিয়নের প্রতিটি সভ্যের সক্রিয় সাহায্য প্রত্যাশা করি।"

নগেনবাবু বললেন, "নিশ্চয় নোংরা মনের লোক, না-হলে ওই সব বই মজুমদার সায়েবের অফিসের ড্রয়ারে পাওয়া যাবে কেন?"

"কিন্তু পুলিসে খবর দিলো কে?" ইন্দ্রনীল জিজ্ঞেস করলো।

"জানি না, হয়তো মিস্টার চট্টরাজ। কিংবা ঐ বিশাখা বিশ্বাস নিজেই। এ-ব্যাপারে তো প্রপার চ্যানেল ধরে এগিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।" ব্যাখ্যা করলেন নগেনবাবু।

একজন রেগে উঠে বললো, "হাই-পোস্টের সায়েবগুলো সব জানোয়ার হয়ে যাচ্ছে। ওরা নিশ্চয় ভেবেছে যেসব মেয়ে পেটের দায়ে চাকরি করতে বেরিয়েছে তাদের মানসম্মান নেই। তাদের শরীর নিয়ে অফিসে বসে যা-খুশি করলেও কেউ মুখ খুলবে না।"

আর একজন বললো, "পায়ের জুতো খুলে মুখে মারলো না কেন বিশাখা বিশ্বাস? আমি তো শুনেছি, একটা মেয়ে এই পরিস্থিতিতে ব্লেড দিয়ে সেই জন্তুটার নাক কেটে দিয়েছিল। কাটা নাক নিয়ে যাও এবার নিজের বউ-এর কাছে—খুব আদর পাবে।"

নগেনবাবু বললেন, "গত রাতে কী নাটক এখানে হয়ে গিয়েছে তা আমরা জানি না। কিছুটা চোখে দেখেছে গদাধর—সে তাল বুঝে আজ ড্রপ মেরেছে। আর জানেন নিশ্চয় মিস্টার চট্টরাজ—তাঁকে তো আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি না। অন্য দু'জনের একজন বোধহয় এখন থানায়। অন্যজন কোথায় কে জানে? বিশাখা বিশ্বাসও হয়তো থানায় বসে আছে।"

জগদীশবাবুর শালা পুলিসের দারোগা। উনি বললেন, "আমি একটু আগেই শালাকে ফোনে ডেকে সব ঝালিয়ে নিলাম। বলাৎকারের চার্জ হলে খুব সিরিয়াস ব্যাপার—বিশাখা বিশ্বাসকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছে। অ্যাটেমটেড রেপের ক্ষেত্রেও মেয়েদের শরীরে নানা

সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে যায়। এর নাম সেকেণ্ডারি এভিডেন্স।"

"মানে?" জিজ্ঞেস করলেন নগেনবাবু নিজেই।

"এই ধরো, টানাটানি, খামচা-খামচি, কামড়াকামড়ির দাগ। প্রতিরোধের ধস্তাধস্তি একটা সিরিয়াস জিনিস—দু'পার্টিকেই সরকারী ডাক্তার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখবে। বুঝতেই পারছো, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে যে অভিযোগে সেটা তো ছেলেখেলার ব্যাপার নয়।"

জগদীশবাবু বললেন, "আমার শালার এসব আইন মুখস্থ। থানার ব্যাপারটা আমার কাছেও ডালভাত, বুঝলে নগেন। বে-ইজ্জতির ব্যাপারটায় ডাক্তারি এভিডেন্স আর কী থাকতে পারে?"

"তুমি এখনও সব জানো নি, জগদীশ," মন্তব্য করলেন নগেনবাবু। "আমি গিরিজা ঘোষালের তদন্তকোষ বইতে পড়েছি—শার্টে লিপস্টিকের ছাপ থেকে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। এমন সব মহিলা এক্সপার্ট আছেন যাঁরা ছাপ দেখলেই বলতে পারেন কোন ব্র্যাণ্ডের লিপস্টিক। স্ত্রী যেই দেখলেন তাঁর লিপস্টিক নয়, তখন তুলকালাম কাণ্ড—তদন্তকোষ বইতে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

ইউনিয়নের ইন্দ্রনীল এখন অন্য কথা ভাবছে। দু'একজন লোক এরই মধ্যে উত্তেজিত হয়ে আন্দোলন চাইছে। "ভর সন্ধ্যেবেলায় অফিসের মধ্যে মেয়েমানুষের বেইজ্জতি হবে অফিসারের হাতে, আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করবো তা কেমন করে হয়?"

বিশাখা বিশ্বাস এখনও এক্সট্রা টেমপোরারি। চাকরির নেচার ক্যাজুয়াল। ইউনিয়নের মেম্বার নয় সে। এমন কি ইউনিয়নের কারও মাধ্যমে সে এই অফিসে ইণ্টারভিউ দিতে আসে নি।

চট্টরাজের দূরসম্পর্কের ভাগ্নে বৃন্দাবন ঘোষাল ক্ষেপে আগুন। "এখনই ব্যাটাচ্ছেলে মজুমদারকে বাংলা থেকে বিদায় করে আবার বোম্বাইতে পাঠিয়ে দাও। বিশাখা বিশ্বাস ইউনিয়নের মেম্বার কিনা সেটা বড় কথা নয়। ইউনিয়নের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে।"

চুপ করে শুনে যাচ্ছে ইন্দ্রনীল। বৃন্দাবন বললো, "বাজার খুব গরম। অনেকে বলছে, মজুমদার শালাকে আর অফিসে ঢুকতে দেবো না।

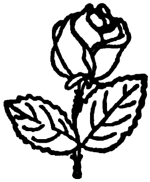
গতকালই হাফ মাথা কামিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।”

ইন্দ্রনীল শুধু ভাবছে মিস্টার মজুমদারের কাজের কথা। অনেক কষ্টে এই অফিসকে জল থেকে টেনে তুলবার একটা লোক পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কী যে হয়ে গেলো। ইউনিয়নের কর্মসমিতি প্রকাশ্যে মনোময় মজুমদারের সমালোচনা করেছে, কিন্তু মনে মনে এই লোকটি সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল! ভদ্রলোক একটা লক্ষ্যের দিকে কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখতেন।

আর একটা ব্যাপারেও মনোময় মজুমদার ব্যতিক্রম, ইন্দ্রনীলের মনে পড়লো। ডুবন্ত কোম্পানিরও রক্ত শোষণ করে নেবার মতো অফিসার এবং ঠিকাদারদের অভাব নেই। মনোময় ওসবের উর্ধ্বে ছিলেন—যা তাঁর পাওনা নয় এমন কিছুই কোম্পানির ঘাড়ে খরচ হিসেবে চাপাতেন না।

কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছু করবার নেই। ভদ্রলোক যে অফিসঘরে অর্ধ-উলঙ্গ মেয়েদের ছবির বই রাখতেন তা জানবে কী করে ইন্দ্রনীল? যদি কেউ দোষ করে থাকে তাকে আড়াল করবার ইচ্ছা বিন্দুমাত্র নেই এ-বি-সি-ডি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের। তবে পুলিস এবং আদালতের বিচার শেষ হবার আগেই কাউকে শাস্তি দেবার অধিকার ইউনিয়নের নেই।

কিন্তু ইন্দ্রনীল শুনলো উৎসাহী কিছু সভ্য বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আরও অবাক কাণ্ড, একখানা পোস্টার ইতিমধ্যেই দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। কে যে এই পোস্টার মারলো তা ইন্দ্রনীল জানে না।



‘মদ মেয়েমানুষ মজুমদার। এ-বি-সি ছাড়ো’—অফিসের সামনে আটকানো পোস্টারের খবরটা টেলিফোনে মালবিকার কানে পৌঁছতে দেরি হয় নি।

খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। রান্নার লোকটাকে সকালে

বিদায় করে দিয়ে মালবিকা চুপচাপ বসে ছিল।

এ-বি-সি মহিলা সমিতির কফি-মিটিং ছিল আজ। এই সভায় যাবার জন্যে মালবিকাকে কত ধরাধরি করেছিলেন কর্মকর্ত্রীরা—কিন্তু একটু আগেই মিসেস চট্টরাজ জানালেন তাঁর শরীর খারাপ, বৈঠক হচ্ছে না। আসর কেন বসছে না তা বোঝবার মতো সামান্য বুদ্ধি এখনও মালবিকার আছে—সোজাসুজি বললেই হতো, কিন্তু অসুখের অজুহাত মালবিকার শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

সমস্ত রাগটা ঘুরে-ফিরে মনোময়ের ওপরেই আসছে। মনোময়, তুমি তোমার অফিস, কারখানা এবং কোম্পানি নিয়ে বুঁদ হয়েছিলে—তোমার ওসব ব্যাপারে মালবিকা তো কোনোদিন নাক গলায় নি। তুমিই জোর করে মহিলা সমিতির ব্যাপারটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বললে, "কোম্পানির কর্মীদের মনোবল তৈরির ব্যাপারে অফিসারদের স্ত্রীদের বিশেষ ভূমিকা আছে, তুমি ওদের দূরে সরিয়ে দিও না। তুমি ওদের একটু আলো দেখাও, কেমন করে স্বামী তৈরি করতে হয় তা তোমার থেকে বেশী কে জানে?"

মনোময় বলেছিল, "কেমন করে তুমি আমাকে গড়ে-পিঠে মানুষ করেছো তা তুমি ওদের বলো, আমার একটুও আপত্তি নেই।"

সেই রকমই পরিকল্পনা ছিল মালবিকার। বলবে, বাগবাজারের সেই বড় বড় চোখের শীর্ণ উচ্চাশাহীন যুবকটির কথা যে এই ক'বছরে মিস্টার মনোময় মজুমদারে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এখন উদ্যোক্তারাই কেমন হেলাভরে অসুখের ছুতো তুলে বুঝিয়ে দিলো মিসেস মজুমদারের সঙ্গে তারা কোনো যোগাযোগ রাখতে চায় না।

না, মালবিকাকে ওরা একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না। অচেনা একটা লোক ফোন তুলে অফিসে পোস্টার লাগানোর খবর দিলো। মনোময়ের ঘরে কী নোংরা বই পাওয়া গিয়েছে তাও লোকটা জানালো।

এসব কিছু জানতে চায় না মালবিকা। সে একটু শান্তি চাইছে। প্রাণভরে ঠাকুরকে ডেকে নিজের বুকটা ঠাণ্ডা করবে সে।

কিন্তু আজ কিছুতেই শান্তি পাওয়া যাবে না। একবার ইচ্ছে হচ্ছে

মনোময়ের এই সংসার এমনিভাবে ফেলে রেখে যেদিকে চোখ যায় চলে যাবে মালবিকা। এ-বাড়ির বিছানা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে—এখানে শুতে গিয়ে শরীরটা ঘিন ঘিন করে উঠছে মালবিকার।

টেলিফোনটা আবার বাজছে। "হ্যালো, আমি দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী কথা বলছি। একটা গুড নিউজ আছে—সুখবরটা মিস্টার মজুমদার আপনাকে দিতে বললেন।"

বুকের ভেতরের অসহ্য চাপটা সুখবরের প্রত্যাশায় হাল্কা হয়ে আসছে। "হ্যালো, ওকে কি ছেড়ে দিয়েছে? ওরা নিশ্চয় বুঝেছে, মনোময় এরকম কাজ করতে পারে না। হি ইজ হ্যাপিলি ম্যারেড, দেবপ্রসাদবাবু।"

সে কথা আমি নিরন্তর থানায় বলে যাচ্ছি মিসেস মজুমদার, সুখী সংসারের সুখী মানুষ মনোময়বাবু। কিন্তু ওই শিকদার লোকটা—ওর মুখ খুব খারাপ। বলছে, বিবাহিত জীবনে সুখী হয়েও কিছু লোক শহরে যে কী করে বেড়াচ্ছে তা তো পুলিসের জানতে বাকি নেই!"

সুসংবাদটা তা হলে কী? মালবিকার বুকের ভিতরটা আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে।

দেবপ্রসাদ বললেন, 'মিসেস মজুমদার, ওরা রেপ অথবা অ্যাটেমটেড রেপের ভাবনাটা ছেড়ে দিয়েছে।"

"ওকে তা হলে ছেড়ে দিয়েছে?"

"মিসেস মজুমদার, আই অ্যাম স্যরি, কিন্তু সেকশন ৩৫৪টা ওরা ছাড়বে না।"

"নম্বরটা ছেড়ে দিন, মিস্টার রায়চৌধুরী। ৩৫৪ মানে কী?"

দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "মেয়েদের শালীনতাহানি।"

"ওরা কি মনোময়কে গ্রেপ্তার করেছে? মালবিকা এবার হাঁপাতে শুরু করলো।"

"আইনের এই নিয়ম, মিসেস মজুমদার। কিন্তু শুধু অ্যারেস্ট হয়েছে বললে কিছুই বোঝায় না। যতক্ষণ না আদালতে কেউ দোষী সাব্যস্ত

হচ্ছে ততক্ষণ সে আইনের চোখে নির্দোষ।"

"কিন্তু ওর চাকরি? চাকরি কি থাকবে?" মালবিকা শান্ত ভাবেই প্রশ্ন করে।

"চাকরি যাওয়াটা অত সোজা কথা নয়, মিসেস মজুমদার। আমি খোঁজখবর নিয়ে রেখেছি। টানা বাহাত্তর ঘণ্টা হাজতে থাকলে তবে সরকারী চাকরিতে সাময়িক বরখাস্তের হুকুম হয়। এখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় হাজতে কেটেছে; একটু পরেই আমি নিজে কোর্টে জামিনের জন্যে আবেদন করবো। ওই শিকদারটা একটু বেগড়বাই করছে—কিন্তু আদালতে কিছু করতে পারবে না।"

দেবপ্রসাদ বললেন, "আদালতে আপনাকে যেতে হবে না, মিসেস মজুমদার। হাজার হোক নারী-সংক্রান্ত মামলা। আপনার মানসিক উত্তেজনা বাড়বে।"

মনের উপর চাপ পড়তে যেন কিছু বাকি আছে! মনোময়ের এই ব্যাপারটা শাঁখের করাতের মতো যেতে এবং আসতে মালবিকাকে ক্ষতবিক্ষত করছে।

"নিজের শরীর খারাপ করবেন না কিন্তু।" দেবপ্রসাদবাবু কেমন বুদ্ধি করে মালবিকার উদ্বেগ কমাচ্ছেন। "মণিদীপাকে পাঠিয়ে দেবো নাকি? আপনার সঙ্গে একটু গল্প করে আসুক।"

"আমাকে জ্বলে-পুড়ে মরতেই হবে। আমার অদৃষ্টে তাই লেখা ছিল বুঝতেই পারছি। শুধু-শুধু ও বেচারাকে টানাটানি করবো কেন? ওর অনেক কাজ আছে দেবপ্রসাদবাবু।" কাতরভাবে বললো মালবিকা।

একটু পরে মালবিকাকে নিজেই ফোন করলো মণিদীপা। "তোদের মামলা নিয়ে কর্তা খুব উঠে পড়ে লেগেছেন," মণিদীপা ব্যাপারটা হাল্কা করতে চাইছে। "কখনও তো আমার কোনো বন্ধুর জন্যে উনি কিছু করেন নি।"

"তুই বেশ ছিলি। কেন যে তোকে এ-বাড়িতে ডাকলাম। আমার দুঃখের সঙ্গে অকারণ তোকে জড়িয়ে পড়তে হলো।" মালবিকার স্বরে গভীর দুঃখ!

"জড়িয়ে পড়বার জন্যই তো লোকে ওকালতি শেখে, মালবিকা।"

"মণিদীপা, তুইও তো ল' পাশ করেছিলি?"

"আমি ভাই ওই স্যর পি সি রায়ের লাইন নিয়েছি, 'ওকালতি পড়িতেছি বটে, কিন্তু উকিল হইব না।"

"নৈতিক ব্যভিচারের অভিযোগে যদি কারুর স্বামী মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন তাহলে স্ত্রী সেই স্বামী থেকে দূরে চলে যেতে পারেন তো?"

"তুই কী সব বলছিস মালবিকা?" বকুনি লাগায় মণিদীপা। "মনোময় এখন বিপদে পড়েছে—কোথায় তুই তার পাশে দাঁড়াবি। মনে নেই আগুনের সামনে কী প্রতিজ্ঞা করেছিলি? সুখে-দুঃখে পরস্পরকে অতিক্রম করবি না। নো ওভারটেকিং—জীবনে চলার পথে এই হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর ট্রাফিক আইন।"

মণিদীপা এখনই মালবিকার বাড়িতে চলে আসতে চাইছে।

"এখন আমি একটু একলা থাকবো, মণিদীপা। আমার মুখটা পুড়ে গিয়েছে! মনোময়কে আমি তিলে-তিলে নিজের স্বপ্ন দিয়ে তৈরি করেছিলাম—ও আমাকে খুব ভাল প্রতিদান দিয়েছে।"

"শান্ত হ' মালবিকা। ও বেচারা এখন থানা-পুলিস আদালত সামলাবে, না তোকে ঠাণ্ডা করবে?"

অফিসের ঘরে একলা পেয়ে কোনো মেয়ের শরীরে হাত দেবার আগে সেটা ভাবা উচিত ছিল না কি?" ফুঁপিয়ে উঠলো মালবিকা।

"হ্যালো, মালবিকা, তুই যে এমন অবুঝ হবি তা আমি কল্পনা করি নি। মনোময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে; কিন্তু ভদ্রলোক অপরাধ কিছু করেছেন কিনা তা তো জানলি না তুই। আইন-আদালত কেউ এখনও মনোময়কে দোষী বলছে না, অথচ তুই যদি আগাম রায় দিস তাহলে বেচারার ওপর ডবল অবিচার হয় না কি?"

"আমি ভালভাবে চিন্তা করতে পারছি না, মণিদীপা। আমি ওর বিছানা আলাদা করে দিয়েছি, আমাদের যুগল ছবিটাও বেডরুম থেকে সরিয়ে দিয়েছি—তোর কাছে কিছুই চেপে রাখবো না। আর মনোময়

যদি সত্যিই কিছু করে থাকে, তাহলে আইন-আদালত উকিল-ব্যারিস্টার যে যাই বলুক আমার কাছে ওর ক্ষমা নেই। এর যে ক্ষমা হয় না মণিদীপা” কান্নায় ভেঙে পড়লো মালবিকা।

“ও খুব বাড়ছিল, মণিদীপা। বাড়তে বাড়তে আমি বোধহয় ওর কাছে খুব ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি আজ কেউ নই, মণিদীপা। সামান্য একজন মিসেস মজুমদার। যে-মালবিকা বাগবাজার থেকে ওকে বিদ্যানগর ক্যামপ্যাসে নিয়ে গিয়েছিল, যে মালবিকা নিজের পড়া নষ্ট করে ওকে ম্যানেজমেণ্টের ডিগ্রি জোগাড় করে দিয়েছিল—তার মৃত্যু চাইছে মনোময়। বুঝতে পারছিস না তোরা ?”

“আমি কিছুই বুঝতে চাই না, মালবিকা। আমি চাই যতক্ষণ না মনোময় দোষী প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তুই ওকে বাড়তি শাস্তি দিবি না। জামিনে খালাস পেয়ে মনোময় যখন বাড়ি ফিরবে তখন তুই ওকে আশ্রয় দিবি।” মণিদীপা টেলিফোনে নিজের কথাগুলো স্পষ্ট বলে ফেললো।

“প্রশ্রয় দেবো ? স্ত্রীর ভালবাসার সম্মান দেয় নি যে—অফিসের মেয়ের সঙ্গে নোংরা ব্যবহার করতে গিয়ে যে কোর্টঘর করেছে ?”

“প্রশ্রয় নারে বাবা, ভুল শুনেছিস—আশ্রয়। রায় বেরুক, তারপর যা-ইচ্ছে করবি—কিন্তু এখন তুই গোলমাল বাধাবি না ।”

টুং টাং টুং—বাইরের দরজায় স্পেশাল বেলটা পিয়ানোর মতো বেজে উঠলো। এই ইলেকট্রনিক ঘণ্টা সিঙ্গাপুর থেকে আনিয়েছিল মনোময়। বেল বাজাবার একটা বিশেষ ধরন আছে ওর—যা শুনলেই এতোদিন মালবিকা নিজে দরজার দিকে ছুটে যেতো। বউ এসে দরজা খুলুক এটাই চাইতো মনোময় ; আর মালবিকার পক্ষে সেটা ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষার

অবসানে আবার স্বামীকে দেখতে পাওয়ার সুযোগ।

যখন বিদ্যানগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জনে অত কাছাকাছি ছিল, একই সঙ্গে ক্লাসের পর ক্লাশ করেছে তখন এই প্রতীক্ষার যন্ত্রণা বোঝে নি মালবিকা। কিন্তু ওই যে বোম্বাইতে কাগজের ফানুসে চড়ে মনোময় অন্য এক জগতে পৌঁছবার চেষ্টা করতে লাগলো তখনই শুরু হলো মালবিকার প্রতীক্ষা। মনোময় ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠলো। কাজ যতই ওকে দূরে সরিয়ে নিতে লাগলো ততই ওকে কাছে পাবার ইচ্ছাটা প্রবল হতে লাগলো মালাবিকার।

মনোময়কে একবার মালবিকা বলেছিল, "মহৎ প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়—এটা উপন্যাসের বানানো কথা, জীবনের সত্য নয়।" বোকা বাঙালী মেয়েদের ঠকাবার জন্যে শরৎ চাটুজ্যেকে দিয়ে ওরকম লেখানো হয়েছে বলে মালবিকার সন্দেহ।

টুং টাং টুং—চব্বিশঘণ্টা আগেও বেলটার অন্য অর্থ ছিল মালবিকার কাছে। এখন কিন্তু মালবিকার উঠতে ইচ্ছা করছে না।

এ-বাড়ির মাস মাইনের কাজের লোক শিবুর-মাকে দরজা খুলে দেবার নির্দেশ দিলো মালবিকা। শিবুর-মা গৃহকর্ত্রীকে মনে করিয়ে দিতে গেলো, "সায়েবের বাজনা।"

"যা বলেছি, করো" অযথা বকুনি খেলো বেচারা।

মনোময় ভিতরে এসেছে—কিন্তু মুখ ফিরিয়ে রইলো মালবিকা। নিরুপায় মনোময় এবার বাথরুমে ঢুকে গেলো। ভোরবেলায় সে স্নান সেরে নিয়েছিল—এখন আবার শাওয়ারের শব্দ হচ্ছে। এই ভর দুপুরে বেডরুমে বসে-থাকা মালবিকার দৃষ্টি এবারে দ্বিখণ্ডিত বিছানার দিকে ছুটে গেলো। মনোময়ের অ্যাটাচি কেসটা মেঝের উপরে অনাদরে পড়ে রয়েছে। অন্যদিন মালবিকা নিজেই ওটা তুলে নিয়ে দেওয়াল আলমারির কোণে সযত্নে রেখে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসে মনোময় দেখলো শিবুর-মা টেবিলে কিছু শুকনো খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। এ সংসারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধিপতির সাহস হলো না প্রশ্ন করার মালবিকার খাওয়া

হয়েছে কিনা ?

কোনো রকমে সায়েবের খাওয়া শেষ করিয়ে শিবুর-মা এই ফ্ল্যাট থেকে কয়েক ঘণ্টার মতো বিদায় নিলো। এখন অখণ্ড প্রাইভেসি—কিন্তু অনতিক্রম্য দূরত্বের শতসহস্র রক্তচক্ষু স্বামী-স্ত্রীকে সারাক্ষণ বিপদ-সংকেত দিচ্ছে।

"ওরা আমাকে জামিন দিয়েছে।" দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক স্বর থেকে একটু নিচু গলায় বলবার চেষ্টা করলো মনোময়।

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই মালবিকার মধ্যে। ওর ভাবটা—নিশ্চয় দিয়েছে, না-হলে পুলিসের পাহারা পেরিয়ে মনোময় মজুমদার এখানে ফিরে এলো কী করে ?

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মনোময় যেন দেওয়ালকে বলছে; "দেবপ্রসাদবাবুই পেশাদার জামিনদারের ব্যবস্থা করলেন। ওরা একশ টাকায় দশ টাকা চার্জ করে—দশ হাজার টাকায় হাজার টাকা। নিজের নামে স্থাবর সম্পত্তি না থাকলে জামিনদার হওয়া যায় না।"

জামিনে খালাস পাওয়া আসামীর কথা অনেক শুনেছে মালবিকা কিন্তু কখনও চোখে দেখে নি। এখন কেমন সন্দেহের চোখে সে যাচাই করতে লাগলো মনোময়কে। মালবিকার ধারণা ছিল, দেহের কোথাও জামিনের শীলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়। শীলমোহর নেই, কিন্তু মনোময়ের মুখেই অদৃশ্য ছাপ পড়ে গিয়েছে। মালবিকার বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না জামিনে খালাস পাওয়া একজন আসামীর সঙ্গে সে বসে আছে।

এই যে মালবিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার স্বামীর দেহটা দেখছে তা বোধহয় মনোময়ের নজর এড়াচ্ছে না। মেঝেতে পড়ে থাকা অফিসব্যাগটা তুলে এনে ভিতর থেকে কী একটা প্যাকেট টেনে আনবার চেষ্টা করছে মনোময়।

"কাল দেওয়া হয় নি—তোমার উপহারের বইটা...," ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে মনোময় বলে উঠলো।

এবার ফোঁস করে উঠলো মালবিকা। "কোনো বইতে আমার আগ্রহ নেই। আজ সকালে আমার চোখ পুড়ে গিয়েছে—টেলিফোনে ওরা

বললো, তোমার টেবিলে নোংরা ছবির বই...পুলিস সেই সব নিয়ে টানাটানি করেছে।"

এবার মুখ তুললো মনোময়। "পরশু দিন বিকেলে কিনেছিলাম, কাল আমার টেবিলেই ছিল, সন্ধ্যেবেলায় পুলিস থানায় নিয়ে গিয়েছিল। দেবপ্রসাদবাবুর কথায় একটু আগে ওরা ফেরত দিলো, আজ তোমার জন্যেই নিয়ে এসেছি।" বইয়ের মোড়কটা এক টানে ছিঁড়ে ফেললো মনোময়—ঝকঝকে বইটা বাঘের মতো লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে মালবিকার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মালবিকা দেখলো—'বডি বিউটিফুল'। এই রঙিন বইটার কথাই মিসেস চাওলা বলেছিলেন মালবিকাকে। সাগরপারের অর্ধবিবসনা এক সুতনুকা কিঞ্চিৎ দুষ্টুমিভরা দৃষ্টিতে কাউকে যেন শিকারের চেষ্টায় প্রচ্ছদপট আলো করে বসে আছে। বইটা আগে দেখে নি মালবিকা, দেখলে অবশ্যই এর জন্য মনোময়কে বলতো না।

"এই বইটা ?" এই বইটাই কি তাহলে কাল মনোময়ের টেবিলে পড়ে থেকে অহেতুক হাঙ্গামা বাধিয়েছে? মালবিকা দেখলো দোকানের ক্যাশমেমোতে ১৪ ডিসেম্বর তারিখটা জ্বলজ্বল করছে।

"এই বইটা ?" অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে আবার জিজ্ঞেস করতে পারলো মালবিকা। কিন্তু ততক্ষণে মনোময় অফিসের ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এখনই অফিস যাবে সে—মিস্টার দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী সেরকম পরামর্শ দিয়েছেন।

বইটা যতই উল্টেপাল্টে দেখছে মালবিকা, ততই লজ্জা হচ্ছে। কে জানতো যে এর ভিতর এমন সব ছবি আছে যা নারী শরীরের এক একটি অংশ নিয়ে মাতামাতি করছে। কিন্তু এই বইটার জন্যে মনোময় ছোট হয়ে গিয়েছে ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মালবিকার। মনোময়ের হাতের লেখাটাও প্রথম পাতায় জ্বলজ্বল করছে ; "গতকাল তোমায় দিতে পারি নি। আজ দিলাম। একদম-না-হওয়া থেকে দেরি হওয়া ভাল।" ১৬ই ডিসেম্বর তারিখটা বইয়ের প্রথম পাতা থেকে বেরিয়ে মালবিকার বুকের দিকে ছুটে আসতে চাইছে।

মনোময়ের কাছ থেকে বইটা অবশ্যই নিতো না মালবিকা। গতকাল যা হয়ে গিয়েছে তারপর নেওয়া-দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই বইটা অকারণে ওর কষ্ট বাড়িয়েছে ভাবতেই মালবিকার মনের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো।

একটু পরেই টেলিফোনের ডায়ালটা ঘুরোতে লাগলো মালবিকা।

"এ বি সি ড্রাগস্," সেক্সী নারীকণ্ঠ ওদিক থেকে মনোময়ের কোম্পানির উপস্থিতি ঘোষণা করছে।

বিশাখা বিশ্বাস নাকি? সেও কি শেষ পর্যন্ত থানা থেকে অফিসে চলে এসেছে? এই গলা মালবিকার অচেনা নয়।

এ বি সি ড্রাগস্...এ বি সি ড্রাগস্...মেয়েটা বলেই চলেছে। ভাগ্যে মালবিকা কোনো শব্দ উচ্চারণ করে নি। খুব সাবধানে লাইনটা কেটে দিলো মালবিকা।

মনোময়ের অফিস ঘরে ডাইরেক্ট টেলিফোন লাইনটা এবার বেজে উঠলো।

"মজুমদার," একটা নাটকীয় ভঙ্গিতে মনোময় মজুমদার টেলিফোনে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে—যা বুঝিয়ে দেয় মনোময় কৃতী, মনোময় আত্মবিশ্বাসী, মনোময় এই অফিসের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত।

আজ কোনো সগর্ব ঘোষণা নেই। তবে 'হ্যালো' কথা শুনেই মনোময়ের বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে ফোনটা মালবিকার।

স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে মনোময় নিজেই যেন ধন্য হচ্ছে! মনোময় বলছে, "আমি চেয়ারে এসে বসেছি। অফিসের সামনে দু'-একটা নোংরা পোস্টার পড়েছে এই যা। তেমন কোনো অসুবিধা হয় নি। মিস্টার চট্টরাজ শুধু বলছিলেন, বম্বে থেকে পারমিশনের কথা। মিস্টার রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে আমি তৈরি হয়ে এসেছিলাম। বললাম, মিস্টার চট্টরাজকে ভাবতে হবে না— মামলার কাগজপত্র কপি করে আমি নিজেই বোম্বাইতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাহাত্তর ঘণ্টা টানা হাজতে না-থাকলে সরকারী অফিসেও কারও বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়া

যায় না।”

মালবিকা এবার অস্ফুটস্বরে বললো, “বইটা।”

“বইটা কি হয়েছে?” মনোময়ের ভয় হচ্ছে মালবিকা বইটা নেবে না।

“বইটা নিয়ে এতো কাণ্ড হলো। তুমি কেন ওদের বললে না, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন। আমাকে প্রশ্ন করলেই বলতাম আমি বইটা চেয়েছি নিজেই।”

ওদিকে আবার নীরবতা। “যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে...আমি ভাবি নি, থানার অফিসার মিস্টার শিকদার সত্যিই আমার বিরুদ্ধে মামলা শুরু করবেন।” মনোময়ের গলাটা কেমন গম্ভীর অথচ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আবার রাগের ঝলকে তপ্ত হয়ে উঠেছে মালবিকা। টেলিফোনটা অনেক আগেই নামিয়ে দিয়েছে সে।

মালবিকা একবার শুনেছিল, কলকাতার বড় অফিসে বড় বড় কর্তাদের সঙ্গে পুলিসের স্পেশাল ভাব-সাব থাকে। পুলিসের সঙ্গে জানাশোনা থাকলে কী না কাজ হয়? মনোময় নিশ্চয় খুব বেশী নির্ভর করেছিল মিস্টার শিকদারের ওপর—ভেবেছিল যতক্ষণ মিস্টার শিকদার থানায় রয়েছেন ততক্ষণ কোনো অন্যায়ের জন্যে কেউ মজুমদারকে স্পর্শ করতে পারবে না।

মালবিকার খেয়াল হলো, আজ ওদের দু'জনের সুতানুটি ক্লাবে নেমন্তন্ন আছে। হিমালয় রাবার প্রোডাকটসের স্বর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠান। স্বয়ং কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী রিসেপশনে উপস্থিত থাকবেন।

মালবিকা গম্ভীরভাবে মনোময়কে আবার ফোনে জানিয়ে দিলো, “আমি কোথাও বের হবো না।”

মনোময়ও বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। কোনো পার্টিতে যাবার মুখ নেই তার। এখনই হিমালয় কোম্পানির সেক্রেটারি মিস্টার বিশ্বাসকে জানিয়ে দিচ্ছে; ডিউ টু আনঅ্যাভয়েডেব্‌ল রিজন। উঃ কী অপার মহিমা এই ইংরিজী ভাষার, যে-লোকটা এই 'আনঅ্যাভয়েডেব্‌ল রিজন' কথাটা আবিষ্কার করেছিল তার কী কালজয়ী প্রতিভা! 'অনিবার্য কারণবশত'

কথাটা বাংলায় চালু হয়েছে, কিন্তু মূল ইংরিজী কথাটা সব সময় তার পিছনে উঁকি মারছে।

মালবিকার ছটফটানি কিছুতেই শেষ হতে চায় না। অ্যাডভোকেট দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী চেম্বারের কাজকর্ম শেষ করে সবে বাড়িতে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় তার ফোন বেজে উঠলো। ফোনটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে মণিদীপা বললো,"এই নাও। মালবিকা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

"হ্যালো, মিসেস মজুমদার, ভাগ্য আমাদেরই ফেবার করছে মনে হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে অ্যাসিস্‌টেন্ট পাবলিক প্রসিকিউটর জামিনের বিরুদ্ধে কথা তুলেছিল, কিন্তু আদালত সেকথা কানে তোলেন নি। মিস্টার শিকদার আমার জানাশোনা অনেকদিনের—ইচ্ছে করলে সমস্ত ব্যাপারটা গোড়াতেই বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু ভদ্রলোক কিছুই করলেন না। আমি ভেবেছিলাম, মিস্টার মজুমদারের অফিসে যোগ দেবার ব্যাপারে একটু হাঙ্গামা হবে। কিন্তু কোনো গোলমাল হয় নি। এটা ভাল কথা।"

"ওই যে নোংরা পোস্টার পড়েছে?" সুযোগ পেয়েই মালবিকা মনে করিয়ে দিলো।

"কোম্পানির স্বীকৃত ইউনিয়ন ওটা করে নি। মিস্টার মজুমদারকে বলেছি, পোস্টারের ছবি তুলিয়ে রাখতে, দরকার হলে যারা প্রচারপত্র টাঙিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে উকিলের নোটিশ পাঠিয়ে দেবো। বলা নেই কওয়া নেই, কাউকে মদ মেয়েমানুষ মজুমদার বলা আমরা সহ্য করবো না। আইনের শাসন এখনও এদেশ থেকে উঠে যায় নি।"

"মিস্টার রায়চৌধুরী, ওই বইটার ব্যাপারে ওর কোনো দোষ নেই। পরের মুখে ঝাল খেয়ে আমিই বইটা দেখতে চেয়েছিলাম। আপনি মিস্টার শিকদারকে বলবেন।"

"এখন আর শিকদার নয়—যা কিছু সব মাননীয় আদালতকে বলা হবে। ফরচুনেটলি, শিকদার ওই বইটা বাজেয়াপ্ত করে নি।"

"দেবপ্রসাদবাবু, মণিদীপার হাজবেণ্ড হিসেবে আমাকে একটু সাহায্য করবেন ? আমি জানি আপনি মনোময়ের উকিল। তবু, তবু আপনি আমাকে বলুন, মনোময় সত্যিই কি ঐ মেয়েটাকে একলা পেয়ে... এইটার ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে, দেবপ্রসাদবাবু। মনোময় যদি অন্যায় করে থাকে, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি দেবপ্রসাদবাবু, প্রত্যেক সম্পর্কের একটা সীমা আছে।"

ওদিক থেকে উত্তর আসছে না। মালবিকা ততই অস্থির হয়ে উঠছে। "আপনি দয়া করে একটিবার বলুন, দেবপ্রসাদবাবু।"

দেবপ্রসাদ এবার তাঁর স্তব্ধতা ভাঙলেন। তার আগে চিন্তা করে নিয়েছেন কী বলবেন। এই ধরনের মামলায় পুলিস সামলানো থেকেও শক্ত কাজ স্ত্রীকে সামলানো। অভিযুক্ত আসামীকে দ্বিমুখী আক্রমণের মুখোমুখি পড়তে হয়। এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ জানে না, কোনো বিচক্ষণ আইনজ্ঞ কখনও আসামীকে জিজ্ঞেস করেন না, অপরাধটা সে সত্যিই করেছে কিনা। দেবপ্রসাদ এটা শিখেছেন তাঁর গুরুর কাছ থেকে, তিনি আবার শিখেছিলেন স্যর এডোয়ার্ড কারসনের জীবনী থেকে। টু গীজ হিম অল হিজ অয়্যার সোয়ান্স—কোনো মক্কেলকে তিনি দোষী ভাবতে পারতেন না।

দেবপ্রসাদ শান্তভাবে টেলিফোনে বললেন, "মালবিকা দেবী, আপনি সাধারণ গৃহবধূ নন, আপনি শিক্ষিতা, যে-কোনোদিন আপনি কলেজের অধ্যাপিকা হতে পারেন। আপনি তো জানেন, আমি ওকালতনামায় সই করেছি—আমি মিস্টার মজুমদারের উকিল।"

"আপনি আমার সহপাঠিনীর স্বামীও বটে, দেবপ্রসাদবাবু। প্লিজ, আমাকে একটু আলো দেখিয়ে দিন—তারপর যা করবার সে আমি নিজেই করবো। কেউ আপনাকে জড়াবে না" মালবিকা ফোনে অর্ধ উন্মাদের মতো ব্যবহার করছে।

দেবপ্রসাদ ইতিমধ্যেই মণিদীপার সঙ্গে মালবিকার সকালের কথাবার্তার বিবরণ শুনেছেন। মণিদীপা বলেছে, "আমি মালবিকার দুঃখ বুঝি। যদি

সত্যিই মনোময় কিছু করে থাকে তবে মালবিকার যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা রয়েছে। তুমি জানো না, মনোময়ের জন্য ওই মেয়েটা কী করেছে। মনোময় ইজ হার ক্রিয়েশন।"

দেবপ্রসাদ এবার অন্য পন্থা নিলেন। বললেন, "মিসেস মজুমদার।"

"আপনি আমাকে মালবিকা বলুন। মিসেস মজুমদার পরিচয়টা বিরাট এক সংশয়ের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে দেবপ্রসাদবাবু। মালবিকা আপনার কাছে জানতে চাইছে মনোময় মজুমদার সম্পর্কে।"

"মালবিকা, আমি আপনাকে একটা উল্টো প্রশ্ন করছি। যদি মনোময়বাবু সত্যিই নিরপরাধ হন, একজন সৎ সাহসী সত্যনিষ্ঠ ভদ্রলোক যদি অন্যায়ভাবে মামলায় জড়িয়ে পড়ে থাকেন, তাহলে আপনার কর্তব্য কী? শত্রুরা জানে, শক্তিমানকে সাধারণ মামলায় না জড়িয়ে নারীঘটিত মামলায় টানতে পারলে অনেক সুবিধা হয়। এদেশের আইনে মেয়েদের শারীরিক নিরাপত্তা দেবার জন্যে অনেক কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে—কিন্তু কোথাও কোনোদিন আইনের অপব্যবহার হয় নি এ-কথা কে বলবে?"

"বেশ তো, তাতে কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি কী বলতে চান, প্রত্যেকটি শালীনতাহানির আসামী নির্দোষ?" মালবিকার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

দেবপ্রসাদ মুহূর্তের জন্য আবার ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, "অবশ্যই নয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন, যতক্ষণ না আপনি জানছেন আপনার স্বামী অপরাধী, ততক্ষণ আপনি তার পাশে দাঁড়াবেন, না তাকে সন্দেহের বশে চরম শাস্তি দেবেন?"

মালবিকা অসহায়ভাবে বললো, "আপনি আমার সব ওলটপালট করে দিতে চাইছেন, দেবপ্রসাদবাবু। আমি অবশ্যই অযথা সংশয় সন্দেহে দুলতে চাই না।"

"মিসেস মজুমদার, আপনি উতলা হবেন না। আপনি তো মনোময়কে অনেকদিন ধরে চেনেন। আপনি ওঁকে সন্দেহ করবেন কিনা নিজেই ভেবে দেখুন না।" এই বলে তখনকার মতো টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

মালবিকার মাথায় পাগলামী চেপে বসেছে। বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সে আজ মিসেস চাওলার ফিগার সেন্টার ঘুরে এলো। দেহচর্চার এই আখড়াকে মিসেস চাওলা বলেন স্টুডিও। এইটাই এখন কলকাতার আধুনিকতম ফ্যাশন।

স্টুডিওতে আজ তেমন ভিড় ছিল না। মিসেস চাওলার সেই একই কথা। কলকাতার মহিলারা যে রোগে ভুগছেন তার নাম 'আত্মতুষ্টি'—ভাবছেন বিয়ে হয়ে গেলে আর দেহশাসন ও দেহচর্চার দরকার নেই। "একদিন এর জন্য চরম মূল্য দিতে হতে পারে বধূদের। এঁরা একদিন ঠেকে বুঝবেন দেহচর্চার মূল মন্ত্রই হলো ধারাবাহিকতা—শরীরের আদালতে একদিন খুব যত্ন, আবার এক সপ্তাহ অবহেলার জরিমানা অনেক।"

হাফপ্যাণ্ট পরা অবস্থায় ঝপাঝপ একটা স্বল্পসময়ের শারীরিক অধিবেশন হয়ে গেলো মালবিকার।

সুশিক্ষিতা ক্লায়েন্টের দিকে তাকিয়ে মিসেস চাওলা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো তোমার? সেদিন পর্যন্ত অমন গার্ডেন ফ্রেশ ছিলে, অথচ এখন চোখের কোলে কালি? খুব লেট নাইট করছো নিশ্চয় স্বামীর সঙ্গে? চুপ করে আছো কেন? কাম অন। আমার যখন সময় ছিল তখন বিনোদের সঙ্গে আমিও মনের আনন্দে বেজায় হুটোপুটি করেছি। তারপর অবশ্য বিনোদ এবং আমার ডাইভোর্স হয়েছে।"

মালবিকা এখনও উত্তর দিচ্ছে না। মিসেস চাওলা সস্নেহে বললেন,"একটা ছোট্ট পরামর্শ শুনে রাখো, সুন্দরী মিসেস মজুমদার। পার্টিতে যাবে—কিন্তু হুইস্কি খাবে না। যত ইচ্ছে জিন চালাও—হুইস্কি মেয়েদের ফিগার বেঢপ করে দেয়, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। বিনোদকে যখন আমার ডাইভোর্স করার প্রয়োজন হয়ে পড়লো

তখনই হুইস্কির দয়ায় আমার ওজন পনেরো কিলো বেড়ে গিয়েছে।"

মালবিকার শরীরের দিকে তাকিয়ে মিসেস চাওলা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। "তোমার শরীরে একটু শুকনো ভাব এসেছে। মনের মধ্যে জ্বালা থাকলে অনেক সময় এ-রকম হয়, মিসেস মজুমদার। প্রচুর লিকুইড পান করো— বেঙ্গলের এই সবুজ পরিবেশে শুকনো সৌন্দর্য মানায় না।" মালবিকা এবার পুলিসের কথা তুললো। ওর প্রশ্ন শুনে মিসেস চাওলা বললেন."আমি দিল্লী বম্বে ক্যালকাটায় অনেক পুলিস দেখেছি। আমার বাবাও থানার ও-সি ছিলেন। আমি তোমায় বলছি, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের পুলিস কখনও ঘাঁটাতে চায় না। খুব ভারী মামলা না থাকলে পুলিস তাদের টানাটানি করে না। একদম কোনো অপরাধ নেই, আর পুলিস কোনো ভদ্রলোককে থানায় গ্রেপ্তার করলো এরকম বড় একটা হয় না।"

মিসেস চাওলার অনেক অভিজ্ঞতা, ঠিকই বলেছেন। শুধু শুধু একজন পুলিস অফিসার কেন এমন নোংরা মামলায় মনোময়কে জড়িয়ে দেবেন ? তাঁরা কি জানেন না, এতে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংসারের ওপর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ? একজনের অপরাধে দু'জনকে শাস্তি একমাত্র নারীঘটিত মামলাতেই দেওয়া সম্ভব।

মনোময় বাড়ি ফিরে এসেছে। যে লোক আগে অফিস থেকে উঠতেই চাইতো না সে আজ ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে চেয়ার ছেড়ে চলে এসেছে।

অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে মালবিকা বাড়ি ফিরে এসে দেখলো মনোময়ের টেবিলে দু'খানা মোটা মোটা আইনের বই। ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট বলতে একমাত্র ডস্টয়ভস্কির কথাই এতোদিন মনে আসতো, এখন দেখা যাচ্ছে অনেক আইনজ্ঞই ওই নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। শুধু পেনাল কোড হলেই চলে না, তাঁর যমজ ভাই ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর কোডও প্রয়োজন।

মালবিকা আরও দেখলো, মনোময় অফিস-ব্যাগের ভিতর থেকে ছোট ছোট কাগজের টুকরো হাতড়ে বার করছে। কয়েকটা কাগজ সে যত্ন করে সাজিয়ে নিলো।

পুলিসের মিস্টার শিকদারের নামটা ঘুরে ফিরে উঠলো। মনোময় বোধ হয় সারাক্ষণ শিকদার নাম জপ করছে।

শিকদারের ওপর মনোময় যে মোটেই সন্তুষ্ট নয় তা বেশ বুঝতে পারছে মালবিকা। কিন্তু পুলিস অফিসারদেরও তো আইনমাফিক কাজ করে যেতে হবে। পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে মিস্টার শিকদার একজনের বিরুদ্ধেই মেয়েদের অসম্মানের চার্জ আনলেন কেন?

মনোময় বোধহয় বুঝতে পারছে মালবিকা কী ভাবছে। না হলে হঠাৎ সে বলে উঠবে কেন "অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়েছি কাগজগুলো। এগুলো সাধারণত আমি ফেলে দিই। ভাগ্যক্রমে এনগেজমেন্ট ডায়রির মধ্যে দু'খানা স্লিপ ঢুকে ছিল।"

মনোময় কাগজ দুটো এবার এগিয়ে দিচ্ছে মালবিকার দিকে। এই মুহূর্তে মালবিকাই যেন আদালত আর মনোময় মজুমদার তার সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে।

কাগজ দু'খানা দেখে ফেলেছে মালবিকা। শিকদার তাঁর বেকার বি. এ ফেল ভাগ্নেকে মনোময়ের কাছে পাঠাচ্ছেন চাকরির জন্যে। 'একটা কিছু করতেই হবে, মিস্টার মজুমদার'—শিকদারের লিখিত অনুরোধ।

"কোথায় চাকরি? যে ক'টা লোকের নাম খাতায় রয়েছে তাদের চাকরি রক্ষা করতেই এ বি সি ড্রাগস্ হিমশিম খাচ্ছে। শিকদারকে আমি সোজা জানিয়ে দিয়েছিলাম, চাকরির ব্যাপারে কোনো সাহায্যই আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর একটা স্লিপে শিকদার অনুরোধ করেছেন, তাঁর বিশেষ প্রিয় এক বন্ধুকে কোম্পানির ট্রান্সপোর্ট কনট্রাক্ট পাইয়ে দিতে হবে। মনোময় এবারেও কড়াভাবে জানিয়ে দিয়েছিল, কনট্রাক্ট দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা কোম্পানির চীফ এগজিকিউটিভ দেখে না। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কাউকে সুপারিশ করাও তার পক্ষে নীতিসঙ্গত হবে না।

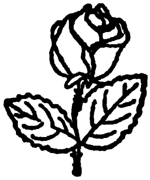
এর চারদিন পরেই মনোময় মজুমদারকে মিস্টার শিকদার পুলিসী সীমানার মধ্যে পেয়েছেন।

স্লিপগুলো না দেখলে মালবিকা বিশ্বাসই করতো না মনোময়কে।

বলতো, বিশ্বসুদ্ধ লোকই তোমাকে নিচে নামানোর জন্যে ষড়যন্ত্র করছে ; আর নিষ্কলঙ্ক নিরপরাধ তুমি শহীদের মতো বসে আছো।

কাগজগুলো দেবপ্রসাদ দেখেছেন। বলেছেন, "এখন কোনো কাজে লাগবে না তবে সাবধানে বাড়িতে রেখে দিন। সুযোগ এলে ব্যবহার করা যাবে।"

শিকদারের মুখটা কল্পনা করবার চেষ্টা চালাচ্ছে মালবিকা। শিকদারের বক্তব্য যেন এইরকমঃ তোমার অফিসের মেয়ে যখন তোমার বিরুদ্ধে নোংরা অভিযোগ আনছে ; তখন আমি কেন বাধা হই? যাক না মামলাটা আদালতে—এ-বি-সি ড্রাগসের ঠাণ্ডা ঘর ছেড়ে ধর্মাবতারের ভাঙা বেঞ্চিগুলো একবার দেখেই এসো না বাছাধন।



কাগজে-কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। কলকাতার অফিসমহলের এই কেচ্ছা ট্রামে-বাসে, প্রাইভেট গাড়িতে, ক্যানটিনে এখন মুখরোচক আলোচনার বিষয়। তরুণী গৃহবধূর মার্ডার কেসগুলো এতোদিনে পাঠকদের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে ; তাছাড়া কলকাতার মানুষরা বড় অনুভূতিপ্রবণ, মৃত্যু নিয়ে মজা তাদের আসে না।

এই মামলায় মার্ডার নেই ; রেপের ভয়াবহতাও নেই, স্রেফ একটি যুবতীর শালীনতাহানি। যাঁর বিরুদ্ধে এই লজ্জাহরণের অভিযোগ, তিনি যখন খোদ অফিসপ্রধান তখন নাটক জমে উঠতে বাধ্য।

সাধারণত যা হয়, মতামত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল পাঠক পদস্থ মাত্রকেই দোষী করছেন। বলছেন ,"সাহস বাড়তে বাড়তে এরা কোথায় এগিয়ে যাচ্ছে দেখুন। নিজের অফিস ঘরেই মধুচক্র বানাতে চাইছে এরা।"

আর একদল বলছে, "মেয়েদেরই দোষ এটা। কিছু কিছু কর্মী কাজের

দিকে মন না দিয়ে অন্য পথে অফিসে বাজীমাৎ করবার নেশায় মেতেছে। এদের সাজগোজে সুড়সুড়ি, এদের হাবভাবে রহস্য, এদের বেশবাসে নীরব নিমন্ত্রণ, এদের জামাকাপড় দেখে বোঝা যায় না এরা অফিসে যাচ্ছে না সন্ধ্যেবেলায় প্রমোদবিহারে বেরিয়েছে।"

মেয়েদের স্পেশাল বাসে চাপা আলোচনা ঃ "অফিসটা পিছল খাবার জায়গা নয়। দূরত্ব রাখার চেষ্টা করো। কাছে বসেও যে মেয়ে দূরে থাকতে জানে না চাকরির জগতে তার বিপদ অনিবার্য।"

দু'একটা বড় কাগজে রসিয়ে রসিয়ে ঘটনার বিবরণ লেখা হয়েছে, কিন্তু নায়ক-নায়িকার নাম প্রকাশ করা হয়নি। অনেকে বুঝতে পারছে না, 'অফিসপাড়ার অভিজাত সংস্থা কোনটি? ফলে বহু বড় বড় অফিসেই অকারণে ফোন আসছে।

ফিগার সেন্টারে দু'একজন অচেনা মহিলা মালবিকাকেও প্রশ্ন করেছে, "কোন অফিসে এমন ঘটেছে বলো তো? আমার হাজবেন্ড খুব মেজাজ দেখাচ্ছেন, কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না।"

মালবিকা সমস্ত সামাজিকতা ত্যাগ করেছে। তবু প্রশ্নটা পুরোপুরি এড়িয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে না। এই ফিগার সেন্টারেই শুধু একটু যাতায়াত রয়েছে; কিন্তু সেখানেও সে মার্কামারা হয়ে যাবে নাকি?

উত্তর না দিয়েই ফিগার সেন্টার স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসেছে মালবিকা। এই সেদিনও কলকাতা শহরের সমস্ত বাড়ির দরজা খোলা ছিল মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মজুমদারের জন্য। ওদের উপস্থিতি যে কোনো দম্পতিকে খুশী করতো—আজ কোথাও যাওয়া চলে না, নিজের ফ্ল্যাটে অসহায়ভাবে বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

সাধে কি আর বিরক্তি বাড়ে মনোময়ের উপর! মনোময় যা করেছে তার ক্ষমা নেই। শুধু ওই সন্দেহের দোলাটুকু না-থাকলে—মালবিকার অর্ডার দেওয়া ওই বইটা এবং শিকদারের হাতের লেখা কাগজের টুকরোগুলো না দেখলে—এতোদিনে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেতো।

বাড়িতে ফিরে এসে বেডরুমে আধশোয়া অবস্থায় মামলার নথিপত্রগুলো মালবিকা নাড়াচাড়া শুরু করেছে। এই ব্রীফটা দেখলেই তার শরীর রি রি করে ওঠে। বিচ্ছিন্ন দু'খানা সিংগল খাটের মধ্যিখানেই আড়াই ফুট

দূরত্বটা সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হয়ে ওঠে।

এই ব্রীফখানা এবং আইনের বই দুটো মনোময় প্রতিদিন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ে। বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক স্লিপ গুঁজে যাচ্ছে মনোময়। পেনাল কোডের ৩৫৪ ধারাটা মালবিকারও প্রায় মুখস্থ হয়ে এসেছে— "Whoever assaults or uses criminal force to any women intending to outrage...her modesty, shall be punished with imprisonment...two years or fine, or with, both" নারীর লজ্জা শরম হরণের উদ্দেশ্যে যে পুরুষ গায়ের জোরে পাশবিক শক্তির ব্যবহার করে তার দু'বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা হতে পারে।

লাইনগুলোয় অনেকবার লাল দাগ বুলিয়েছে মনোময়। পাদটীকায় খুদে খুদে অক্ষরে অসংখ্য মন্তব্য ছাপা রয়েছে। 'মডেস্টি' শব্দটারও কত রকম ব্যাখ্যা হয়েছে ! একশ কুড়ি বছর ধরে হাজার হাজার মামলার আলোকে বিচারকরা ফতোয়া দিয়েছেন ; "The essence of womans modesty is her sex." নারীর লজ্জা শরমের মূল কথাটাই হলো তার সেক্স ! বিচারকরা বলেছেন সমর্থা নারীর সর্বাঙ্গে লেখা রয়েছে তার শালীনতা ; নিদ্রিত অথবা জাগ্রত যে-কোনো অবস্থায় সর্বশ্রেণীর নারীর শালীনতা বিপন্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। কেউ এই শালীনতাহানির 'ইচ্ছা' নিয়ে কিছু করলেই আইনের অমোঘ শাসন নেমে আসবে তার ওপর...দু'বছরের জেল অথবা জরিমানা, কিংবা উভয়ই।

বইয়ের একটি অংশে মনোময় একাধিকবার পেন্সিলে দাগ বুলিয়েছে। "যার শালীনতা নিগৃহীত হলো তার সেই সময়ের আচরণ অবশ্যই অভিযোগ প্রমাণের পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ; কিন্তু নারীর অজ্ঞাতেও শালীনতা নষ্ট হচ্ছে অহরহ। গভীর ঘুমে অচেতন অথবা সংজ্ঞাহীন নারীর দেহকে অপমানের অভিযোগও আদালতকে বিচার করতে হতে পারে।" মেয়েদের অবাধ ঘোরা ফেরার স্বাধীনতায় এই ৩৫৪ ধারা একটা প্রধান রক্ষাকবচ।

নানা আদালতে নানা ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যা পরীক্ষা পাশের নিষ্ঠা নিয়ে মনোময় দেখেছে।

মালবিকাও মন দিয়ে কাগজপত্রগুলো উল্টোচ্ছে। এসব নিশ্চয় দেবপ্রসাদবাবুর সহায়তায় জোগাড় হয়েছে।

একখানা কাগজ মালবিকা পড়তে আরম্ভ করলো। থানায় প্রথম বিবৃতি ; "আমার নাম বিশাখা বিশ্বাস। বয়স সাতাশ। আমি বি-এ ফেল। অসুস্থ স্বামীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি চাকরির খোঁজে কয়েক মাস আগে এ-বি-সি-ড্রাগস্-এ ইন্টারভিউ দিই। ওখানকার টেলিফোন অপারেটিং-এর কাজ দেখি আমি। ওখানে যে মহিলা কাজ করতেন তিনি সন্তানসম্ভবা হয়ে ছুটিতে আছেন। কবে ফিরবেন, কিংবা আদৌ ফিরবেন কিনা সন্দেহ—কারণ তাঁর শরীর খুব খারাপ।

"অথচ আমি এখনও ক্যাজুয়াল কর্মী। আইন অনুযায়ী যাতে আমার কোনো অধিকার না জন্মায় সে জন্য এর আগে দুবার কয়েক দিনের জন্য আমাকে ডিউটি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আমি আবার কাজ পেয়েছি। এ-অফিসে মিস্টার মনোময় মজুমদারকে আমি চিনি। ফোনে অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। একবার তিনি বলেছিলেন, আমার ভয়েস খুব সুইট। আমার ব্যক্তিত্ব আমার গলার স্বরেই বেরিয়ে আসে। এসব নিয়ে আমি কখনও উৎসাহ দেখাই নি! অফিসে দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুরুষ-মানুষদের এড়িয়ে চলতে হয়. আমি শুনেছিলাম।

"কয়েকদিন থেকেই শুনেছিলাম আমার কাজকর্ম নাকি মিস্টার মজুমদারের পছন্দ হচ্ছে না। আমি নাকি কোম্পানির সুনাম নষ্ট করে দিচ্ছি। এমনও শুনলাম, আমার চাকরি যেতে পারে, অন্য মেয়েকে আনা হবে বোর্ডে। আমি তখন বেশ ভয় পেয়ে যাই।

"মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ১৪ই ডিসেম্বর বিকেলে আমি চেষ্টা করি। ভেবেছিলাম আমার অসহায় সাংসারিক অবস্থার কথা ওঁর কাছে একান্তে বলে আমি সুবিচার পাবো। তিনি আমাকে দেখলেন এবং পরের দিন দেখা করতে বললেন। পরের দিন বিকেলে ফোনে আমি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার তাড়াতাড়ি আছে কিনা, কারণ একটা মিটিংয়ে তিনি ব্যস্ত আছেন। আমার যখন দায়, বললাম যতোক্ষণ প্রয়োজন অপেক্ষা করতে পারি। অফিস শেষ

হয়ে যাবার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ওঁর ঘরে আমি একলা ঢুকি। মিস্টার মজুমদার তখন টেবিল ছেড়ে ঘরের ডিভানে বসে কী একটা বই দেখছিলেন।

"আমি বললাম, আমি স্বামী পরিত্যক্তা—কোন রকমে এই কলকাতা শহরে করে খাচ্ছি!

"মিস্টার মজুমদার আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন, জানতে চাইলেন কে আমাকে চাকরি দিয়েছিল? আমি কিছুই চেপে রাখি নি। বললাম, আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক মিস্টার সেনশর্মার কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। অনেকদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তবে চাকরিটা দিয়েছেন তিনি।

"ঘোরালেন কেন?" মিস্টার মজুমদার জিজ্ঞেস করলেন।

"কী করে বলবো স্যার?" কোন পুরুষমানুষের মনে কখন কী থাকে!

"আরও কথা হয়েছিল। মিস্টার মজুমদারের আন্তরিকতা আমার ভাল লেগেছিল। তাই মন খুলে সব বলেছিলাম। আগে স্যর আমি অতি সাধারণ বেশেই কাজের ধান্দায় ছোটাছুটি করতাম। মিস্টার সেনশর্মাই বললেন 'ওরকম যোগিনী সেজে থাকলে কে আপনাকে কাজকর্ম দেবে? আপনাকে সাজগোজ করতে হবে। স্মার্ট মহিলা ছাড়া কেউ অফিসে চাকরি দেবে না।'

"এরপর মিস্টার মজুমদার কী সব প্রশ্ন করেছিলেন আমার ঠিক মনে নেই। বোধহয় মিস্টার সেনশর্মার কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপর সুযোগ বুঝে আমি বলতে গেলাম, এখানকার চাকরিতে পাকা হওয়াটা আমার খুব প্রয়োজন। মিস্টার মজুমদার হঠাৎ সুকৌশলে ওঁর হাতের বইটার কয়েকটা পাতার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তারপর বললেন, 'আমার চোখগুলো খুব সুন্দর।' আমি তখনও সুযোগ পেলেই আবেদন করে চলেছি, কাজের ব্যাপারে। মিস্টার মজুমদার এবার সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। আমি বোকার মত ওঁর পাশে বসেছি। উনি তখন খুব মন দিয়ে ছবির বইটা দেখতে লাগলেন। আমিও আড়চোখে বইয়ের পাতাগুলো মাঝে মাঝে দেখছিলাম। মিস্টার মজুমদার হঠাৎ বইটা এমনভাবে এগিয়ে

আনলেন যাতে আমি ভালভাবে দেখতে পাই। বোকামি করে আমিও পাতাগুলো দেখতে লাগলাম।

"আমার দিকে তাকিয়ে মিস্টার মজুমদার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আমার হাতে কিছু সময় আছে কিনা। আর বললেন, জানাশোনা হয়ে গেলে তিনি অবশ্যই আমার চাকরি নিয়ে গোলমাল করবেন না। চাকরির উন্নতি অবনতি, স্থায়িত্ব সবই নাকি নির্ভর করছে আমার নিজের ওপরে। আমি বললাম, আমার হাতে আজ খুব বেশী সময় নেই। উনি তখন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন ; আমি সেই হাসির অর্থ ঠিক বুঝতে পারি নি। তাই নিজেও বোকার মতো হাসবার চেষ্টা করেছি একটু, আর অমনি উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানতে লাগলেন। আমার শরীরের নানা জায়গায় হাত দেবার চেষ্টা করলেন। আমার আঁচলটা সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি সন্তুষ্ট থাকলে এমন সুন্দর মেয়ের চাকরি কে নেবে ?"

"আমি তখন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। মজুমদার তখনও আমার জামাটা ছাড়েন নি। তারপর আমার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে মজুমদার ভয় পেয়ে গিয়েছেন। আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আমিও তখন ছুটে বেরিয়ে এসেছি...আমি তখন বুঝতে পারছি আমার ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছে।...."

আর পড়তে পারছে না মালবিকা। দেহের তলাটা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আর কপালের দিকের উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বিশাখা বিশ্বাসের কান্না শুনতে পাচ্ছে মালবিকা। বিশাখা বিশ্বাস অসহায় গৃহবধূ, পেটের দায়ে বড় অফিসের চাকরি করতে এসেছে, সে কেন শুধু-শুধু এমন নোংরা অভিযোগ আনতে যাবে ? এইসব কথা বলে. পুলিসের সামনে অফিসের লোকের সামনে তার নিজের অপমানও কম হবে না।

না, বিশাখা বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করতে পারছে না মালবিকা। একটা চাকরিতে পাকা হওয়া ছাড়া আর কিছুই যার দাবী নেই ; সন্ধ্যেবেলায় সে কেন কাঁদতে কাঁদতে সায়েবের অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে ?

আর কী হতে পারে? মনোময় জানে ১৫ই ডিসেম্বর তার জন্মদিন, বাড়িতে সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে। শুভদিনে কেউ কি অতো নিচুতে নামতে পারে?

কিংবা? অন্য এক সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি মারছে। এই বিশাখা বিশ্বাসের সঙ্গে কী মনোময়ের তলে তলে কিছুদিন থেকে আলাপ হয়েছিল? ঐদিন বিশেষ কোনো কারণে বিশাখা বিশ্বাসের বিরক্তি উৎপাদন হয়েছে? মনোময়ের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক হঠাৎ অন্য কারুর সামনে ধরা পড়ে গিয়েছে? এবং সেই অবস্থায় নিজের মুখ বাঁচাতে মনোময় সম্পর্কে এই রকম একটা অভিযোগ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না?

আরও একটা বিবৃতি পড়ে ফেলেছে মালবিকা। চট্টরাজ বলছেন, "সেদিন আমি অফিসের কাজে চারটের সময় বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা ফাইল নেবার জন্য ফিরে এসে নিজের ঘরে একমনে কাজ করছিলাম। এমন সময় বিশাখা বিশ্বাস আমার ঘরে ঢুকে পড়েন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেন, মিস্টার মনোময় মজুমদার তাঁকে একলা পেয়ে সর্বনাশের চেষ্টা করেছেন। আমি প্রথমে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। কী করতে হবে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপর বলি, আমি মিস্টার মজুমদারের কাছে যাচ্ছি। সেই সময় বিশাখার সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনিও খুব বিচলিত ছিলেন। মিস্টার ধীরেন বিশ্বাস বলেন, এখনই পুলিসে খবর দিন। পুলিস আসুক তারপর অন্য কথা।"

"আমি তখন বাধ্য হয়ে থানায় ডায়াল করি এবং বিশাখা দেবী নিজেই কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় পুলিসের মিস্টার শিকদারের সঙ্গে কথা বলেন।"

কে এই ধীরেন বিশ্বাস? ইনি তো দেখা যাচ্ছে বিশাখার পড়শি। বিশাখাকে নিয়ে কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। তার সামনে ধরাটরা পড়ে গিয়ে বিশাখা নিজের রূপ পালটালো নাকি?

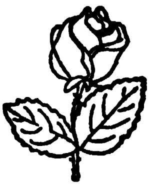
মালবিকার সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে জবজব করছে। এরই মধ্যে বম্বের ব্যাংকের কর্তাদের কাছে লেখা মনোময়ের চিঠির কপিও রয়েছে। মনোময় লিখছে, "ফৌজদারি মামলার সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠালাম। শ্রীমতী

বিশাখা বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানেরই ক্যাজুয়াল কর্মী। যার কাজকর্ম আশানুরূপ না-হওয়ায় আমি নতুন লোক সন্ধানের নির্দেশ দিই। এই মহিলা আমার বিন্দুমাত্র পরিচিতা নন, তবে ঐদিন তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য করুণভাবে আবেদন করেন। তিনি কয়েকবার নাকি আমার বাড়িতেও গিয়েছিলেন এবং আমার স্ত্রী তাঁকে অফিস-সংক্রান্ত কাজে অফিসেই কথাবার্তা বলার উপদেশ দেন।"

বিশাখা বিশ্বাস ! সেই পুরনো সিল্কের শাড়ি-পড়া মেয়েটির মুখ এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মালবিকা।

মনোময়ের চিঠিটা দীর্ঘ। সে যা বলতে চাইছে ; অফিসের স্বার্থে সে নানা অপ্রিয় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে—যেমন চুরি বন্ধ করা, আজে বাজে নিয়োগ স্থগিত রাখা এবং অপদার্থ অসৎ ঠিকাদারদের বিতাড়ন করা। স্বভাবতই তাকে লোকের চোখে হেয় করবার এবং বিতাড়নের চেষ্টা চলবে এবং বর্তমান মামলাটি তারই অঙ্গ। এর পিছনে যে অফিসের কোনো দুষ্টচক্র কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

চিঠিটা পড়লে কে আর মনোময়কে সন্দেহ করতে চাইবে ? কিন্তু ওই চিঠির পিছনে নিশ্চয় উকিলের কারুকার্য আছে। মনোময় নিজেও ভাল চিঠি লেখে, আর মিস্টার রায়চৌধুরী যে ড্রাফটিং-এ সিদ্ধহস্ত তা মণিদীপার মুখেই শুনেছে মালবিকা। মণিদীপা নিজেই তো সেবার বলেছিল, ওরা কলমের জোরে এবং মুখের জোরে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করছে।



টুং টাং বেল বাজছে। মনোময় ফিরে এসেছে।

ব্রীফটা মুড়ে যথাস্থানে রেখে মালবিকা চুপচাপ বসে রইলো। মনোময় যে দেবপ্রসাদবাবুর চেম্বার ঘুরে এসেছে তা বোঝা যাচ্ছে। সঙ্গে আরও

দু-একটা আইন বই এবং আরও কিছু কাগজপত্র এনেছে সে।

স্ত্রীর মুখের দিকে না তাকিয়েই মনোময় বললো,"মিস্টার রায়চৌধুরী এইরকম একটা মামলা করেছিলেন সুদর্শন চোপরার হয়ে। সেটা আবার পুলিস কেস নয়। প্রমীলা বাগচী ভারসাস সুদর্শন চোপরা। ওই সেকশন ৩৫৪। ওখানে অভিযোগ আরও গুরুতর—নিজের গাড়িতে লিফ্‌ট দিতে গিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোডে সন্ধ্যেবেলায় মত্ত অবস্থায় আউটরেজিং অফ মডেস্টি।"

মালবিকা আজকাল কোনো কথা বলে না, শুধু শুনেই যায়। মনোময়ের মুখের দিকেও তাকায় না, পাছে চোখাচোখি হয় তাই মুখ ঘুরিয়ে রাখে। উত্তর না পেয়েও মনোময় বললো,"কেসটা বেশীদূর গড়ালো না। ক্রেডিট দেবপ্রসাদবাবুরই। ওঁর লেডি জুনিয়র রুচিরা ব্যানার্জি বোঝালো ওই প্রমীলা বাগচীকে কোনো প্রমাণ নেই ; মামলায় হয়রানি এবং হাজার হাজার টাকা খরচ করে গোহারান হারবেন। তারপর মিস্টার চোপরা নিশ্চয় মানহানি এবং ক্ষতিপূরণের মামলা আনবেন। তার চেয়ে...."

আদালত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে সুদর্শন চোপরাকে সসম্মানে মুক্তি দেয় নি ; প্রমীলা বাগচীর সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তি এসেছে।

"দেবপ্রসাদ বলছিলেন, আপনি শুধু শুধু জড়িয়ে পড়লেন। এ-কেসও....।" মনোময় আজকাল মালবিকাকে দেখলেই কিছুক্ষণের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন শুরু করে দেয়।

"শুধু শুধু ! মালবিকার বিরক্তি ব্যঙ্গে রূপান্তরিত হলো। "একজন ক্যাজুয়াল মহিলা অপারেটর কোন সাহসে ঢুকেছিল চীফ এগজিকিউটিভের ঘরে ? অফিসের আইনকানুনে এমন তো হয় না।"

মালবিকার ইচ্ছে হচ্ছিল গলা ফাটিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কচি খোকা ! তুমি কিছুই জানো না—একটা মেয়ে সন্ধ্যেবেলায় একলা তোমার ঘরে ঢুকলো, তারপর কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে এসে বললো তার শরীরে হাত উঠেছে, তুমি তার মানসম্মান নষ্ট করেছো। মনোময় মজুমদার, তুমি অনেকদিন এই অফিস লাইনে রয়েছো—তুমি এতোই

নিষ্পাপ যে মেয়েটা কেন তোমার ঘরে ঢুকেছে তাও জানো না!"

মালবিকার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েছে মনোময়। ব্যাগটা খুলে সে আবার কোন এক কাগজের খোঁজ করছে। কাগজটা খুঁজে পেয়েছে মনোময়। সেটা এগিয়ে দিলো মালবিকার দিকে।

বিশাখা বিশ্বাসের হাতের লেখা। বিশাখা লিখছে, এক মিনিটের জন্যে দেখা করতে চায় সে। 'আমি জানি আমার কাজে আপনি সন্তুষ্ট নন। কিন্তু একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি অত্যন্ত সামান্য কর্মচারি, কিন্তু আমার মেজদি শ্যামলী অনেকদিন আগে কাসুন্দিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে মিসেস মজুমদারের সঙ্গে পড়েছিলেন প্রাইমারী সেকশনে।'

মালবিকা লক্ষ্য করলো অপমানে কালো হয়ে উঠেছে মনোময়ের মুখ। যেন সে গলা ফাটিয়ে বলতে চাইছে,"এবার বুঝতে পারছো? কেন আমি দেখা করতে রাজী হয়েছিলাম?"

অনেক ছোটবেলায় বাবা কিছুদিন হাওড়ায় ছিলেন বটে, তখন কাসুন্দিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে পড়েছিল মালবিকা। এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। অথচ কী আশ্চর্য, যখন বিশাখা বিশ্বাস বাড়িতে এলো তখন ওসব কথা তো কিছুই তুললো না। হয়তো ওই সব বলতেই সে এসেছিল, কিন্তু মালবিকার রাগ দেখে কথাটা তুলতে পারে নি।

মনোময়, তোমার ঐ ব্যাগে আরও কত কি জমিয়ে রেখেছো? এক একটা কাগজের টুকরো বের করছো আর মালবিকার সব ভাবনা চিন্তা কিছুক্ষণের জন্যে গোলমাল করে দিচ্ছো।

এরপর আরও কি বের করে বসবে মনোময় তার ঠিক নেই। মালবিকার মনে সত্যিই সন্দেহ জাগছে, বেচারা অন্যায়ভাবে অসম্মানে জড়িয়ে পড়লো নাকি?

ভালই হয়েছে, সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেনি বলেই তো মালবিকা এখনও এ-বাড়িতে রয়েছে। একেবারে নিরাশ্রয় গুড়ি-গুড়ি বাংলার বধূ নয় মালবিকা। শ্রাবন্তীকে বলে রেখেছে, উইদাউট এনি নোটিশ একখানা ঘর হঠাৎ দরকার হতে পারে মালবিকার। "কেন দরকার, কী হলো,

ও সব জিজ্ঞেস কোরো না ভাই।" মালবিকার কথা বলার ধরনেই শ্রাবন্তী ওর মনের অবস্থা আন্দাজ করে নিয়েছে। একটাও প্রশ্ন করে নি সে। বলেছে, "যখনই দরকার বুঝবি চলে আসবি, ঘর রেডি থাকবে।"

বিশাখার মেজদি, কাসুন্দিয়া বালিকা বিদ্যালয়—কথাগুলো ক'দিনই মালবিকার মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে। সেই সঙ্গে বিশাখার মুখোমুখি হবার প্রবল ইচ্ছা তাকে ক্রমশ পেয়ে বসছে।

এই পর্যায়ে বিশাখার সঙ্গে মালবিকার সাক্ষাৎকার দেবপ্রসাদবাবু নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না। এর অবশ্যই একটা অশোভন দিক আছে। কিন্তু মালবিকা খবর পেয়েছে, অফিসপাড়ার অন্য এক মামলায় আসামীর স্ত্রী গোপনে দেখা করেছিলেন অভিযোগকারিণী প্রমীলা বাগচীর সঙ্গে। দু'জনে উচ্চপর্যায়ে কী আলোচনা হয়েছিল তা ভগবানই জানেন, কিন্তু টুঁ শব্দ না করে এর পরেই প্রমীলা বাগচী নিজের দুটো মামলাই তুলে নিয়েছিল। দেবপ্রসাদবাবুর সহকারিণী রুচিরা ব্যানার্জি সেসময় খুব সাহায্য করেছিল।

প্রমীলার ফাইলটা মালবিকা মন দিয়ে পড়েছে। কিন্তু এর আগেও একটা নাটক হয়েছিল। ঘটনা ঘটবার কিছু পরেই মিস্টার চোপরার বিশ্বস্ত অফিস ম্যানেজারের মধ্যস্থতায় প্রমীলা বাগচী প্রথমবার পুলিসের কাছে চিঠি লিখে নিজে অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তারপরই প্রমীলা আর একটা মামলা শুরু করেছিল ওই ম্যানেজারের নামে—সেকশন ৩৮৪, জোর করে কিছু আদায় করে নেবার অভিযোগ, যার আইনী নাম 'এক্সটরশন'! ৩৮৪ ধারায় তিন বছর জেল এবং অর্থদণ্ড হতে পারে। এর পরেই শালীনতাহানীর মামলা জোর কদমে শুরু হয়েছিল—এবং শেষ পর্যন্ত মিসেস চোপরা আসরে অবতীর্ণ হন।

এক একবার দ্বিধা আসছে মালবিকার। আবার দুরন্ত এক ইচ্ছা মালবিকার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। মনোময়, দেবপ্রসাদবাবু কে কী ভাবলেন তাতে কী এসে যায় মালবিকার? দেবপ্রসাদবাবু তো জানতে চান নি মনোময় নির্দোষ কিনা—আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি

উকিলের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। মালবিকার দায় যে তাঁর থেকে অনেক বেশী—তাকে জানতে হবে মনোময় সত্যিই নিরপরাধ কিনা ?

বিশাখা বিশ্বাস। যে এতোদিন শঙ্কায় সদাসঙ্কুচিত হয়ে সামান্যা ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে এ-বি-সি ড্রাগসের অফিসে ঢুকেছে এবং বেরিয়েছে, সে এখন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। অফিসের সবার দৃষ্টি তার দিকে, কিন্তু কেউ সাহস করে না তার সঙ্গে কথা বলতে বা ঐ প্রসঙ্গে তুলতে।

শোনা গিয়েছিল, অফিসের ঐ পদটা থাকবে না বিশাখার। কিন্তু অফিসের কর্তারা আইনজ্ঞের মতামত নিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, ফৌজদারী মামলার যতক্ষণ না নিষ্পত্তি হচ্ছে ততক্ষণ যে যেখানে সে-সেখানে থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত।

অনেকের কাছে বিশাখা বিশ্বাস এখন দুঃসাহসিনী নায়িকা—দানবমর্দিনী। তার এক আঘাতে এ-অফিসের ভিত টলে উঠেছে।

আজকাল কালো চশমা পরছে বিশাখা। তার হাতের ব্যাগটাও যেন আকারে একটু বড় হয়েছে। বিশাখা বিশ্বাসকে চেনে না এমন একজন লোক এখন কাছাকাছি অফিসপাড়ায় নেই।

বিশাখা জানে, তার এই অফিসে ঢোকা নিয়ে নানা গবেষণা শুরু হয়েছে। কেউ বলে, সোজা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে সে এখানে এসেছে। কারুর ধারণা আগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সেনশর্মার লোক সে। সেনশর্মা সম্বন্ধে নানা নোংরা কথা ছড়িয়ে আছে এই অফিসে ! আবার অনেকের সন্দেহ মিস্টার চট্টরাজই কায়দা করে আনিয়েছেন ওকে। চট্টরাজ তাঁর শালার নামে যে কোম্পানিটা করেছেন, এ-বি-সি ড্রাগসের নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষকতায় সেটা ভালই চলছে। চট্টরাজ নাকি বলটা এমনভাবে খেলেছিলেন যে মনে হলো দায়টা মিস্টার সেনশর্মার এবং তিনি চট্টরাজকে রিকোয়েস্ট করলেন বিশাখা বিশ্বাসের ইন্টারভিউ নিতে। তাতেই নাকি বিশাখার চাকরিটা হয়ে গেলো। টেলিফোনটাই তো সব ! অফিসের কোথায় কী হতে চলেছে তার আগাম

খবর সংগ্রহ করতে হলে ওখানে নিজস্ব প্রতিনিধির উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন।

বিশাখা বিশ্বাসকে দূর থেকে অফিসে আসতে দেখেছে মালবিকা। ওর সঙ্গে ওখানে দেখা করাটা এমন কিছু শক্ত নয়। অফিস টাইমের একটু আগে অফিসের লাগোয়া বাস স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকলেই হলো। কিছুক্ষণ একটু সাবধানে বাসগুলো লক্ষ্য করতে হবে। একখানা দু'খানা কিংবা তিনখানা বাসের পর, স্টেটবাসের পিছন গেট থেকে ফুড়ুৎ করে নেমে পড়বে সাতাশ বছরের বিশাখা বিশ্বাস। কালো চশমার আড়ালে ওর চোখ দুটো লুকিয়ে থাকে না সর্বদা। মাঝে মাঝে চশমা খুলে পথের পরিবেশ দেখে নেয়।

মালবিকা তার মতের পরিবর্তন করেছে। পুরনো সিল্কের শাড়িপরা যে বিশাখা বিশ্বাসের নার্ভাস ছবিটা তার মনের মধ্যে এতোদিন আঁকা ছিল এই বিশাখা ততটা গ্ল্যামারহীন নয়। বিশাখা শ্যামাঙ্গিনী কিন্তু শ্রীময়ী। বিশাখার সমৃদ্ধ উচ্চাঙ্গ ও চলমান শরীরের ছন্দ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে মালবিকা। অফিসপাড়ার জনস্রোতের মাঝে ওই শান্ত তনুশ্রীকে দেখে কে বলবে সে মালবিকা মজুমদারের জীবনে এমন বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

একদিন নয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনদিন বিশাখাকে এইভাবে লক্ষ্য করেছে মালবিকা। তিনদিন তিন রঙের শাড়ি পরেছে বিশাখা বিশ্বাস —নীল, বেগুনি ও ম্যাজেণ্টা। না, বিশাখার সাজসজ্জায় উগ্রতা নেই; কিন্তু বিশাখা প্রতিদিনই মালবিকার চোখে ক্রমশ আকর্ষণীয়া হয়ে উঠেছে। এই বিশাখা এবং বিবর্ণ পুরনো সিল্কের শাড়ি-পরা সেই মেয়েটি যে এক তা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে মালবিকার।

বিশাখা-দর্শন শেষ করে, মিনি বাসে বাড়ি ফিরে এসেছে মালবিকা, ভায়া ফিগার সেণ্টার। এসব কাজে অফিসের গাড়ি ব্যবহার করা মোটেই নিরাপদ নয়।

মুখে লোশন লাগাতে লাগাতে মিসেস শকুন্তলা চাওলা জিজ্ঞেস করেছেন, "আপনার কি কোনো হাঙ্গামা চলছে, মিসেস মজুমদার? সুন্দর

মুখটা ক্রমশ কালো হয়ে যাচ্ছে।"

"আমার ওজন তো কমেছে।" মূল সমস্যাটা এড়িয়ে মিসেস চাওলার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে মালবিকা।

"শরীরের লোডশেডিংই সব নয়, মিসেস মজুমদার। লাবণ্য, নমনীয়তা এবং ঝকঝকে ভাবটা মেয়েদের দেহকে আরও সুন্দর করে তোলে।"

মালবিকা মজুমদার কোনো উত্তর দেয় না। "আমার এইরকম অবস্থা আরও কিছুদিন চলবে, মিসেস চাওলা। ফিগারের প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গিয়েছে।"

খুব বিরক্ত হলেন মিসেস চাওলা। "মিসেস মজুমদার, আপনারা কত লেখাপড়া শিখেছেন। আপনি যদি একথা বলেন তা হলে এই হতচ্ছাড়া শহরের 'হামটি-ডামটি' মহিলারা কী বলবেন? আপনাকে তো বলেছি, একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে মেয়েদের সৌন্দর্যচর্চার কোনো কারণ থাকে না—ইট ইজ অ্যান এণ্ড ইন ইটসেলফ। আর একটা কথা, মিসেস মজুমদার যদি কিছু না মনে করেন, ফিগারের প্রয়োজন মেয়েদের কোনো দিন ফুরোয় না।"

মালবিকা এবার বহু আশা নিয়ে করুণভাবে প্রশ্ন করলো "মিসেস চাওলা, সামান্য চেনার সুযোগ নিয়ে কেউ-কেউ মেয়েদের সঙ্গে কেন পশুর মতো ব্যবহার করে বলতে পারেন?"

আচমকা এই প্রশ্নের জন্যে মিসেস শকুন্তলা চাওলা প্রস্তুত ছিলেন না। মুখ বিকৃত করে তিনি বললেন, "ওসব কথা আলোচনা না-করাই ভাল। বড্ড নোংরা বিষয়, মিসেস মজুমদার। এই যে আমি স্বামীকে ত্যাগ করে চলে এসেছি কেন? ওই একই কারণ। কোর্টে ওর শাস্তি হয়ে গিয়েছিল।"

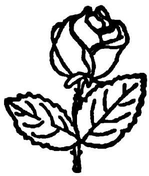
"কতদিন?" অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলো মালবিকা!

"দেড় বছর। মানসম্মান, চাকরি, ঘর-সংসার সব নষ্ট হলো।"

"আজ আমাকে ছেড়ে দিন, মিসেস চাওলা।" এবার ঝট করে উঠে পড়লো মালবিকা।

বাড়ি ফিরে এসেও কোনো শান্তি পাচ্ছে না মালবিকা। একটু পরেই খেয়াল হলো আজ শনিবার—এ-বি-সি ড্রাগস্-এর অফিস দুটোয় বন্ধ হবে।

না, অফিসের কাছাকাছি কোনো জায়গায় বিশাখা বিশ্বাসের সঙ্গে মালবিকার কথাবার্তা বলাটা ঠিক হবে না ; অন্য কর্মীদের নজরে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। ওইভাবে মানসম্মান হারানোর কোনো মানে হয় না।



হাওড়া খুরুট রোডে শ্যামাশ্রী সিনেমার কাছেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছে মালবিকা। ছোটোবেলার অস্পষ্ট স্মৃতি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এইখানেই বারীন ডাক্তারের বাড়ির সামনে ছিল মালবিকার বাড়ি। ওঁর এক ভাই দেশের জন্যে অনেকবার জেলে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক এখানকার ইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোসের পায়ের ধুলোও পড়তো এই বাড়িতে।

মালবিকার মনে হলো, হাওড়ার রাস্তাগুলো পুষ্টিহীনতা রোগে এই ক'বছরে আরও শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ছোটোবেলায় এই নেতাজী সুভাষ রোড যে অনেক বেশী চওড়া ছিল তা মালবিকা বাজি ধরে বলতে পারে। এখানকার কোনো বাড়িতে এই ক'বছরে যে এক পোঁচ রং পড়ে নি তা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। বিবেকানন্দ রোডের তকমা নিলেও নস্করপাড়া লেন সেই নস্করপাড়া লেনেই আছে, কোথাও একবিন্দু নবীনতার প্রমাণ নেই। শুধু মানুষ বেড়েছে অসংখ্য, সাইকেল রিক্‌শা ততোধিক। বাঙালীরা কী কয়েক পা হেঁটে বাড়ি ফিরবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে?

সাইকেল রিক্‌শায় বসে পুরনো কাসুন্দিয়া বালিকা বিদ্যালয়টা দেখে

নিলো মালবিকা। ওইখানে বিশাখা বিশ্বাসের মেজদিদি শ্যামলী পড়তো মালবিকার সঙ্গে। অতি সামান্য ঘটনা, কিন্তু শীর্ণ ওই সূত্রটুকু ধরে মালবিকাকে এগিয়ে আসতে হচ্ছে বিশাখা বিশ্বাসের সন্ধানে।

ধোপাপাড়া লেনের মুখে রিক্‌শা ছেড়ে দেবে ভাবছিল মালবিকা। কলকাতার অভিজাত পল্লীতে এবং বোম্বাইতে অনেকদিন যারা কাটিয়েছে তাদের কাছে এই সব অঞ্চল কোন দূর শতাব্দীর অবাস্তব ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয়। দুঃখসন্ধানী কোনো চলচ্চিত্রকারের লোকেশন সুটিং-এ ব্যবহৃত হবার জন্যেই যেন এরা দাঁড়িয়ে আছে—বিশ্বের মানুষের কাছে এই জনবসতির অন্য কোনো প্রয়োজন নেই।

১৯/৪ ধোপাপাড়া লেন নম্বরটার কোনো অর্থ হয় না। নম্বর দেখে এখানে কোনো বাড়ি কখনও কেউ খুঁজে বার করে নি। তবে পার্টির নামটা শুনেই রিক্‌শাওয়ালা বললো, "পটলার ছোটপিসী মনে হচ্ছে। এক মিনিট, এক মিনিট"। ব্রেক কষলো রিক্‌শাওয়ালা? "এই পটলা, তোর পিসীমার নাম তো বিশাখা বিশ্বাস?"

ছেলেটি রিক্‌শার কাছে এগিয়ে এলো। "পিসীমার বাপের বাড়ি এটা। ছোট পিসীমা তো এখানে থাকে না। সেবার মা-বাবার সঙ্গে খুব ঝগড়া হলো না? কখনও-সখনও আসে। ছোট পিসী বোধহয় এখন এখানে থাকে...."। এই বলে বেলেঘাটার একটা বাই লেনের ঠিকানা দিয়ে দিলো ছেলেটা।

মেয়েমানুষ দেখেই ছেলেটার মনে বোধ হয় কোনো সন্দেহ হয় নি। "মেজপিসী?" মেজপিসীর কথায় আকাশ থেকে পড়লো পটলা। "শ্যামলী দাসের কথা তো বলেছেন আপনি? তিনি তো বিধবা, ছোট পিসীমা ওঁর কাছেই থাকে।" ছেলেটা কেমন সহজভাবে বলে গেলো।

"তোমার ছোট পিসী কবে কবে আসেন?" রিক্‌শায় বসে থেকে জানতে চাইলো মালবিকা।

ছেলেটি ধরে নিয়েছে রিক্‌শার যাত্রী ছোট পিসীর কোনো হারিয়ে যাওয়া বান্ধবী। সে বললো, "শনিবারেই তো আসে পিসী, চিঠির খোঁজে।"

"কিছু বলতে হবে?" জিজ্ঞেস করে ছেলেটি।

উত্তরটা কোনো রকমে এড়িয়ে মালবিকা ফিরে চললো শ্যামাশ্রী খুরুটের সংযোগস্থলে।

শ্যামাশ্রীর মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। বাস ধরবার জন্য রাস্তা পেরোতে গিয়ে হঠাৎ নজর পড়লো বিশাখা বিশ্বাসের দিকে। মালবিকা দেখলো, রামরাজাতলার বাস থেকে নেমে নীল শাড়িপরা বিশাখা নস্করপাড়ার দিকে আসছে।

বিশাখা বিশ্বাসের খুব কাছে এগিয়ে এসেছে মালবিকা। কিন্তু কালো চশমার আড়ালে লুকানো চোখ দুটো তাকে দেখেও দেখছে না।

রাগ করবে না মালবিকা। ভাগ্যচক্রে এই মেয়েই দু'দিন তার বাড়ি থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। মালবিকা কী করে জানবে যে এমন হবে? নইলে কে বলতো, অফিসের কথা অফিসে আলোচনা করবেন, বাড়িতে নয়।

সেসব প্রসঙ্গ পিছনে ফেলে রেখে মালবিকা এখন নতুন এক পরিচ্ছেদ খুলতে চায়। তার একটামাত্র প্রশ্ন। মালবিকা জানতে চায় মনোময় সত্যিই দোষী কিনা? এই ছোট্ট প্রশ্নটার সঠিক উত্তর জোগাড় করতে পারলেই সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হবে মালবিকার—যে যন্ত্রণা এই ক'মাস ধরে তার অসহায় শরীর ও মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

চলমান বিশাখা বিশ্বাসের দিকে আলতো একটা নমস্কার ছুঁড়ে দিলো মালবিকা। কালো চশমার নায়িকা এবার মুখ তুলেছে, কিন্তু মুখে এখনও কোনো পরিবর্তন নেই।

বিশাখা বিশ্বাস কি বুঝতে পারছে না, কে তাকে নমস্কার করছে? মালবিকার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কোনো উপায় তো নেই।

মালবিকা এবার বলে উঠলো, "আপনার মেজদি যে আমার সঙ্গে পড়তো সে-কথা তো আমাকে সেদিন বলেন নি।"

মালবিকা ভেবেছিল এবার কথা চালানোর সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এবং তখন সুযোগ বুঝে চোখের জলে প্রকৃত সত্যটা বিশাখার কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে নেবে সে—একজন মেয়ে এ ব্যাপারে অবশ্যই আর একজন

মেয়ের কাছে কিছু প্রত্যাশা করতে পারে।

কিন্তু বিষাক্ত সর্পিণীর মতো ফোঁস করে উঠলো বিশাখা বিশ্বাস। ভীষণ রেগে সে বললো, "এইখানে আমাকে ধাওয়া করেছেন?"

ব্যাঙ্গের বিষ এবং বিজয়িনীর উল্লাস ছড়িয়ে পড়ছে বিশাখা বিশ্বাসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে উঠলো, "এখন কেন বিশাখার খোঁজ পড়লো? পয়সার টোপ ফেলে মিটমাটের লোভ দেখাতে এসেছেন?"

"না, মামলা তুলে নেবার অনুরোধ জানাতে...."

মালবিকার কথা শেষ করতে দিলো না বিশাখা বিশ্বাস। ঝট করে শুনিয়ে দিলো, "এইবার এসে আমার পায়ে ধরবেন আপনি।"

চলমান বিশাখার সঙ্গে তাল রেখে অসহায়ভাবে এগিয়ে চলেছে মালবিকা। সে বলছে, "আমি ওসবের জন্যে আসি নি। আমি শুধু জানতে চাইছি।"

গর্বিণী বিশাখা বিশ্বাস ফোঁস করে উঠলো, "কলকাতার অফিসের সায়েবরা কী জানেন না? জানোয়ার, জানোয়ার। সরে যান, সরে যান—আদালতের কথা আদালতে হবে। এই মুহূর্তে সরে না গেলে আমি লোক ডাকবো। জেনে রাখবেন, লাখ টাকার লোভ দেখালেও লাভ নেই, আপনার স্বামীকে জেলে পাঠাবোই।"

অসহ্য অপমানে সমস্ত দেহটা জ্বলছে মালবিকার। টাকা দিয়ে মিটমাটের কথাটা উঠতেই বিষয়টা একেবারে বিষাক্ত হয়ে উঠে আয়ত্তের বাইরে চলে গেলো।

যে-রিক্শাওয়ালা মালবিকাকে ধোপাপাড়া লেন থেকে ঘুরিয়ে এনেছে সে দূর থেকে সব দেখেছে। বিশাখা চলে যেতে মালবিকার কাছে এগিয়ে এসে সে জানতে চাইলো, "কী হলো দিদিমণি? আর কোথাও যাবেন?"

দিদিমণির মুখে কোনো উত্তর আসছে না। অনেক কষ্টে চোখের জল চাপা রয়েছে। রিক্শাওয়ালা বলে উঠলো, "মেয়েটা ভাল নয়, দিদিমণি। বাজারে অনেক বদনাম।"

কী বদনাম? কেন বদনাম? একজন শিক্ষিতা মহিলা এসব নিয়ে

অচেনা রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে আলোচনা করে না। কিন্তু উপায় নেই।

ওই রিক্‌শাতেই আবার চড়ে বসেছে মালবিকা। "চলো। মল্লিকফটক পৌঁছে দাও। ওখান থেকে বাস ধরবো।"

ঠেলাগাড়ি, পথচারী এবং রিক্‌শার ভিড় কাটিয়ে এগোতে এগোতে রিক্‌শাওয়ালা বললো, "মোটেই ভাল মেয়ে নয়। নইলে মা এবং দাদা আলাদা করে দেবে কেন?"

"বিয়েও তো হয়েছিল, কিন্তু বরের অসুখ ছিল বলে ঘর করলো না। আমি তো ওই পাড়াতেই থাকি। খুব ঝগড়া হতো মাঝে-মাঝে। মা শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বলতো আর ওই মেয়ে কিছুতেই রাজী হতো না। পটলের ছোট পিসীর সে কি গলা! রোগ চেপে রেখে বিয়ে করেছে, কিছুতেই ঘর করবো না। খুব ফোঁস আছে, দিদিমণি। এখনও বাড়িতে খুব ঝগড়া হয়।"

মরিয়া হয়ে উঠেছে মালবিকা। মনোময় এবং বিশাখা কাউকেই সে সহ্য করতে পারছে না। নির্জনে বসে জ্বলে পুড়ে মরা ছাড়া আর কী পথ আছে?

এদিকে মামলার মেঘও ঘনিয়ে আসছে। দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রথম বলেছিলেন,"যতদিন পারা যায় দেরি করানো যাক। থার্ড ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁর কোর্টে কেসটা রয়েছে, লোকটা একটু বেয়াড়া। আসামীকে জেলে পাঠাতে পারলে খুব মানসিক সুখ পান। মেয়েমানুষ সংক্রান্ত মামলা হলে তা কথাই নেই। ওর ধারণা পৃথিবীর সব মেয়ে অপাপবিদ্ধ, যত দোষ পুরুষমানুষের।"

কিন্তু কোনো অলক্ষ্য তদ্বিরে মামলাটা হুড় হুড় করে এগিয়ে আসছে। পুলিসের মিঃ শিকদার খুব কাজ দেখাচ্ছেন!

দেবপ্রসাদ সন্দেহ করছেন, এর পিছনে অফিসের কোনো দলের

ষড়যন্ত্র আছে। কোনো পাপচক্র মরিয়া হয়ে উঠেছে মনোময়কে বিদায় করবার জন্যে।

মনোময় এবং দেবপ্রসাদের মধ্যে প্রায়ই কথা হয়। টেলিফোনে যীশুখ্রীষ্টের স্টাইলে পবিত্রতার প্রতীক মনোময় তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সমস্ত বিবরণ দিয়ে যায়—আর দেবপ্রসাদ তা শুনে যান।

"ওই যে চট্টরাজ, যাকে আমি ইনোসেণ্ট ভাবতাম, এখন তাকেও সন্দেহ করি, মিস্টার রায়চৌধুরী। আমার কাছে উড়ো চিঠি এসেছে, ওই মেয়েটা চট্টরাজেরই এজেণ্ট।"

মনোময়ের কথা শুনলে গা জ্বলে যায় মালবিকার। "চট্টরাজের এজেণ্ট টোপ ফেললো, আর তুমি বোকার মতো তা গিলে ফেললে! তোমার স্বভাবটা প্রকাশ পেয়ে গেলো।" বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মালবিকা নিজের মনেই ভেবে যায়।

"উড়ো চিঠিটা কি পুলিসের কাছে পাঠিয়ে দেবো?" টেলিফোনে দেবপ্রসাদের উপদেশ চাইছে মনোময়।

ওদিক থেকে বোধহয় প্রবল আপত্তি জানালেন দেবপ্রসাদবাবু। মনোময় বোকার মতো বলছে, "ঠিকই তো, পুলিসের হাতে আগাম এসব খবর তুলে দিলে আমাদেরই লোকসান। পুলিস যে ওদের হয়েই কাজ করছে তা তো বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

যে-মনোময় অফিসের কাজ ছাড়া টেলিফোনে দু'একটার বেশী কথা বলার পক্ষপাতী নয়, সে কেমন পনেরো মিনিট ধরে দেবপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। "মিস্টার রায়চৌধুরী, আমাকে এখান থেকে সরাতে পারলে চট্টরাজ খুবই লাভবান হবে। ওর শালার ট্রান্সপোর্টের কনট্রাক্ট আমি অর্ধেক করে দিয়েছি। যে রেটে কোম্পানি ভাড়া গুনছে তার অর্ধেক দামে লরি পাওয়া যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। আমি ভিজিল্যান্সকে খবর দিয়েছি গোপনে অনুসন্ধানের জন্য। আরও জানতে চেয়েছি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অংশীদার কারা? যদি মিসেস চট্টরাজ ওতে জড়িয়ে থাকেন—তা হলে এই কোম্পানির সঙ্গে এ-বি-সি ড্রাগসের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সমস্ত বিজনেসটাই ওরা হারাবে।"

দেবপ্রসাদবাবু এরপর যা বললেন তাতে মনোময় খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছে যেন। মালবিকা শুনতে পাচ্ছে মনোময়ের কথা ; "আপনি বলছেন, আসল মামলায় এসব পয়েন্ট কোনো কাজ দেবে না? থার্ড ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারের প্রশ্নটা খুবই ছোট্ট। মনোময় মজুমদার ১৫ই ডিসেম্বর তার অফিস ঘরে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ বিশাখা বিশ্বাসের সঙ্গে একলা ছিল কিনা এবং থাকলে ওই ঘরে সে বিশাখা বিশ্বাসের শরীরে হাত দিয়ে তার শালীনতাহানি করেছিল কিনা?"

হঠাৎ টেলিফোনে মনোময় আমতা আমতা করছে কেন? মনোময় বলছে, "অভিযোগ তো ফ্রেম হয়ে গিয়েছে। কাগজপত্তরও তো আসামীকে দেওয়া হয়েছে, এখন কেবল সাক্ষী নেওয়া এবং বিচার শেষ করা ছাড়া কোনো কাজ বাকি নেই ; আপনি বলছেন?"

দেবপ্রসাদ আরও কি বললেন তা কানে এলো না মালবিকার। ওসব কথা শুনবারও রুচি নেই মালবিকার—এই ক'মাস তো যা প্রয়োজন তার থেকে একটাও বেশী কথা সে বলে নি। একসঙ্গে থেকেও ওরা দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা।

মনোময়ের গলা শোনা গেলো আবার। "হ্যালো, হ্যালো, মিস্টার রায়চৌধুরী, মনে হচ্ছে অন্য টেলিফোন লাইনে এসে গিয়েছে।' আপনি কানেকশানটা কেটে দিন, আমি আবার ডায়াল করছি।"

বন্ধ্যা ডায়ালটা প্রাণপণে ঘুরিয়ে যাচ্ছে মনোময়। এইসব উদ্বেগের মঙ্গে মালবিকার কোনো সম্পর্ক নেই—সে একখানা রঙিন ম্যাগাজিনের আড়ালে মুখখানা লুকিয়ে মড়ার মতো শুয়ে আছে।

টেলিফোনের ডায়াল ঘুরছে তো ঘুরছেই—আর মনোময়ের জেদ বেড়ে যাচ্ছে। "হ্যালো, হ্যালো, মিস্টার রায়চৌধুরী, অনেক কষ্টে আপনাকে আবার পেয়েছি। আমার জন্যে আপনাকে অনেক ভোগান্তি সহ্য করতে হচ্ছে, আমি খুব দুঃখিত। এমন যে কখনও হতে পারে আমি ভাবি নি। এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, মিস্টার রায়চৌধুরী। স্ত্রীকে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছিলাম, মোটামুটি সাকসেসফুল। কোম্পানি ম্যানেজার, আমি যা স্পর্শ-করতাম তাই সোনা হয়ে যাচ্ছিল।

মনোময় কি কথাগুলো মালবিকাকেই শোনাতে চাইছে? কিন্তু মালবিকা তো বুঝিয়ে দিয়েছে, নিজের কর্মফল নিজেকে ভোগ করতে হবে।

টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে দেবপ্রসাদ কী যেন উত্তর দিলেন! মনোময় বললো, "সোমবার সকাল থেকেই ট্রায়াল? আমি তাহলে তিন-চারদিন ছুটি নিয়ে নিই। পুলিস একের পর এক সাক্ষী হাজির করবে—ইনক্লুডিং এই বিশাখা বিশ্বাস। সাক্ষীদের আপনিও পরের পর জেরা করে যাবেন। তারপর আপনাদের সওয়াল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের রায়।

"হ্যালো, কী বললেন আপনি? সেকশন ২৪২ অফ দ্য ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর কোড? তার মানে কী? ইচ্ছে করলে প্রধান অভিযোগ-কারিণীকে আপনি সবার শেষে জেরা করতে পারেন, আদালতের অনুমতি নিয়ে, ইন দি ইনটারেস্টে অফ জাস্টিস? বলতে হবে, সুবিচারের স্বার্থেই আপনি অভিযোগকারিণীকে সবার শেষে জেরা করবেন।"

উকিল ও আসামীর মধ্যে আরও আলোচনা হচ্ছে। আর মালবিকা কেবল ভাবছে, মনোময় কি সত্যিই এমন কাজ করতে পারে? অসহায় একটা মেয়েকে একলা ঘরের মধ্যে পেয়ে...না আর চিন্তা করতে পারছে না মালবিকা।

এদিকে সাক্ষী সম্বন্ধে উকিল ও আসামীর মধ্যে বিস্তারিত মত বিনিময় হচ্ছে। মনোময় বলছে, "তা হলে বিশাখা বিশ্বাসের পরেই ইমপর্ট্যান্ট সাক্ষী হচ্ছে ওই মিস্টার ধীরেন বিশ্বাস। যিনি অ্যাক্সিডেন্টালি সেদিন অফিসে গিয়েছিলেন বিশাখাকে নেবার জন্যে। মিস্টার চট্টরাজের এভিডেন্সের ওপর আপনি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না? আপনারা ধারণা, ধরি তো মাছ না ছুঁই পানির পলিসি নিয়েছেন চট্টরাজ। ওঁর টেলিফোন থেকেই পুলিসে প্রথম খবরটা গিয়েছে। কিন্তু উনি নিজে কোনো অভিযোগ করেন নি। শুধু মিস্টার শিকদারকে বলেছেন, এই অফিসের মহিলাকর্মী সিরিয়াস ব্যাপারে থানার কর্তব্যরত অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চান?"

মনোময়ের গলায় স্বরে এখন যথেষ্ট উদ্বেগ। "হ্যালো, হ্যালো, মিস্টার রায়চৌধুরী, আমি বিকেলেই তাহলে আপনার চেম্বারে যাচ্ছি। আপনি বলছেন, শিকদারের সাক্ষ্যও ইমপর্টান্ট। কারণ 'অ্যালেজ্‌ড' ঘটনার চল্লিশ মিনিটের মধ্যে উনি ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিলেন। আপনি বলছেন, জেরাতে এই বিষয়ে আপনি শিকদারকে চেপে ধরবেন। দিনদুপুরে খুন হলেও যে-শহরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিসের টিকি দেখতে পাওয়া যায় না, সেখানে একটা প্রাইভেট ফোন কল পেয়ে পুলিসবাহিনী নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি কেমন করে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন?"

মালবিকা বুঝছে মনোময় এবার বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। "হ্যালো মিস্টার রায়চৌধুরী, আমি বিজনেস ম্যানেজমেন্টের লোক, আইনের কিছুই বুঝি না। সাক্ষীদের কীভাবে জেরা করে আপনি কী খবর বের করবেন তা এখনও আমার কল্পনার বাইরে। আমি প্রমীলা বাগচীর ফাইলটা পড়েছি। কিন্তু ওখানে জেরার পর্যায়ে এলো না কেসটা। তার আগেই তো প্রমীলা বাগচী মামলা তুলে নিলো।"

"হ্যালো, মিস্টার রায়চৌধুরী, প্রমীলা বাগচী শেষ মুহূর্তে কেন অভিযোগ তুলে নিলো? রহস্যটা কী?...ও বুঝেছি, টেলিফোনে ওসব আলোচনা করা যায় না...দেখা হলে বলবেন, আদালতেই অনেক দালাল ঘুরে বেড়ায় এই ধরনের কেসে...তারা মোটা টাকার বদলে প্রাইভেটে মিটমাটের ব্যবস্থা করে ফেলে...তাদের অদৃশ্য প্রচেষ্টায় অভিযোগকারিণী যথাসময়ে আদালতকে জানিয়ে দেয় সে আর সাক্ষী দেবে না। ওক্ষেত্রে তো আসামীর স্ত্রী নিজেই ছোটাছুটি করছিলেন।...ঠিক আছে আমি তো যাচ্ছি, তখন কথা হবে।"

মামলাটা নিয়মিত শুরু হলে খবরের কাগজে দৈনন্দিন প্রচার আটকানো যাবে না। তখন মিসেস শকুন্তলা চাওলার ফিগার সেন্টারেও মালবিকা মানসম্মান নিয়ে ঢুকতে পারবে না।

উপায় থাকলে মালবিকা এই সময় কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোথাও পালাতো—যেখানে কেউ তাকে চেনে না ; অপরের বিষয় নিয়ে যেখানে কেউ অহেতুক মাথা ঘামায় না। কিন্তু কোনো উপায় নেই ; এইখানে বেঁধে মার খেতে হবে মালবিকাকে।

বিশাখা বিশ্বাস বোধ হয় মালবিকার অসহায় অবস্থাটা জানে ; তাই সে প্রকাশ্য রাজপথে অমন দুর্বিনীত হতে পারলো। ওর কথাগুলো এখনও জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে মালবিকার দেহে। এতোটা সহ্য করা কিছুতেই উচিত নয়। মেয়েটা ভেবেছ কী ?

বিশাখার মেজদি শ্যামলীর মুখটা এতোদিনে কিছুটা স্মরণ করতে পারছে মালবিকা। ফ্রকপরা একটা শীর্ণ শ্যামবর্ণা বালিকার ছবি অনেক অনুসন্ধানের পর মনের মধ্যে ধরা পড়েছে। সেই রোগা কালো বিষণ্ণ মেয়েটি সময়ের ব্যবধানে বিশাখার মধ্যবয়সিনী বিধবা দিদিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রথম রাউণ্ডে বিশাখা অবশ্যই জিতেছে—যে তাকে একদিন লিভিং রুম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে সে অপমান করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবে না মালবিকা।

বেলেঘাটা সেকেণ্ড বাই লেনের ঠিকানাটা মালবিকাকে হাতছানি দিচ্ছে। ওখানে ছোটোবেলার বান্ধবী শ্যামলীর সঙ্গেও কথা বলতে চায় মালবিকা—সে হয়তো আসল ব্যাপারটা জানলেও জানতে পারে। বিশাখার ব্যবহার মালবিকাকে কষ্ট দিয়েছে। মনোময়ের স্ত্রী সমস্ত লজ্জার

মাথা খেয়ে কেন দেখা করতে এলো তা না বুঝে সে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরলো। মেয়েটা কী করে ভাবলো টাকার লোভ দেখানের জন্যে একজন সুস্থরুচির মহিলা নস্করপাড়া লেন পর্যন্ত ছুটে আসতে পারে ?

ফিগার সেন্টারের মিসেস চাওলা দেখলেন তাঁর রেগুলার মেম্বার মালবিকা মজুমদার আজ তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

"মিসেস মজুমদার, তড়িঘড়ি করলে দেহ সুন্দর হয় না। অতিমাত্রায় ব্যস্ততা সৌন্দর্যের শত্রু" মিসেস চাওলা সাবধান করে দিলেন। কিন্তু মালবিকা আজ কোনো কথা শুনতে চাইলো না।

ইতিহাস ভূগোলের কত অসংখ্য দিকচিহ্ন পেরিয়ে অবশেষে বেলেঘাটা পৌছানো গেলো। কলকাতার বহুনিন্দিত ট্যাক্সি ড্রাইভার সত্যি তুলনাহীন, মাত্র একটি কথায় হলদে-কালো গাড়ির সারথী এই বেলেঘাটাকে খুঁজে দিয়েছে।

হা ঈশ্বর ! কলকাতা শহরে কত গলিঘুঁজির সৃষ্টি করেছো তুমি ? পৃথিবীর আর কোনো শহরে এতো বিচিত্র এবং অসম্ভব রাস্তা আছে বলে মনে হয় না। এতো রাস্তার খবর কর্পোরেশনের খাতাতে লেখা আছে ভাবতে বিস্ময় লাগে।

মূল বেলেঘাটায় প্রায় আধঘণ্টা পাক খেয়ে অবশেষে বেলেঘাটা লেনের খবর পাওয়া গেলো। এবার সেকেণ্ড বাই লেনটা খুঁজে বের করতে হবে। এ সব রাস্তায় রিক্‌শাও ঢুকতে পারবে না।

এ অঞ্চলের কলকাতা এখনও ভরদুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেয়। ঝাঁপ ফেলে দোকানপাটের মালিক ও কর্মচারী অনেকেই এইসময় বাড়ি ফিরছেন। মুদিখানা, স্টেশনারি, ডাইংক্লিনিং, চুল ছাঁটাই সেলুন কোথাও এখন খরিদ্দার নেই। রাজজ্যোতিষী হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষরত্নও তাঁর কার্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে কিছুক্ষণের জন্য বাড়ি ফেরবার মনস্থ করেছিলেন।

এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে মালবিকার দৃষ্টি অবশেষে হরেন্দ্রনাথের তান্ত্রিক কার্যালয়ের দিকেই নিবদ্ধ হয়েছিল। হরেন্দ্রনাথ, 'হোরারী

এস্ট্রোলজির দ্বারা অভ্রান্ত গণনা' ছাড়াও টুকিটাকি অনেক কিছু করেন—যেমন বিবাহের যোগাযোগ, স্বল্প সঞ্চয় সংস্থা 'তুলনাহীন সেভিংস'-এর এজেন্সী, 'বিবাহের জন্য বাড়িভাড়া ; এখানে যোগাযোগ করুন'—তান্ত্রিক কার্যালয়ের এই সাইনবোর্ডগুলো পথচারীর নজর এড়ায় না।

অনেক ঘুরে-ঘুরে মালবিকা অবশেষে হরেন্দ্রনাথের কার্যালয়েই ঢুকে পড়েছে।

"বেলেঘাটা সেকেণ্ড বাই লেন ? এখন তো নাম পালটে হয়েছে বীর বিপ্লবী উমাপতি হালদার ফার্স্ট লেন। ১৩/৭ কী নাম বলুন তো ?" এ-অঞ্চলের সমস্ত লোকের নাড়িনক্ষত্র জানা হরেন্দ্রনাথের।

"বিধবা ভদ্রমহিলা—১৩/৭—শ্যামলী।" মালবিকার কথা থেকেই হরেন্দ্রনাথ আন্দাজ করে নিলেন পুরনো কোনো পরিচিতের খোঁজেই বাইরে থেকে এসেছেন এই সুবেশিনী সুন্দরী।

নিজেদের নামে এ-অঞ্চলের বাঙালী বিধবারা কেউ পরিচিত হন না। তাঁদের পরিচয় অমুকের মা, তমুকের দিদি কিংবা মাসী বলে !

"১৩/৭, শ্যামলী," বিড়বিড় করতে লাগলেন হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষরত্ন। "ও রকম কেউ ও-গলিতে থাকে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

মালবিকার ঘামে ভেজা মুখে ক্লান্তি এবং হতাশার ছায়া ফুটে উঠেছে দেখে হরেন্দ্রনাথের মনে দয়ার উদ্রেক হলো। খুবই প্রয়োজন নিশ্চয়—না-হলে এই ভরদুপুরে কোনো অভিজাত পরিবারের বধূ কেন এই বেলেঘাটায় উমাপতি হালদার লেনে ছুটে আসবেন ?

চোখ বুঁজে ভেবেই চলেছেন রাজজ্যোতিষী হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষরত্ন। চোখ খুলে হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "এঁর এক বোন এধার ওধার চাকরি-বাকরি করে ? গত বছরে সুইসাইডের চেষ্টা করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল ?"

শরীরের মধ্যে শিহরণ খেলে যাচ্ছে মালবিকার। "বোনের নাম বিশাখা !"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ধরনের কী একটা নাম। কিন্তু ওরা তো গতবারের ঐ কেলেংকারির পরে এ পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

হাসপাতাল। সুইসাইড। বিশাখা বিশ্বাস হঠাৎ যেন বেশ রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। মালবিকা ব্যাপারটাকে কিছুতেই এই অবস্থায় ছেড়ে চলে আসতে পারছে না।

কিন্তু বিশাখা বিশ্বাস এখান থেকে উঠে কোথায় গিয়েছে তা হরেন্দ্রনাথ জানেন না। তবে সময় পেলে খুঁজে বের করাও খুব শক্ত হবে না।

ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা স্লিপ বের করে ফেলেছে মালবিকা। "আমার নিজের কোষ্ঠী প্রয়োজন। এই আমার জন্মসময়। আমার স্বামীরও একটা ছক করাতে হবে। আর প্রয়োজন বিশাখার এখনকার ঠিকানা। আর চাই...."

"আর কী চাই বলুন ?" নগদ দু'খানা কোষ্ঠীর অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনায় আরও নরম হয়ে পড়েছেন অনটনক্লিষ্ট হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষরত্ন।

ঐ হাসপাতালের সুইসাইডের ব্যাপারটা জানতে চাই। যতটা জানা সম্ভব।" মালবিকা সুযোগ বুঝে হরেন্দ্রনাথকে শান্তভাবে অনুরোধ করলো।

আত্মপ্রত্যয়ের হাসি ফুটে উঠলো পঁয়ষট্টি বছরের রাজজ্যোতিষির মুখে। "ও ব্যাপারে একটুও অসুবিধে নেই। ব্যাপারটা থানায় গিয়েছিল এবং ভগবানের আশীবাদে এখানকার থানায় আমার ভালই জানাশোনা রয়েছে। সেপাই থেকে আরম্ভ করে ও-সি পর্যন্ত প্রত্যেকের ভাগ্যগণনা এখানেই হয়।"

ততক্ষণে মালবিকার হাত থেকে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে এসেছে হরেন্দ্রনাথের দিকে। নিজের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরটা জানিয়ে দিয়েছে মালবিকা।

"আমার খুবই জরুরী দরকার" এবার মালবিকা করুণভাবে তাকিয়েছে রাজজ্যোতিষী হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষরত্নের দিকে।"

"ওই হাসপাতালের ব্যাপারটা আমার ভালভাবেই মনে আছে—থানার মেজবাবু নিজে তখন এসেছিলেন এই কার্যালয়ে খোঁজখবর করতে। আমি আপনাকে হাঁড়ির খবর দিয়ে দেবো, কিছু ভাববেন না।" আশ্বাস দিলেন হরেন্দ্রনাথ।

টাকমাথা গোঁফওয়ালা বিশীর্ণ হরেন্দ্রনাথের এই নির্জন কার্যালয় যেন রহস্যলহরী উপন্যাসের পাতা থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে। ভদ্রলোক যে ইচ্ছে করলে অনেক কিছু জানাতে পারেন সে বিষয়ে মালবিকার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আরও কাজ আরও টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললো সে।

পুরো সপ্তাহটা খুব খারাপ গিয়েছে। কিছু বাড়তি রোজগারের আশায় হরেন্দ্রনাথ তৎপর হয়ে উঠলেন। "খবরই যদি জোগাড় করতে না পারবো তা হলে এখানে সারাক্ষণ ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছি কেন ? পুলিসের সেবা করি, কিন্তু ওরা যা পেমেন্ট করে তাতে পেট চলা তো দূরের কথা চায়ের খরচও ওঠে না। ওরা খবরও তেমন পায় ! কিন্তু আপনার ব্যাপারটা আলাদা। কোনো চিন্তা করবেন না, পরের দিনই সব খবর পেয়ে যাবেন।"

মালবিকার মনে পড়লো মামলা শুরু হওয়ার দিন খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। তার আগেই একবার বিশাখার মেজদির সঙ্গে মোলাকাত হওয়া প্রয়োজন।

বাড়ি এসে মালবিকার একটা দিন নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কেঁটে গেলো। বেলেঘাটা তান্ত্রিক কার্যালয় থেকে কোনো খবর নেই। পঞ্চাশটা টাকা জলেই গেলো বোধ হয়। মানুষ চেনার কোনো ক্ষমতা নেই তার, মালবিকা ভাবে ! থাকলে মনোময়কে সে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করবে কেন ?

মনোময় আজ সারাদিন উকিলবাড়িতে ছোটাছুটি করেছে। মণিদীপা একবার ফোন করেছিল। "মালবিকা, তুই ২১শে এপ্রিল আদালতে যাবার কথা ভাবছিস ?"

কোনো উত্তর দিচ্ছে না মালবিকা। যে-প্রশ্নের সে সন্ধান করে চলেছে তার উত্তর যে আজও মেলেনি। প্রতি মুহূর্তে সংশয়ের দোলায় দুলছে মালবিকা। এক-একবার মনে হচ্ছে, মনোময় এমন কাজ করতে পারে না। আবার মনে হচ্ছে, ভদ্র অফিসের একটা সাধারণ মেয়ে কেন শুধু-শুধু এমন অভিযোগ আনবে? মনোময় যদি সত্যিই অপরাধী হয়, তা-হলে কোন দুঃখে মালবিকা আদালতে উপস্থিত থাকবে?

মণিদীপা বললো, "আমি আর কর্তা সব সময় তোর কথা ভাবছি। উনি বলছিলেন, আদালতে লজ্জাসরমের বালাই নেই। পুলিস, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট কে কী প্রশ্ন করবে এবং সাক্ষীরা, বিশেষ করে ওই মেয়েটা, কী উত্তর দেবে তার ঠিক নেই। অভিযোগের প্রত্যেকটি দৃশ্যের ধারাবাহিক বিবরণ....তোর মনের ওপর খুব চাপ পড়বে, মালবিকা। আমি তো কর্তাকে বলেছি, মালবিকাকে আমি জানি, এমনিতেই জ্বলেপুড়ে মরছে বেচারা, ওকে আর আদালতে যেতে বোলো না।"

মণিদীপা যা বলছে না, তা হলো মনোময়কে ওরা আসামীর কাঠগড়ায় পুরে রাখবে—সে দৃশ্য কষ্ট দেবে মালবিকাকে!

মালবিকা কখনও আদালত দেখে নি। "হ্যাঁরে, ওরা ওকে জেরা করবে?" মালবিকা তার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারছে না। "ও তখন কী করেছিল তা ওকে সবার সামনে বলতে হবে?"

মণিদীপা আশ্বাস দিলো, "আসামীর জেরা নেই, মালবিকা। ম্যাজিস্ট্রেট শুধু জিজ্ঞেস করবেন সে দোষী কিনা। অন্য সাক্ষীদের প্রথমে পরীক্ষা করবেন সরকারী উকিল, তারপর জেরা করবেন উনি। রেপ, শালীনতাহানি—এসবের প্রশ্ন এবং জেরা বড্ড নোংরা হয়। কিন্তু উনি বলেন, উপায় কী? ঘটনাস্থলে তো দু'জন ছাড়া কেউ উপস্থিত থাকে না; সুতরাং কী অবস্থায় ব্যাপারটা ঘটেছিল ভুক্তভোগীর সেই বিবরণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করতে হয়। যে অভিযোগ করছে তার কথাবার্তা কতোখানি বিশ্বাসযোগ্য তার ওপরেই নির্ভর করছে আদালতের রায় এবং আসামীর ভাগ্য।"

বেঁচে গিয়েছে মালবিকা। সে কিছুতেই অন্য সকলের সঙ্গে কোর্টে

বসে বিশাখার কথাবার্তা শুনতে, আর কাঠগোড়ায় বন্দী মনোময়কে দেখতে পারতো না।

কত দিন আর এই অত্যাচার সহ্য করতে হবে কে জানে? ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে মালবিকা দেখলো আজ ২০শে এপ্রিল। তিনদিন পরে বৈশাখের এমনই এক লগ্নে মনোময়ের সঙ্গে মালাবদল হয়েছিল তার। তারপর ওই ২৩শে এপ্রিল নানা সুখে পল্লবিত হয়ে কতবার ফিরে এসেছে তাদের জীবনে; বাবা প্রতিবার আশীর্বাদ জানিয়েছেন, 'বিধাতা করুন এদিন আবার ফিরিয়া আসুক বারবার।' কিন্তু এই প্রথম ২৩শে এপ্রিল পুষ্পশোভিত হয়ে ফিরবে না; বিবাহের শুভলগ্ন সংশয় এবং সন্দেহের আগুনে পুড়ে ঝামা হয়ে থাকবে।

২১শে এপ্রিল এগারোটা বাজবার একটু পরে থার্ড ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে মামলা শুরু হয়েছে। মালবিকা কল্পনা করতে পারছে, ঐ ঘর উৎসুক দর্শকের ভীড়ে ভেঙে পড়বার অবস্থা। খোদ কলকাতায় আপিসঘরের মধ্যে যুবতী নারীর শালীনতাহানির এই ঘটনা এখনও যে ঘটতে পারে তা অনেকে ভাবতে পারছে না। কেউ কেউ বলছে, উঁচু মহলের মানুষদের লোভ ও সাহস দুই বেড়ে যাচ্ছে। ওদের ধারণা দরিদ্র কলকাতার গেরস্ত মেয়েদের মানসম্মানের কোনো মূল্য নেই। যখন খুশি তাদের দিকে হাত বাড়ালেই হলো।

একটা অচেনা লোক উড়ো টেলিফোন করে কষ্ট দিয়েছে মালবিকাকে। "হ্যালো, মিসেস মজুমদার। আপনি এখন বাড়িতে। পালা শুনতে গেলেন না"?

"কীসের পালা?" বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছে মালবিকা।

"কেন আপনাকে নেমন্তন্ন পাঠায় নি ওরা? থার্ড ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালা?" লোকটা খিলখিল করে হাসছে। "আপনার স্বামী মনোময় মজুমদার, ম্যানেজমেন্ট এবং বস্ত্রহরণ দুটোতেই দারুণ এক্সপার্ট।"

"প্লিজ! আমাকে আর জ্বালাবেন না," কাতর অনুনয় করছে মালবিকা। কিন্তু অচেনা লোকটার কুৎসিত হাসিতে ফোনটা ভরে

উঠেছে।

"আপনি তো টাকার বাণ্ডিল নিয়ে গিয়েছিলেন ধোপাপাড়ায় । ভেবেছিলেন, কিছু পয়সা ছাড়লেই ইজ্জতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।" লোকটা খিলখিল করে হাসছে।

শরীর শিউরে উঠছে মালবিকার। লোকটা কে ? কতটা খবর পেয়েছে সে ? "প্লিজ, আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। টাকার বাণ্ডিল নিয়ে আমি কোথাও যাই নি ! শুনুন, আমিও মেয়েমানুষ।"

লোকটা তখনও হাসছে। "ওই পাঁঠাকে বলবেন, মেয়েমানুষের ইজ্জত নষ্ট করে এ-শহরে এখন টিকে থাকা যায় না। এটা বম্বে নয়।"

"কে ! কে আপনি ? আপনার নাম বলছেন না কেন ?" মালবিকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।

"দু-তিনদিনের মধ্যে কোমরে দড়ি পরিয়ে আপনার পেয়ারের স্বামীকে জেলে নিয়ে যাবে। আপনি তখন দয়া করে কোর্টে আসবেন, সেই বরযাত্রী পার্টি দেখে যাবেন। প্লিজ অন্তত ওই ২৩শে এপ্রিলের বিকেলবেলায় !"

টেলিফোনটা এবার নামিয়ে দিয়েছে মালবিকা। কলঘরে মুখে চোখে অনবরত জল ছিটোচ্ছে সে। টেলিফোনের তার বেয়ে কানের ভিতর যেন সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ঢুকেছে।

ক্রিং ক্রিং। আবার টেলিফোন বাজছে।

না আর টেলিফোন ধরবে না মালবিকা। ওই দুষ্টু লোকটা নতুন কিছু নোংরা কথা বলবার জন্যে নিশ্চয় আবার ডায়াল করছে।

ক্রিং ক্রিং--নাছোড়বান্দা টেলিফোনটা কিছুতেই ছাড়বে না।

গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে মালবিকার। ঘরের টেবিলে একসঙ্গে স্ক্রু-লাগানো ডবল ফ্রেমে ওদের দু'জনের দু'খানা ছবি ছিল। সেদিন ছবি দু'খানা আলাদা করে ফেলেছে মালবিকা। মনোময়ের বেডের কাছে রাখা ছবিখানার দিকে তাকিয়ে মালবিকা চিৎকার করে উঠলো, "এ তুমি কী করলে ? আমি তো কোনো অপরাধ করি নি—তুমি আমাকে কোথায় নামিয়ে দিলে ?"

ক্রিং ক্রিং—টেলিফোনটা এখনও মালবিকা মজুমদারকে তাড়া করছে।

"হ্যালো, হ্যালো—আর কি বলবার আছে? বলুন।" মালবিকা করজোড়ে শান্তি ভিক্ষা চেয়ে নেবে।

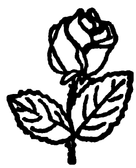
অন্যদিকে এবার অন্য কণ্ঠস্বর। "হ্যালো, মালবিকা দেবী? আমি বেলেঘাটার রাজজ্যোতিষী হরেন্দ্রনাথ. অনেকক্ষণ ধরে পাবলিক ফোন থেকে চেষ্টা করছি আপনার নম্বরটা। হ্যালো, আপনার কোষ্ঠীটা তৈরি করে ফেলেছি।"

রাজজ্যোতিষী হরেন্দ্রনাথও কী এই মুহূর্তে মালবিকার সঙ্গে রসিকতা শুরু করলেন? তিনি বলছেন, "হ্যালো, চমৎকার কোষ্ঠী আপনার—আপনার ভাগ্যে অনেক সুখ, অনেক শান্তি। দুষ্ট গ্রহরা সব সময় আপনার কাছে এসে নতিস্বীকার করবে; হ্যালো, আপনার মতো ভাগ্যবতী জীবনে যা চাইবেন তাই পাবেন। মালবিকা দেবী, আপনি আজন্ম সৌভাগ্যবতী।"

"পণ্ডিতমশায়, প্লিজ, লেখাটা আপনি ডাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমার শরীরটা আজ ভাল নেই," মালবিকা আর কীভাবে এই লোকের কাছে তার বিরক্তি এবং বিভ্রান্তি লুকিয়ে রাখবে?

"হ্যালো, মালবিকা দেবী, আপনি যে-বিষয়ে খোঁজ চাইছিলেন, ওই যে শ্যামলীর বোন—ও বিষয়ে অনেক খারাপ খবর রয়েছে মনে হয়। আজ সন্ধ্যার মধ্যে সমস্ত জোগাড় হয়ে যাবে। আপনি কাল সকালে একবার এদিকে আসবেন?"

হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষরত্ন যেভাবে কথা বলছে, তাতে মনে হচ্ছে সত্যিই নতুন কিছু খবর আছে যা তিনি ফোনে বলতে চান না। ভদ্রলোক তাঁর স্পেশাল কাজের জন্য হয়তো আরও কিছু প্রণামীও প্রত্যাশা করছেন।



২২শে এপ্রিল। এমনই এক দিনে মনোময় নীল খামে মস্ত এক চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল মালবিকাকে। পরের দিন বিয়ে, আর সেই লম্বা চিঠি

নিয়ে বাড়িতে কী হাসাহাসি। বাবা অবশ্য চুপচাপ ছিলেন। মেয়ের এবং ভাবী জামাইয়ের কোনো ভুল তিনি খুঁজে পেতেন না।

সেই চিঠিতে মনোময় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। স্বীকার করেছিল, জন্ম-জন্মান্তর সুকৃতি থাকলে তবে মালবিকার মতো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। "কাল থেকে তোমার আমার পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে ; তাই মনোময়ের শেষ দিনে কুমারী মালবিকার কাছে তার নিবেদন...."এতোদিন পরেও চিঠির কথাগুলো মালবিকার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রয়েছে। মনোময়ের এই চিঠিটা আজও এ বাড়ির আলমারীর লকারে তোলা আছে।

মনোময়ের কোনো চিঠি তো নষ্ট করে নি মালবিকা। সেই প্রথম চিঠিটা থেকে—যেটা মালবিকার কলেজ খাতার মধ্যে সবার অলক্ষ্যে গুঁজে দিয়েছিল মনোময়। চিঠিটা পেয়ে প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল মালবিকার—ভেবেছিল দুর্বিনীত ছোকরার দুঃসাহসের যোগ্য শিক্ষা দেবে। কিন্তু পাকে-চক্রে সে শিক্ষা আর দেওয়া হয় নি। মালবিকার ইচ্ছে ছিল সুযোগ বুঝে একদিন বলবে, "ছিঃ লজ্জা করে না ? মেয়েদের সঙ্গে এমন গায়ে পড়ে কেঁউ আলাপ করে ?" সে-কথাও বলা হয়নি। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, কোনো এক পক্ষ প্রথমে ঔৎসুক্য না-দেখালে সংসারে তো কোনো আলাপই হয় না। এতোদিন পরে এই মামলার প্রসঙ্গে মালবিকা ভাবছে, মনোময়ের মধ্যে গায়ে-পড়া ভাবটা তো অনেক দিনই রয়েছে। মেয়েদের সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল না-থাকলে কেউ সহপাঠিনীর খাতার মধ্যে চিঠি গুঁজে দেয়।

এদিকে ২১শে এপ্রিল পেরিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ৩৫৪ ধারার মামলা দ্বিতীয় দিনে গড়িয়েছে। মণিদীপা সকালে একবার ফোন করে বান্ধবীকে গতকালের কিছু বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছিল।

"হ্যালো মালবিকা, তুই সাক্ষীসাবুদের কপিগুলো পড়ে নিস। বিশাখা বিশ্বাসের ব্লাউজের বোতামের পোজিসন নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। ওই লোকটা মানে মিস্টার বিশ্বাস, যিনি বিশাখাকে নিতে এসেছিলেন, উনি বলছেন, বিশাখা বাইরে এসে যখন হাঁপাচ্ছে তখন ব্লাউজের সমস্ত

বোতাম খোলা ছিল ; কিন্তু অফিসের সুইপার, যে তার আগেই দেখেছে বিশাখাকে, বলছে অবশ্যই সে ব্লাউজ খোলা দেখে নি। তবে দিদিমণির চোখমুখ লাল ছিল।"

কিন্তু নর্দমা ঘাঁটা এইসব নোংরা বিবরণ শোনবার কোনো উৎসাহ নেই মালবিকার। কানে শোনবার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে বললো, "ব্রীফটা পড়ে নেবো।"

মণিদীপা টেলিফোনেই খবর দিয়েছিল, "আজ প্রচণ্ড লড়াই। নাটকের প্রধান চরিত্র বিশাখা বিশ্বাস সকাল থেকে সাক্ষী দেবে, তারপরে বিকেলের দিকে শুরু হবে জেরা। উনি খুব মন দিয়ে তৈরি হচ্ছেন—মনোময়ের অফিস ঘরের একটা ছবি এঁকে নিয়েছেন। গদিমোড়া যে ডিভানের প্রসঙ্গ বারবার উঠেছে তারও মাপজোক নিয়ে এসেছেন। ভগবান জানেন ওসব কী কাজে লাগবে।"

এগারোটা বাজবার একটু পরেই মালবিকা ছুটেছিল বেলেঘাটায়। রাজজ্যোতিষী হরেন্দ্রনাথের ঘরে তখন একজন লোক ছিল। মেয়ের বিয়ের মিথ্যে কোষ্ঠীটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলে পাত্রীর পিতাকে দ্রুত বিদায় করলেন হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষরত্ন। তারপর মালবিকার দিকে মুখ বাড়িয়ে নিচু গলায় তিনি বললেন, "আপনি এসে গিয়েছেন ভাল হয়েছে। একটু আগেই থানা থেকে ফিরেছি। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

রাজজ্যোতিষীর মুখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে মালবিকা। বিনয়ে বিগলিত জ্যোতিষরত্ন এবার বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না তো ?"

"মনে করবো কেন ?" মালবিকা বুঝতে পারে না।

একটু কাশলেন হরেন্দ্রনাথ। "ওই যে মেয়েটি—বিশাখা—ওই ফ্যামিলির কারও সঙ্গে বৈবাহিক কোনো সম্বন্ধ-টম্বন্ধর ব্যাপারে খুব এগিয়ে যান নি তো ?"

কী বলছেন এই ভদ্রলোক ? মালবিকার উদ্বেগ বাড়ছে।

একটু দ্বিধার পর হরেন্দ্রনাথ বললেন, "একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ...সাপটার খবর পেয়ে আমার চিন্তা হলো। হাজার হোক একটা সোমত্ত মেয়েমানুষ, তার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত না-হয়ে আনসান বলে দেবো ? কিন্তু আপনার কথাও আমাকে ভাবতে হলো—আপনি ভাল পেমেন্ট করেছেন ; দুটো পয়সার জন্যে আপনি অনেকের মতো টানা হ্যাঁচড়া করেন না ; আপনার প্রতিও আমার একটা দায়িত্ব আছে।"

এইবার হরেন্দ্রনাথ ডেস্কের ভেতর থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করলেন। গলার স্বর আরও নামিয়ে অনুরোধ করলেন, "দেখবেন যেন আমার নামটা ঘুণাক্ষরে কেউ জানতে না পারে। আমি যে এ-কাজ করি জানলে আমাকে পাড়াছাড়া হতে হবে।"

এবার আরও গলা নেমে গেলো হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষরত্ন মশায়ের। "শুনুন, মন দিয়ে শুনুন...।"

তিড়িং করে সোজা হয়ে বসেছে মালবিকা। উত্তেজনায় তার নিঃশ্বাসের গতি দ্রুত হতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত শুনে ব্যাগ থেকে আর একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিলো মালবিকা।

"আপনাকে কী করে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না। আমি আবার আসবো..." এই বলে ছিটকে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মালবিকা। হরেন্দ্রনাথ সত্যিই খবর জোগাড় করেছেন।

"শুনুন, শুনুন, সামান্য কাজে এতো টাকা আমি পাই না। কুড়ি টাকা দিলেই যথেষ্ট—বেশী টাকা নিলে আমার বদনাম হয়ে যাবে।"

মালবিকাকে কিছু টাকা ফেরত দেবার জন্যে ধাওয়া করেছেন রাজজ্যোতিষী হরেন্দ্রনাথ। কিন্তু মালবিকা ততক্ষণে একখানা খালি ট্যাক্সি থামিয়ে তার ভিতর প্রায় ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়েছে। রিক্‌শা, বাস, মিনিবাস, সাইকেল, স্কুটার, ঠেলাগাড়ি এবং ট্রাফিকের সাদা এবং সিপাইজীদের পাশ কাটিয়ে যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই বেলেঘাটার ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে কলকাতার হৃদয়-কেন্দ্রের দিকে। মালবিকা ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে

এবং ড্রাইভারকে বলছে, "প্লিজ, একটু তাড়াতাড়ি চলুন।" গন্তব্যস্থল যখন রেল স্টেশন নয়, হাসপাতাল নয় তখন এতো তাড়াতাড়ি কী আছে? বুঝতে পারে না ট্যাক্সির তরুণ ড্রাইভার।

"প্লিজ, প্লিজ", তখনও সকরুণ অনুনয় করে চলেছে মালবিকা। "কোর্টে মামলা চলছে।"

"কোর্টের হুজুররা কী কলকাতায় ট্রামে বাসে চড়েন না? একটু দেরি হলে ফাঁসি হবে না, বউদি," রসিকতা করলো ড্রাইভারের পাশেবসা ছোকরাটি।

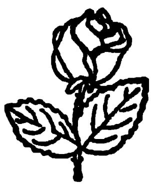
দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী চোখে মোটা পাওয়ারের চশমা চড়িয়ে তখন বিশাখা বিশ্বাসকে জেরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, এটা কি সত্য যে এ-বি-সি ড্রাগসের মিস্টার চট্টরাজই তাঁকে এই অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন? তার পরের প্রশ্ন ভাবছিলেন ; মিস্টার মজুমদারের মতো সিনিয়র এগজিকিউটিভের সঙ্গে আপনার সোজাসুজি দেখা করার কথা নয় ; কিন্তু আপনিই তাঁর সঙ্গে একান্তে দেখা করবার জন্যে চেষ্টা করছিলেন এবং মিস্টার মজুমদার আপনাকে সময় দিতে পারছিলেন না? মিস্টার রায়চৌধুরী বুঝতে পারছিলেন, এসব প্রশ্নে প্রমাণ হয় না যে অফিস আওয়ারের পরে মিস্টার মজুমদারের ঘরে অবশেষে যখন বিশাখা বিশ্বাস প্রবেশ করেছিল তখন তার শালীনতা নষ্ট করা হয় নি এবং মিস্টার মজুমদার জাঁদরেল পদের এবং সেদিনকার একাকীত্বের সুযোগ নেন নি। তবু নানা প্রশ্ন করতে হয়, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেবপ্রসাদ দেখেছেন, একটা ছোট্ট সাধারণ প্রশ্নই অনেক সময় বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

ব্লাউজের বোতামের ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হচ্ছে মিস্টার রায়চৌধুরীকে। কিন্তু এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না তিনি। পুলিসের শিকদার দক্ষ শিকারীর মতো তার জাল ছড়িয়ে দিয়েছে। থার্ড ম্যাজিস্ট্রেটের ফাঁসুড়ে মেজাজের পুরো সুবিধাটা নেবার সমস্ত ব্যবস্থাই সে ভাল করে সাজিয়ে রেখেছে। দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরীর গাউনে সামান্য

টান পড়তেই তিনি ঘাড় ফেরালেন এবং অবাক হয়ে গেলেন। স্বয়ং মালবিকা মজুমদার কোর্টে হাজির হয়েছে এবং এক মিনিটের জন্য জরুরী কথা বলতে চাইছে তাঁর সঙ্গে। শান্ত পদক্ষেপে থার্ড ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরের বাইরে চলে এলেন দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী। তারপর একান্তে দু'মিনিট মালবিকার সঙ্গে কথা বলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মালবিকার হাতের স্লিপটা দেখলেন তিনি কয়েকবার। ব্যাপারটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না তিনি। ঘড়ির দিকে তাকালেন দেবপ্রসাদ। তারপর জুনিয়রকে বললেন, "এক মিনিটও সময় নষ্ট করা চলবে না। আজই যে করে হোক দুটো সমন ইসু করাও—এভিডেন্স অ্যাক্টের সেকশন ১৩৯ অনুযায়ী। কালই ডকুমেন্ট প্রোডাকশন করাতে হবে। কুইক—কুইক।"

দেবপ্রসাদ মালবিকার দিকে তাকালেন। চাপা গলায় বললেন, "ব্যাপারটা যেন খুব গোপন থাকে—আপনি এবং আমি ছাড়া কেউ জানবে না। মিসেস মজুমদার, আপনি যদি বলতেন হাতের মুঠোয় আকাশের তারা ধরে এনেছেন তাহলেও এতো আশ্চর্য হতাম না।"

ঘড়ির দিকে আবার তাকালেন দেবপ্রসাদ। "যাই। খুচরো সাক্ষীগুলো আজই সেরে ফেলা যাক। বিশাখা বিশ্বাসকে আগামীকাল সবার শেষে জেরা করবার অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি এখনই, ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর কোডের ২৩২ ধারা অনুযায়ী!" এই সব নম্বরগুলো কেমন হুড় হুড় করে বলে যান উকিলরা, অথচ কোনো অর্থ সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে না।



২৩শে এপ্রিল।

ভোরবেলায় মালবিকার মনে পড়লো অনেকদিন আগের সেই ২৩শে

এপ্রিলের কথা, যেদিন কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে মাথায় টোপর পরে মনোময় ঢুকলো নন্দন রোডের বাড়িতে —চারদিকে রব উঠলো বর এসেছে বর এসেছে। ওরে বাজারে শঙখ বাজা, এসেছে আজ মালবিকার রাজা।

প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপছন্দঃ....বধ্‌নামি সত্য গ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়শ্চ তে।...প্রাথ্যমানা দেবতা দম্পত্যোহৃদয়ৈক্য প্রার্থনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদেতহৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।—কতদিন আগেকার উচ্চারিত মনোময়ের কণ্ঠস্বর আজও মহাকাশের কোনো প্রান্তে নিশ্চয় ঘুরে বেড়াচ্ছে।...প্রজাপতি ঋষি...কান্না আসছে মালবিকার। প্রজাপতি ঋষি, একি করলে তুমি আমাদের ?

২৩শে এপ্রিল ভোরবেলাতেই মনোময় স্নান সেরে বেরিয়ে গিয়েছে। জামিনে খালাস বিচারের আসামী ঠিক সময়ে থার্ড ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির না হলে তুলকালাম কাণ্ড হতে পারে। ধর্মাবতার তো সেদিন রেগেমেগে এক আসামীর জামিন নাকচ করে জেল হাজতে পাঠালেন।

মালবিকাও আজ ভোরে স্নান সেরে নিচ্ছে। এই প্রথম মেয়ের বিবাহ দিবসে বাবা নেই। তিনি বেঁচে থাকলে এতক্ষণ ফোন এসে যেতো, বলতেন, "তোমরা শতজীবী হও।" পরলোক থেকে তিনি নিশ্চয় সন্তানকে লক্ষ্য করছেন, আশীর্বাণীও পাঠাচ্ছেন, কিন্তু মালবিকার কাছে তো এসে পৌঁছচ্ছে না।

বিয়ের আগের দিন লেখা মনোময়ের সেই চিঠিটা আবার মালবিকার স্মৃতিপটে উঁকি মারছে। মনোময় লিখেছিল, "মালবিকা, এতোদিন ধরে তিলে তিলে তোমারই দানে মনোময় বেড়ে উঠেছে। কী আশ্চর্য ! এখন তোমাকেই পেতে চলেছে সে।" তারপর মনোময় তুলে ধরেছিল একালের দম্পতির চিরন্তন প্রার্থনা : "ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি। কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—তুমি আছ, আমি আছি।"

২৩শে এপ্রিল এলেই মনোময় রসিকতা করতো, "মালবিকা দুঃখের

দিনকেই মিলনের দিন বলে বেছে নিয়েছি আমরা, দুঃখটা তো জানোই। এই ২৩শে এপ্রিল শেক্সপীয়রের জীবনাবসান ঘটেছিল। ঐ একই দিন দেহরক্ষা করেছিলেন ডন কুইৎজার লেখক সার্ভানটিস। যেন এতোও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নি ২৩শে এপ্রিলের, যুদ্ধের সময় অকালে নিহত হয়েছিলেন কবি রুপার্ট ব্রুক।"

"গত দু'হাজার বছরে ২৩শে এপ্রিল কোনো আনন্দময় ঘটনা ঘটেনি—এই আমাদের বিয়ে ছাড়া !" বলতো মনোময়। "সুতরাং বন্ধুগণ, আনন্দ করো।" মনোময় রসিকতা করছে না গম্ভীরভাবে বলছে মাঝে মাঝে তা বোঝা যেতো না।

স্নানের শেষে দেহের জল মুছতে-মুছতে আরও কত কথা মনে আসছে মালবিকার। কিন্তু এখন বিন্দুমাত্র সময় নেই, হাতে অনেক কাজ।

ক্রিং ক্রিং টেলিফোন বাজছে। মিসেস শকুন্তলা চাওলা কথা বলছেন। "গুডমর্নিং, সৌভাগ্যবতী ! আজ সকালে ফিগার সেন্টারে একটু ঘুরে যেতে হবে।"

"আজ যে আমার অনেক কাজ," মালবিকা বলতে গেলো। কিন্তু মিসেস চাওলা জোর দিয়ে বললেন, "পনেরো মিনিটের জন্য অন্তত এখানে আসতেই হবে।"

ফিগার সেন্টারে ঢুকতেই অভিনন্দন জানালেন মিসেস চাওলা। "হার্টি কংগ্রাচুলেশনস। মিসেস মজুমদার, আজ আপনি আমাদের অতিথি। রেগুলার কাস্টমারদের বিবাহের দিনে আমি বিনামূল্যে বিউটি মেক আপ দিই।"

দ্বিধা করছিল মালবিকা। কিন্তু মিসেস চাওলা ছাড়বার পাত্রী নন। "কাম অন—আজকের দিনেই তো বয়সটা যথাসম্ভব কমিয়ে নিতে হবে। দেখুন না, পনেরো মিনিট সময়ে মিসেস চাওলা কী করতে পারে? সুইডেনে বলে, শিকারের জন্য সাজগোজ !"

যাই হোক, সময় অবশ্যই পনেরো মিনিটের বেশী নয়। ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে মালবিকা। মিসেস চাওলা বললেন, "ফুটফুটে মেয়েটি,

আমারও এমন দিন ছিল! সময়ের জন্য আজ তো তোমার ছটফটানি হবেই। আমার কাছে পনেরো মিনিট মানে ১৪ মিনিট ৬০ সেকেণ্ডের বেশী নয়।"

রূপচর্চা শেষ করে উল্লসিতা শকুন্তলা চাওলা বললেন, "আয়না দিচ্ছি নিজেকে দেখো। অপরূপা বলে একেই। আমি বলে রাখছি, আজ বহু লোক তোমার হাজবেন্ডের সৌভাগ্যে ঈর্ষাবোধ করবে অ্যাণ্ড..."

"চুপ করলেন কেন? বলুন, সদ্যসজ্জিত মালবিকা পদ্মআঁখি বিস্ফারিত করলো। মৃদু হেসে মিসেস চাওলা বললেন, "এবং তোমার স্বামীও বুঝবেন কত ভাগ্যবান হলে এমন সুন্দরীকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া যায়।"

দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মহিলা জুনিয়র রুচিরা ব্যানার্জি আদালতে মালবিকার সাজগোজ দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলেন। যার স্বামী আজ দু'বছরের জন্যে জেলে যেতে পারেন কোর্টঘরে সেই মহিলার এমন বেশবাস বড় একটা নজরে পড়ে না।

খোলা ছাড়িয়ে মানুষকে দেখবার দুটো মাত্র জায়গা আছে আদালত এবং হাসপাতাল। মানুষের আসল রূপটা এখানে ধরা পড়ে যায়।

মালবিকা দেখলো অভিযোগকারিণী বিশাখা বিশ্বাসও একটা বেনারসী শাড়ি পরে চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মালবিকা আজ নীল শাড়ী পরেছে। নীলটাই মনোময়ের প্রিয়। নীল বেনারসী পরেই মালবিকার বিয়ে হয়েছিল।

বিশাখার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিলো মালবিকা। নস্করপাড়া লেনের সামনের দৃশ্যটা ভাবলেই মালবিকার সর্বাঙ্গে জ্বালা শুরু হয়ে যায়।

আসামীর কাঠগড়ায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মনোময়। সে কারও দিকে তাকাচ্ছে না। কোনো দৃষ্টিবিনিময় এখানে সে সহ্য করতে পারবে না। মনোময় কি আজ ভালভাবে দাড়ি কামায় নি? পুরুষের

মুখে যে 'অপরাহ্ন ছায়া' দেখা যায় তা এই সকালেই মনোময়কে ঘিরে ধরেছে ?

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী থার্ড ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে ঢুকেই মালবিকাকে দেখে খুশী হলেন। "আপনি এসে গিয়েছেন ? আজ তো আপনারই দিন, মিসেস মজুমদার ! যে জিনিসের জন্য নোটিশ করেছিলাম থানা থেকে তাও এসে গিয়েছে—আমার জুনিয়র ভাল কাজ করেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই সিক্রেট আছে, মিস্টার মজুমদারকেও আমি কিছু বলি নি। আজ সকালে কাগজগুলো নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আমার নিজেরও ভরসা ছিল না।"

থার্ড ম্যাজিস্ট্রেট কালো গাউন পরে গম্ভীর মুখে এজেলাশে প্রবেশ করলেন। এই আলোবিহীন প্রাচীন ঘরের সঙ্গে ওঁর অপ্রসন্ন প্রবীণ মুখখানা ভাল খাপ খেয়ে মেড ফর ইচ আদার হয়ে গিয়েছে ! কে যেন বলেছিল, বিচারকরা বিশেষ কোনো যৌগিক ব্যায়াম করেন ! মুখ দেখলে ওঁদের মনের অবস্থা বোঝা যায় না। এই মামলায় সাক্ষীসাবুদ শুনে কোনদিকে তাঁর মন যাচ্ছে তা আন্দাজ করবার সাধ্য মালবিকার নেই।

আসামীর কাঠগড়া থেকে দর্শকদের আসনে মালবিকাকে দেখে মনোময়ও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। মালবিকা তো এখানে আসে না কখনও—মালবিকাকে আগের দিন সে দেখতে পায় নি। তবে কি আজ রায় বেরোবার দিন বলেই নিজের কানে বিচারকের আদেশ শুনতে এসেছে মালবিকা ? দু'বছরের জেল, সেই সঙ্গে জরিমানা—ইমপ্রিজনমেন্ট হুইচ মে এক্সটেন্ড টু টুইয়ারস আর ফাইন অর বোথ।...বেডরুমে মালবিকার বালিশের পাশে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে একটা মোটা বইও দেখেছে মনোময় ; 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড ডাইভোর্স'—লেখক এ. এন. সাহা।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে বিশাখা বিশ্বাস। সরকারী পক্ষে প্রশ্নাবলী গতকালই শেষ হয়েছে। দেবপ্রসাদ মোটা চশমার মধ্য দিয়ে বরফঠাণ্ডা চোখে একবার বিশাখা বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর শুরু

করলেন।—মিসেস বিশ্বাস, গতকাল অনেকক্ষণ ধরে আপনি চমৎকার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ভীষণ বিপদের মধ্যেও প্রতিটি খুঁটিনাটির বিবরণ মনে রাখবার অসাধারণ ক্ষমতা আপনার।

—আপনি কি বলতে চাইছেন ? এসব আমি বানিয়ে বলেছি ? ফোঁস করে উঠলো বিশাখা।

—ছি ছি, সে-কথা আমি কেন বলতে যাবো ? আমি আপনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করছি। আসামী মিস্টার মজুমদার আপনার শ্লীলতাহানির সময় যে চোখের চশমা খুলে সেন্টার টেবিলের ডানদিকে রেখেছিলেন আপনি তাও লক্ষ্য করেছিলেন এবং মনে রেখেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন মোটা পাওয়ারের চশমা খুলে রাখলে মিস্টার মজুমদার কিছুই দেখতে পান না ?

বিশাখা—জানি না। তবে সেদিন আমাকে কাছে বসিয়ে কথাবার্তার পর আসামী হঠাৎ চশমা খুলে ফেলেছিলেন।

দেবপ্রসাদ—কথাবার্তার সময় আপনি কি কিছু সন্দেহ করছিলেন ?

বি—না, সন্দেহ হলে তখনই তো উঠে আসতাম।

দে—উনি আপনার সঙ্গে কী ধরনের কথা বললেন ?

বি—উনি বললেন, আমার টেলিফোন হ্যানডলিং একটু উইক ; তবে আমার গলার স্বর খুব মিষ্টি। আরও বললেন, বোধহয় আমার একটু ট্রেনিং প্রয়োজন। আমি তখন ওঁকে বলি, আপনি তো স্যর বম্বে দিল্লীতে টেলিফোন অপারেটরদের কাজ দেখেছেন। যদি সময় করে একটু ট্রেনিং দেন কীভাবে আমি ভাল কাজ করতে পারি।

দে—তারপর ?

বি—তারপর উনি আমার মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, থ্যাংকস্। জিজ্ঞেস করলেন, আগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সেনশর্মা আমাকে ট্রেনিং দিতেন কিনা। আমি বলেছিলাম, উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন।

দে—কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সেনশর্মার সঙ্গে আপনি কি মাঝে

মাঝে ঘুরেছিলেন ?

বি—তার সঙ্গে এই কেসের সম্বন্ধ ?

দে—সম্বন্ধ আছে, মিসেস বিশ্বাস ? আপনি কি জানেন, ফাইলে উড়ো চিঠি আছে যে অফিসের গাড়িতে আপনি ও মিস্টার সেনশর্মা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন ?

বি— একদম নোংরা কথা। শুধু একদিন বৃষ্টির মধ্যে বাসের জন্য আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন। মিস্টার সেনশর্মা পানামা হোটেলে নেমে গিয়েছিলেন এবং ড্রাইভারকে বলেছিলেন আমাকে ভবানীপুরে সিনেমা হাউসের সামনে নামিয়ে দিতে।

দে—দেখুন, উড়ো চিঠিতে বলা হয়েছে, আপনিও কোম্পানির গাড়িতে পানামা হোটেলে গিয়েছেন।

বি—একদম বাজে কথা। নোংরা কথা। উড়োচিঠির কী দাম থাকতে পারে ?

দে—আপনি বলেছেন, কথা বলতে-বলতে মিস্টার মজুমদার আপনার কাছে সরে এসেছেন এবং বলেছেন সুন্দরী টেলিফোন অপারেটর ইচ্ছে করলেই সেরা অপারেটর হতে পারে। তখনও আপনি কিছু বুঝতে পারলেন না কেন ?

বি--আমি তখন বলে চলেছি, সারাজীবন ধরে কষ্ট পাচ্ছি স্যর, আপনি নিজে ট্রেনিং দিন—যা বলবেন তাই শুনবো...কী করে বুঝবো.....

দে—তার মানে, এই ধরনের অভিজ্ঞতা কার থাকতে পারে ?

বি—ভদ্রঘরের মেয়ের এইসব অভিজ্ঞতা থাকে না, স্যর। অফিসের কর্তা যখন মিষ্টি কথা বলছেন, তখন খুশী হবারই কথা, কে বুঝবে তাঁর মনে কী আছে !

দে—বুঝতে পারলেন কখন ?

বি—যখন আমার বাঁ হাতটা ওঁর ডান হাতের মধ্যে চলে গিয়েছে ; যখন আমার বুকের আঁচলটা সরে গিয়েছে, যখন ওঁর অন্য হাতটা আমার

কাঁধের ওপর এসে পড়েছে।

দে—আপনি বলেছেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ার চেষ্টা করেছেন। কাঁদতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে কতক্ষণ সময় কেটে গিয়েছে?

বি—আমার কিছুই মনে নেই। এই রকম অবস্থায়.....

দে—মনে থাকার কথা নয়। এই তো ? কে আর এরকম অবস্থায় অভ্যস্ত এই তো?

বিশাখা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ এবং ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো প্রশ্নকর্তার সঙ্গে সে একমত। তারপর দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী কালো শেল ফ্রেমের চশমাটা আবার নাকের ওপরে লাগিয়ে দিলেন।

দে—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু মিসেস বিশ্বাস। যেহেতু আপনার বক্তব্যের ওপর একজন প্রখ্যাত ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে সেই হেতু আপনাকে সেদিনকার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি।

বিশাখা বিশ্বাস বোধহয় একবার আদালতের জনসমুদ্রের দিকে তাকালো। এবং মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট পরিস্থিতি বুঝে তথাকথিত দর্শকদের আদালত থেকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। ঘর এখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে, দুই পক্ষের কয়েকজন উকিল ছাড়া প্রায় কেউই নেই। মালবিকা মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে আছে। তারও উত্তেজনা বাড়ছে। দেবপ্রসাদ এবার ব্লাউজ এবং খোলা বোতাম প্রসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। বিশাখা বিশ্বাস স্বীকার করলো, তার সেদিনের জামার হুক ছিল, টেপা বোতাম নয়। একথাও বললো, অফিসের জমাদার তাকে কী অবস্থায় দেখেছে তাতে কী প্রমাণ হয় তার তা জানা নেই। তবে সেদিনকার টানাটানিতে তার জামার হুক খুলে গিয়েছিল এবং মজুমদারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে ছুটে বেরিয়ে আসবার পর তার সেটা খেয়াল হয়। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা। থার্ড ম্যাজিস্ট্রেট শুধু নিঃশব্দে একবার চমশা খুলে কাঁচটা মুছে নিলেন।

দেবপ্রসাদ হঠাৎ এবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। "মিসেস বিশাখা

বিশ্বাস এই ব্লাউজের বোতাম ছেঁড়ার গল্পটা আর কতবার কতদিন চালাবেন ?"

ঘরের মধ্যে যেন বোম পড়লো। সরকারী উকিল উঠে দাঁড়িয়ে কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু দেবপ্রসাদ তাঁর কথা কানে তুললেন না।

বিশাখা বিশ্বাসও ফোঁস করে উঠলো। "আপনি কী বলতে চান ? আমি মিথ্যে বানিয়ে বলেছি যে ধস্তাধস্তিতে আমার জামার বোতাম....."

দে—মিসেস বিশাখা বিশ্বাস, আমি শুধু জানতে চাই, এই ব্লাউজ খুলে যাবার চমৎকার গল্পটায় আপনি বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছেন। নোংরা এই গল্পটা আর কতবার ব্যবহার করবেন ?

বি—ধর্মাবতার, এই ভদ্রলোক যা তা প্রশ্ন করছেন।

থার্ড ম্যাজিস্ট্রেট—মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি কী বলতে চান ?

দে—ইওর অনার, আমি এই প্রশ্নই এবার এই মহিলাকে করছি। মিসেস বিশ্বাস, আপনি কি একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ? অজ্ঞান অবস্থায় আপনকে বেলেঘাটা চ্যারিটেবল হাসপাতালে রাখা হয়েছিল ?

বিশাখার মুখ নীল হয়ে আসছে—তার সঙ্গে এ কেসের সম্পর্ক কী ?

দে—সেটা বুঝবেন ধর্মাবতার। আপনি শুধু উত্তর দিন, আপনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন কিনা ?

বি—আত্মহত্যার চেষ্টা নয়, কিছু ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলাম ভুলে।

দে—বেশ তাই হলো। আপনি পুলিসকে সেই কথাই বলেছিলেন এবং তা মেনে নিয়ে পুলিস আপনার বিরুদ্ধে কোনো কেস করেনি.....কিন্তু তার আগের কোনো স্মৃতি মনে পড়ছে আপনার ? কয়েক সেকেণ্ড ধরে বিশাখা স্মৃতির অন্ধকার হাতড়ালো। তারপর বললো—কিছুই মনে পড়ছে না।

দে—পড়ছে না, কিন্তু মনে করিয়ে দিচ্ছি। আত্মহত্যার চেষ্টার এক মাস আগে আপনি বেলেঘাটা থানায় অভিযোগ করেছিলেন আপনার

শালীনতাহানি করা হয়েছে। এবং সেখানেও আপনি ব্লাউজের গল্পটা ঠিক এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন। বেলেঘাটা থানায় ডায়রি নম্বর.....

বিশাখা এবার যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। —তার সঙ্গে, তার সঙ্গে, এই মামলার কী সম্পর্ক?

দে—বাজে কথা বলবেন না। শুধু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান। উত্তর চেপে রাখলেও কিছু এসে যাচ্ছে না। থানার রেকর্ড সমন করে আমরা আনিয়ে রেখেছি। কোর্টে তখন নিদারুণ চাঞ্চল্য। দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী বলে চলেছেন, "সেবার আপনি যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তিনিও আপনার কর্মকর্তা। আপনি তখন বেলেঘাটা ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীতে টেমপোরারি কাজ করেন; যাঁর বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ আনেন তিনি ওই কারখানার পার্টনার। ঠিক একইভাবে পার্টনারের ঘরে ঢুকে আপনার বুকের আঁচল সরে যায়, ব্লাউজের হুক খুলে যায়। শুধু সেক্ষেত্রে আপনার অভিযোগে পুলিস কোনো অ্যাকশন নেয় নি সঙ্গে সঙ্গে। আপনি তখন ভয় দেখিয়েছিলেন, তেমন হলে আপনি নিজেই পিটিশন কেস করবেন। কিন্তু আপনি কিছুই করেন নি, বরং কয়েকদিন পরে থানায় চিঠি লিখে আপনার অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন"।

আদালতে তখন বেশ উত্তেজনা। বিশাখা বিশ্বাস শুধু কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলছে, "এর সঙ্গে সেই কেসের কী সম্পর্ক?" দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী তখন বলছেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান—ব্যস্ত হবেন না বিশাখা দেবী। বেলেঘাটা থানায় শালীনতাহানির অভিযোগের ছ'মাস আগে আপনাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করবো। তখন আপনি একবার পাশের থানায় গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা স্মরণের চেষ্টা করুন, বিশাখা দেবী। আপনি তখন নাকি চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, নানা ছোটখাট অফিসে আপনাকে ইন্টারভিউ দিতে হয়। সেই সময় একদিন আপনি থানায় এসে অভিযোগ করেন—চাকরিতে ইন্টারভিউ নেবার সময় একজন ভদ্রলোক আপনার শরীরে হাত দিয়ে ইজ্জত নষ্টের চেষ্টা করেছে। পুলিস আপনার কথা তেমন আমল দেয়নি। শুধু অভিযোগটা ডায়রি করে রেখেছিল। ডায়রি নম্বর....। ওখানেও

দেখা যাচ্ছে ব্লাউজের হুকের কথা উঠেছে। আপনি কী স্বীকার করবেন? না, থানার ডায়রি থেকে আপনার লেখা কাগজটা পুরো এই আদালতে সবার সামনে পড়ে যাবো?

বিশাখা একেবারে ভেঙে পড়েছে।—সে ব্যাপারটা অস্বীকার করছে না। দেবপ্রসাদের কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে। "সেবারেও পুলিস আপনার কথা বিশ্বাস করে নি। চমৎকার বিশাখা দেবী।"

মালবিকার দেহ এখন থরথর করে কাঁপছে। ভাবছে, বিশাখা বিশ্বাসের এই অতীত সংবাদটুকু যোগাড় করতে না পারলে কী সর্বনাশই না হতো। সমস্ত আদালতে চাপা গুঞ্জন ও উত্তেজনা। মামলার অবস্থা এরপর কী হবে তা আন্দাজ করতে কারও কষ্ট হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই সওয়াল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

মালবিকা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কাঠগড়ায় আসামী মনোময়ের দিকে। আর ভাবছে বেলেঘাটার পণ্ডিত মশাই কী আশ্চর্য খবর তাকে উপহার দিয়েছেন।

পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন মালবিকাকে, "কী জন্যে খোঁজখবর করছেন ঐ পরিবার সম্বন্ধে তা জানি না—কিন্তু ওই বিশাখা বিশ্বাস মেয়েটির অতীত মোটেই সুবিধের নয়।" পাছে মালবিকা বিশ্বাস না করে তাই থানা ডায়রির দুটো নম্বর টুকে এনেছেন তিনি। "এক একটা মেয়ে থাকে, কোনো মানসম্মান নেই—যেখানে যায় সেখানে হাজার রকম গণ্ডগোল পাকায়।"

বিশাখা বিশ্বাস আদালতের এক কোণে বসে আছে। মালবিকা মনে মনে বলছে, "কেউটে সাপের থেকে বিপজ্জনক মেয়েমানুষ তুমি। ভেবেছিলে, কুৎসিত ভয়টয় দেখিয়ে নিজের চাকরিটা পাকা করে নেবে। দু'বারে যা পারোনি তৃতীয়বারে তা সফল হবে। কেউ তোমার অতীতটা জানতে পারবে না। কালনাগিনী, কী সাহস তোমার—যেখানে খুশী বলে বেড়াচ্ছো কে কে তোমার ইজ্জত নষ্ট করেছে।"

সওয়াল শেষ হয়েছে। সরকারী উকিল বুঝতে পেরেছেন তাঁর মামলার কোমর ভেঙে গিয়েছে ; নম নম করে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

সওয়ালের শেষে থার্ড ম্যাজিস্ট্রেট কোনো সময় নষ্ট করেন নি। বিকেল চারটে বাজবার একটু আগে বেকসুর খালাস দিয়েছেন মনোময়কে। দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে তিনি বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছেন, চমৎকার গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্যে।

কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসার পর মনোময়ের সঙ্গে করমর্দন করেছেন আনন্দিত দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী। বলেছেন, "আজ আমি দায়মুক্ত হলাম।"

"এসব আপনি জানলেন কী করে ?" কৃতজ্ঞ মনোময়ের চোখে জল বেরিয়ে এসেছে। বিশাখার অতীতের খবরগুলো এইভাবে আবিষ্কৃত না হলে কী বিপদ ঘটতে পারতো তা মনোময় অবশ্যই আন্দাজ করতে পারছে।

"সমস্ত কৃতিত্ব আপনার স্ত্রীর, মালবিকা দেবীই অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনিই সব গোপন সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমি শুধু নিমিত্ত মাত্র, মিস্টার মজুমদার। যাই, অন্য কোর্টে আবার ডাক পড়েছে। একটু পরে দেখা হবে।" এই বলে ব্রীফের বাণ্ডিল হাতে দেবপ্রসাদ বিরাট আদালতের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মালবিকা তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চায়। মণিদীপাকে একটু খবর দেওয়া প্রয়োজন। মনোময় একবার অফিস ঘুরে যেতে চায়—এখনও একটু সময় আছে।

আজকের অফিস যাওয়াটা একটু অন্য রকমের হবে মনোময়ের। আসুক একটু ঘুরে, মালবিকা আজ কোনো আপত্তি করবে না। মনোময়ের মুখটা অনেকদিন পরে আবার মিষ্টি লাগছে মালবিকার। বেচারা এই ক'মাস দুষ্টগ্রহের ষড়যন্ত্রে অনেক কষ্ট পেলো।

একটা ট্যাক্সি চড়ে যেতে যেতে মালবিকা দেখলো সাপের মতো বজ্জাত ঐ বিশাখা বিশ্বাস তখনও সিল্কের শাড়ি পরে আদালতের গেটের

সামনে ল্যাম্প পোস্টের তলায় একলা দাঁড়িয়ে আছে। মালবিকাকে দেখতে পেয়ে, কী ভেবে বিশাখা ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করলো। ট্যাক্সি থামিয়ে মালবিকার সঙ্গে কথা বলবার মতলব রয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু ঐ কালনাগিনীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না মালবিকা। 'যখন হাতজোড় করে হাওড়ায় দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন তুমি কী অপমান করেছিলে আমায় ! এখন ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে। তবে তোমার শাস্তি এখনও হয় নি—মিথ্যে মামলার জন্যে তোমাকে জেলে পাঠানো যায় কিনা তা দেবপ্রসাদকে দেখতে বলতে হবে।' বিশাখা বিশ্বাসকে কোনোরকম পাত্তা না দিয়ে জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে মালবিকা ট্যাক্সিড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো।

অনেকদিনের অন্ধকারের পর এগারো তলার ফ্ল্যাটে আজ আলো ফিরে এসেছে। খবর পেয়েই মণিদীপা হৈ-হৈ করে মালবিকার বাড়িতে হাজির হলো। "কর্তার জুনিয়রের কাছে টেলিফোনে সমস্ত রিপোর্ট পেয়ে গিয়েছি। বিপত্তারিণী, পোর্সিয়া, না দুর্গতিনাশিনী—কি নাম রাখা হচ্ছে তোর, মালবিকা ? একেই বলে ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।" বান্ধবীকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে মণিদীপা। "শেষ মুহূর্তে চাঞ্চল্যকর খবর সংগ্রহ করে তুই সবাইকে চমকে দিলি। তুই কবে ডিটেকটিভ হলি মালবিকা ?"

"ডিটেকটিভ হই নি। সবটাই ভাগ্য। ওই যে হঠাৎ কী ভেবে বেলেঘাটায় গেলাম, তারপর পাকেচক্রে......মেয়েটা যে অমন সাপের মত, যেখানে সেখানে বে-ইজ্জতির ব্যবসা ফেঁদেছে তা জানবো কী করে ?"

মালবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মণিদীপা বললো, "বরের ওপর অযথা সন্দেহ মিটলো তো ? উনি তো বেশ ভয় পেয়ে যাচ্ছিলেন।

এক এক সময় মনে হচ্ছিল, চরম বিপদের সময় তুই কোনো ইন্টারেস্ট নিচ্ছিস না। তখন যে তলে-তলে স্পেশাল খোঁজ খবর করছিস জানবো কী করে? আমি তখন তোর হয়ে ওকালতি করেছি, ও কেন এমন হয়ে গেছে তা মেয়ে হয়ে আমি বুঝতে পারি। কোনো পুরুষমানুষ ওর কষ্ট বুঝবে না।"

"তোদের কষ্ট কম হলো না।" মালবিকা বন্ধুর পিঠে হাত রাখলো। "সমস্ত জীবন দাসত্ব করলেও তোদের ঋণ শোধ হবে না।"

"যাক বাবা, সব ভাল যার শেষ ভাল। কিন্তু কর্তা কোথায়?" মণিদীপা এবার হৈ-হৈ করে উঠল।

"বাড়ি ফিরেই অফিসে ওকে ফোন করেছি। আজ থেকেই বোধ হয় আবার কাজের পুরনো রোগ ধরবে। ও বোধ হয় তোর কর্তার চেম্বারে দেখা করে ফিরবে।"

"খু-উ-ব আনন্দ হচ্ছে ভাই। এই নাও ফুলের মালার প্যাকেট—আসবার সময় দত্ত নার্সারি থেকে কিনে এনেছি। অগ্নিপরীক্ষার পরে আজ তোমাদের কর্তাগিন্নীর নতুন ফুলশয্যা হোক।"

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, শোয়ার ঘরে ঢুকে মনোময় অবাক হয়ে গেলো। ঘরে আজ ফুলের সমারোহ। মনোময় দেখলো নতুন পিলো কেসে, নতুন চাদরে এবং ধূপের গন্ধে শয়নমন্দির আজ উৎসবের রূপ ধারণ করেছে। দু'খানা খাটের মধ্যে যে ফুট তিনেক ফাঁক ছিল তা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। আজ সকালেও এ ঘরে যে দুটো খাট ছিল কে বলবে? ঘরে মিষ্টি ধূপের গন্ধ ভেসে আসছে। এই ধূপের গন্ধেও যেন মিলনের মাদকতা মিশে রয়েছে। ছোট্ট টেবিলের দিকে নজর পড়লো মনোময়ের। সেখানে বিয়ের পরে তোলা ওদের যুগল ছবিটা আবার নিঃশব্দে ফিরে এসেছে। ছবিটা অনেকদিন এখানে ছিল না।

মালবিকা বাড়ি ফিরে এসে আজ অনেকক্ষণ ধরে নিজের হাতে সব

সাজিয়েছে। আকাশের সমস্ত মেঘ কেটে গিয়ে সগৌরবে আবার ফিরে এসেছে ২৩শে এপ্রিল। রেডিওতে ঠিক এই সময় কোন অন্তর্যামী সুরের সাধনা শুরু করলে—'বিরহ মধুর হলো আজি।'

অনেকদিন পরে মালবিকা আবার স্বামীর দিকে প্রাণভরে তাকাচ্ছে। যে মনোময়কে সে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিল কঠিন অগ্নিপরীক্ষার পর তাকে আজ আবার ফিরে পেয়েছে। মালবিকার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ নিঃশব্দে নিবেদন করছে—মনোময়, আমাদের মানসম্মান আবার ফিরে এসেছে। মনোময়, আমার সমস্ত সন্দেহ ঐ নোংরা মেয়েটার সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু মালবিকা লক্ষ্য করলো, মনোময় এখনও কী যেন ভাবছে।

মনোময়, ভাবার কী আছে আর ? অপরাধ না করেও তুমি যে যন্ত্রণা সহ্য করলে তার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আমি কী করতে পারি ? মালবিকার চোখ দুটো ভালবাসার নিঃশব্দ বাণী নিরন্তর প্রচার করে চলেছে। মনোময়ের কি অভিমান হলো ? অভিমান হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মনোময়, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা যে ক্ষমার অযোগ্য। মনোময়, আমিই তো সমস্ত মিথ্যা ষড়যন্ত্রের ব্যূহ ভেদ করে, ওই নোংরা মেয়েটার ঘোমটা খুলে ২৩শে এপ্রিলের পড়ন্ত বেলায় সমস্ত কালিমা মুছে ফেলে তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছি। মনোময়, তোমার চোখে তো তার জন্যে কোনো কৃতজ্ঞতার আলো নেই। তোমার মুখ এখনো অন্ধকার কেন ?

মনোময় ভাবছে অন্য কথা। চোখের সামনে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের দৃশ্যগুলো সে এখনও দেখতে পাচ্ছে। সবার অভিনন্দন সংগ্রহ করে সসম্মানে ঐ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছিল মনোময়। আদালতের গেটের কাছে ওই মেয়েটা—বিশাখা বিশ্বাস—তখনও দাঁড়িয়েছিল। বিশাখা বিশ্বাসের আগুন নিভে গিয়েছে—চোখে তার জল।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মনোময় তখন একটা ট্যাক্সিকে ডাকছে। মনোময়কে দেখে বিশাখা বিশ্বাস হঠাৎ সচল হয়ে উঠল। যেন মনোময়ের

জন্যেই এখানে অপেক্ষা করছিল। ট্যাক্সির খুব কাছে এগিয়ে এসেছিল বিশাখা। "শুনুন। আপনার জন্যেই আমি দাঁড়িয়ে আছি।"

না, এখন আর কিছু শুনতে চায় না মনোময়। অনেক শোনা তো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পুরনো সিল্কের শাড়ি পরা বিশাখা বিশ্বাস শোনে নি, সে আরও কাছে এগিয়ে এসেছিল।

"কী হলো তোমার ? মাথা ধরেছে নিশ্চয়। রক্তচাপ বেড়ে যাওয়াটা কিছু আশ্চর্য নয়। একটু অডিকোলন দিই তোমার কপালে।" মালবিকা অডিকোলনের শিশিটা মনোময়ের কাছে নিয়ে এসেছে।

"কিছু ভাবছো ?" পুরনো দিনের সেই স্নেহময়ী মালবিকা আবার ফিরে এসেছে। তার সমস্ত সংশয় কেটে গিয়েছে, সে এখন স্বামীকে আদর করে বলছে, "তুমি আমার মানসম্মান, তুমি আমার গর্ব।"

মনোময় বুঝতে পারছে ওদের দুজনের দূরত্ব কমে আসছে। মালবিকা ক্রমশ কাছে সরে আসছে, যে এতোদিন পড়ে থাকতো বিভক্ত বিছানার শেষ প্রান্তে, অনেক দূরে, সে এখন প্রিয়র উষ্ণ কপালে স্নিগ্ধ হাত বুলিয়ে দিতে চাইছে। মনোময় আরও অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে। অথচ ঘরের নিলাভ আলোটা জ্বলে উঠে, যতটুকু দূরত্ব আছে তাও মুছে ফেলতে চাইছে।

আকাশ-পাতাল কী ভেবে বিছানার কোমল আশ্রয় ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো মনোময়—বেডরুমের টয়লেটে ঢুকে পড়লো সে। একটুখানি একাকীত্ব নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার। মালবিকাকে বলা প্রয়োজন, তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ হবে না জন্ম-জন্মান্তরে। তুমি আমাকে তৈরি করেছো, আমাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করে তুমি ক্ষান্ত হও নি, সর্বনাশা বিপদের অন্ধকার গহ্বর থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করে এনেছো।

কিন্তু পাঞ্জাবির পাশপকেটে রাখা পার্সের মধ্যে ছোট কাগজের টুকরোটা ধারালো ছুঁচের মতো মনোময়কে বিদ্ধ করছে। কোর্টের কাছে ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বিশাখাই চিরকুটটা এগিয়ে দিয়েছিল।

মনোময় তার সঙ্গে কথা বলে নি। কিন্তু কাগজের টুকরোটা নিতেই হয়েছে তাকে। ওই বিশাখা বিশ্বাস লিখেছে, "আজ আমি সকলের চোখে হেয় হয়ে গেলাম, মিস্টার মজুমদার। কিন্তু চাকরির খোঁজে বেরিয়ে আমি তো বারবার ইজ্জত নষ্ট করেছি। এমনই কপাল যেখানে গিয়েছি সেখানেই আক্রান্ত হয়েছি। এক ভদ্রলোক ইন্টারভিউয়ের নাম করে আমার সর্বনাশের চেষ্টা করেছিলেন। বেলেঘাটা ইলেকট্রিকের ওই লোকটা তো আরও শয়তান। এদেশের জঙ্গলে অসহায় মেয়েদের জন্যে এই বোধহয় নিয়ম। আমি বারবার আপ্রাণ প্রতিবাদ করেছি। মিস্টার মজুমদার, আপনি তো জানেন, সেদিন আপনি কী করেছিলেন। সেদিন আপনি আমার মানসম্মান নষ্ট করেন নি ? আপনি তারপর ক্ষমা চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, আপনি আমাকে বুঝতে পারেন নি, ক্ষণিকের ভুল করেছেন। কিন্তু আমি আপনাকে ক্ষমা করিনি—এর আগে দুবার হেরে গিয়েছিলাম বলে। ভগবান আপনার সর্বনাশ করুন, ইতি—বিশাখা বিশ্বাস।"

চিঠিটা পকেট থেকে বার করে পাকিয়ে গুলি করে ফেলেছে মনোময়। বনলতা সেন চোখের মাদকতায় মুহূর্তের ওই পতন তো মিথ্যা নয়। কাগজের গোল্লাটা এবার কমোডে ফেলে দিয়েছে মনোময়। স্নানঘরের আয়নায় নিজের মুখটা না দেখে পারলো না মনোময়। ঐ আয়নায় বিশাখা বিশ্বাসের ছবি কী করে উঁকি মারছে ভগবান জানেন ! কাগজের টুকরোটা এখনও কমোডের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর দেরি করলো না মনোময়--কমোডেরে শিকলের দিকে হাতটি বাড়িয়ে দিলো। ফ্লাশের জল-কল্লোল মালবিকার অপেক্ষামন্দিরেও শোনা যাচ্ছে। মনোময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। শান্তভাবে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে মনোময়।

মালবিকা আজ বিয়ের দিনের বেনারসী শাড়িটা পরেছে। খোঁপায় দিয়েছে মালা। দেহে তার মোহময়ী সুগন্ধের নিঃশব্দ নিমন্ত্রণ।

মালবিকা অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। মালবিকা বলছে, "এখনও অভিমান ? আমি তো স্বীকার করছি আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমি তো

ক্ষমা চাইছি। তুমিই তো আমার মানসম্মান।"

মালবিকার উষ্ণ অধরের স্পর্শ এবার মনোময়ের নিঃশ্বাস বন্ধ করতে চলেছে। মনোময়ের বুকের ভিতরটা হঠাৎ জ্বালা করছে। মনোময়ের মনে পড়ছে আজই তাদের বিবাহের দিন। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপছন্দ .....ওঁ যদেতহৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।......

মনোময় কোনোরকমে নিজেকে সীমন্তিনী মালবিকার আলিঙ্গনমুক্ত করে নিলো। একবার ইচ্ছে হলো মালবিকাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদে নেয়। কিন্তু তা পারলো না মনোময়। কোনোরকমে নিজেকে সরিয়ে নিতে নিতে মনোময় বললো, আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত, আজ আমাকে ক্ষমা করো।"